

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

অ-আ-ক-থ

পল সাভচেনকো

শ্রম কী





সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-থ

পল সাভচেনকো

শ্রম কী



প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ : অরুণ সোম ও প্রফুল্ল রায়

সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-থ
গ্রন্থমালার সম্পাদকমণ্ডলী: ফ. ভলকভ (প্রধান
সম্পাদক), ইয়ে. গুবস্কি (প্রধান সহসম্পাদক),
ফ. বুল্গাৎস্কি, ভ. জোতভ, ভ. ক্রাপিভিন,
ইউ. পোপভ, ভ. সোবলেভ, ফ. ইউরুলভ
প্রচ্ছদে ফরাসী শিল্পী ফেরনাঁ লেজের ছবি

ABC социально-политических знаний

П. САВЧЕНКО

Что такое труд?

На языке бенгали

ABC of Social and Political Knowledge

P. SAVCHENKO

WHAT IS LABOUR?

In Bengali

© Progress Publishers, 1987

© বাংলা অনুবাদ · প্রগতি প্রকাশন · ১৯৮৯

সোভিয়েত ইউনিয়নে মদ্রিত

C $\frac{0605010203-744}{014(01)-88}$ 246—89

ISBN 5-01-001403-3

সূচী

ভূমিকা	৫
প্রথম পরিচ্ছেদ। শ্রম, মানুষ ও সমাজ . . .	৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। পুঁজিতন্ত্রে শ্রম	৫০
১। পুঁজিতন্ত্রে শ্রমের প্রক্রিয়া	৫০
২। জীবিকানির্বাহের উপায়রূপে শ্রম .	৬২
৩। পুঁজিতান্ত্রিক পন্থার শ্রমসংগঠন . .	৯৪
৪। বেকার সমস্যা: কোটি কোটি মানুষের ট্র্যাজেডি	১০৪
৫। বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব; শ্রম ও পুঁজির মধ্যে বিরোধের তীব্রতাবৃদ্ধি	১২১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ। সমাজতন্ত্রে শ্রম	১৪৫
১। সমাজতন্ত্রে শ্রমের চরিত্র	১৪৫
২। সর্বজনীন কর্মসংস্থান। কাজ করার অধিকার ও নিজের বৃত্তি বা পেশা বেছে নেওয়ার অধিকার	১৭৪

৩। সমাজতন্ত্রে শ্রমজীবী জনগণের আয়	২০৯
৪। সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমের সংগঠন	২১৫
৫। সমাজতন্ত্রে বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব এবং শ্রম	২৪০
উপসংহার। সমাজতান্ত্রিক শ্রমের কমিউনিস্ট শ্রমে রূপান্তর	২৭৪
টীকা ও ব্যাখ্যা	২৮০

ভূমিকা

‘সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের অ-আ-ক-খ’ গ্রন্থমালায় ‘শ্রম কী’ এক বিশেষ স্থানের অধিকারী। এতে মূল্য উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের বাহকরূপে মানুষের বিকাশের ক্ষেত্রে শ্রমের ভূমিকা উদ্ঘাটিত হয়েছে।

মানুষের শ্রম, শ্রমের পরিস্থিতি ও ফলাফল বিভিন্ন বিজ্ঞানের আলোচনার বস্তু। প্রকৃতিবিজ্ঞান শারীরিক ও মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমের চর্চা করে। সমাজবিজ্ঞান শ্রমকে দেখে সামাজিক-অর্থনৈতিক ঘটনারূপে। প্রতিটি বিজ্ঞানই গবেষণার ব্যাপারে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতির আশ্রয় নেয়। যে-সমস্ত সমাজবিজ্ঞান শ্রম সম্পর্কে চর্চা করে তাদের মধ্যে

মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র চূড়ান্ত অর্থবহ। মার্কসীয় অর্থশাস্ত্র শ্রমের সামাজিক রূপ, তার সামাজিক গঠনপ্রকৃতি, অর্থাৎ সামাজিক শ্রমে অংশগ্রহণ হেতু মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তারই বিশ্লেষণ করে।

বর্তমান গ্রন্থে যেমন সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে তেমন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হিশেবে শ্রমের ঐতিহাসিক বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। শ্রম সর্বদাই মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বিনিময়ের উপায়স্বরূপ। শ্রমের মর্মবস্তু মানবজাতির ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে সমরূপ থাকতে পারে। যেমন, সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণ প্রাথমিক পর্যায়ে উৎপাদনের প্রযুক্তিগত ভিত্তির পরিবর্তন ছাড়াও ঘটতে পারে। শ্রমের চরিত্র অবশ্য বৈপ্লবিক পরিবর্তন লাভ করে তখনই যখন উৎপাদনের এক প্রণালী থেকে আরেক প্রণালীতে উত্তরণ ঘটে।

একথা সর্বজনবিদিত যে শ্রম মানুষের চিরন্তন সঙ্গী, তার প্রাণোচ্ছল ক্রিয়াকলাপের এক বাস্তব অপরিহার্যতা। কিন্তু শ্রমের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির সারমর্ম নির্ধারণ করে শ্রমের সামাজিক গঠনপ্রকৃতি। 'শ্রম কী' রচনার লেখক পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমের সামাজিক গঠনপ্রকৃতি বিশ্লেষণে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছেন।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মজদুর শ্রমের আকারে শ্রমের প্রকাশ ঘটে। মজদুর শ্রম হল শ্রমের সেই ঐতিহাসিক রূপ যেখানে উৎপাদনের উপায় এক বহিরাগত শক্তি

হিসেবে, পুঁজির আকারে মানুষের বিরোধিতা করে। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত তার শ্রমশক্তি অর্থাৎ কর্মক্ষমতা পুঁজিপতির কাছে — পুঁজির মালিকের কাছে বিক্রি না করছে ততক্ষণ সে কাজ শূন্য করতে পারছে না। উৎপাদনের উপায়, যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি পুঁজিপতির অধীন থাকায় যেহেতু সেগুলিকে সে মজদুরি শ্রমিকদের শোষণের জন্য ব্যবহার করে সেই হেতু মজদুরি শ্রমের স্বার্থের সঙ্গে পুঁজির স্বার্থ মিলতে পারে না। শ্রমের সামাজিক গঠনপ্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত তার বাধ্যতামূলক চরিত্র — সে বাধ্যতার রূপের যত বৈচিত্র্যই থাকুক না কেন — বৈরত্বাপন্ন সমাজে শ্রমের এক সাধারণ স্বাভাবিক ধর্ম।

সমাজতন্ত্র মজদুরি শ্রম ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়েছে, উৎপাদনের উপায় ও শ্রমশক্তির মধ্যে সংযোগের প্রণালীতে পরিবর্তন সাধন করেছে। শ্রমের প্রকৃতির মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, শ্রমের অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা ও শোষণ তিরোহিত হয়েছে। সমাজের প্রতিটি মানুষের নিজ নিজ চাহিদা মেটানোর জন্য পরিশ্রম করার সামাজিক দায়িত্ব জীবনের নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। পুঁজিবাদ যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রগতি বেকার সমস্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, সেখানে সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতে তা পূর্ণ কর্মনিয়োগ সূনিশ্চিত করে।

সমাজতন্ত্রে শ্রম হল সামাজিক উৎপাদনে মানুষের অংশগ্রহণের মাপকাঠি, বণ্টন ও উপভোগের মানদণ্ড। সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও ফলপ্রসূতা যত

বেশি হবে সামগ্রিকভাবে সমাজের এবং সমাজভুক্ত প্রতিটি মানুষের সমৃদ্ধির মাত্রা বৃদ্ধির সদুযোগও তত বেশি। তবে সমাজতন্ত্রে শ্রম এখনও জীবনের পক্ষে অত্যাवश्यक প্রধান চাহিদায় পরিণত হয় নি। প্রতিটি মানুষের কাছে প্রধানত জীবনধারণের উপায়রূপে তার প্রকাশ। সেই সঙ্গে প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একাধারে সামাজিক চাহিদা মেটানোর উপায় এবং মানুষের ক্ষমতা বিকাশের শর্ত হিসেবে শ্রমের ঐক্যবদ্ধতা দৃঢ় করে তোলার অর্থনৈতিক ভিত্তিসমূহ ইতিমধ্যেই গড়ে উঠছে।

বিশ্ব সভ্যতার বিকাশে শ্রম একটি পরম গুরুত্বপূর্ণ করণশক্তি, কিন্তু শুধু সমাজতন্ত্রের পরিস্থিতিতেই শ্রম সামাজিক মানবতা ও আশাবাদ বিকাশের উদ্বোধনী শক্তিতে পরিণত হচ্ছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রম, মানদ্ব ও সমাজ

মানদ্ব যে সমাজে বাস করে তার মতো সে নিজেও প্রকৃতির একটি অঙ্গ — অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, প্রকৃতির সঙ্গে নিরন্তর পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপে সম্পর্কযুক্ত। মানদ্ব তার প্রাথমিক, প্রাকৃতিক চাহিদার পরিতৃপ্তি ছাড়া — অনবস্থা ও আশ্রয়ের চাহিদা এবং প্রকৃতির অশুভ শক্তির প্রভাব (প্রাকৃতিক বিপর্যয়) থেকে আত্মরক্ষা ইত্যাদি চাহিদা না মিটিয়ে তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না।

প্রকৃতি মানদ্বের জীবনযাত্রা ও কল্যাণের পক্ষে অপরিহার্য সমস্ত বস্তু তৈরি অবস্থায় হাতে তুলে দিতে পারে না। সেগর্দল পেতে গেলে তৈরি করে নিতে হয়। আর তারই জন্য দরকার পরিশ্রম করা। নিজের প্রয়োজনীয় সম্পদ

উৎপাদনের জন্য মানুষ যে মদহর্ভে কাজ করতে শুরুর করে তখনই সে প্রকৃতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। এমন কি যে ফলমূল প্রকৃতি তৈরি অবস্থায় মানুষের হাতে তুলে দিচ্ছে তা সংগ্রহ করা, শিকার এবং মাছ ধরাও মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটা পারস্পরিক আদান-প্রদানের, প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভাব এবং প্রাকৃতিক অবস্থা রূপান্তরের প্রক্রিয়া সূচনা করে।

মানুষ তার শ্রমশীলতা বিকাশের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি থেকে বিশিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। শ্রমের ঐতিহাসিক তাৎপর্যের চমৎকার বিশ্লেষণ দিয়েছেন ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস তাঁর 'বানর থেকে মানুষের বিবর্তনে শ্রমের ভূমিকা' (১৮৭৬) নামে একটি প্রবন্ধে। তিনি দেখিয়েছেন মানুষের খোদ শ্রম, শ্রম সংক্রান্ত কার্যকলাপ এবং নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য নিজের হাতে পরিস্থিতি ও উপায় সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মানুষ হয়ে ওঠা, আদিম মানুষের সংগঠন গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া। এই কারণে শ্রম নিজেই মানুষের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক চাহিদাগুলির একটি। মানবসমাজের সৃজনপর্ব মানুষের শ্রম সংক্রান্ত কার্যকলাপের সঙ্গে, বৈষয়িক উৎপাদন বিকাশের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত।

সে যাই হোক না কেন, শ্রম তাহলে কী?

শ্রম হল মানুষের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কার্যকলাপ যার মাধ্যমে প্রকৃতির সামগ্রীকে সে নিজের চাহিদা পূরণের উপযোগী করে গড়ে তোলে। যে কোনো শ্রমের প্রক্রিয়াকালে মানুষের কার্যিক, স্নায়বিক ও মানসিক

শক্তি ব্যয়িত হয়। শ্রমের ফলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়।

কিন্তু মানুষের অস্তিত্ব ও বিকাশের অত্যাৱশ্যক শর্ত এবং তার শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধির উৎস হিশেবে কাজ করার মধ্যে মানবজীবনে শ্রমের ভূমিকা আদৌ সীমাবদ্ধ নয়। মানুষ তার শ্রমের মাধ্যমে প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরও পরিবর্তন সাধন করে, বৈষয়িক ও আত্মিক সংস্কৃতির এবং নিজের দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটায়।

ইতিহাসের কোন ধারায় এই প্রক্রিয়া ঘটেছিল?

গোড়ার দিকে মানুষ তার প্রয়োজনীয় বৈষয়িক সম্পদ গ্রহণ করত প্রকৃতির কাছ থেকে তৈরি অবস্থায় — একথা আমরা আগেই বলেছি। বহু শত সহস্র বছর ধরে এই পর্যায় চলে। কালক্রমে মানুষ কাঠ, পাথর ইত্যাদি উপাদানের মতো সহজলভ্য যে-সমস্ত উপাদান হাতের কাছে পেত সেগুলি দিয়ে জিনিস তৈরি করতে শিখল। নিজের অপরিহার্য চাহিদা পূরণের জন্য মানুষকে অবশ্যই শ্রমের হাতিয়ার এবং সেগুলির নির্মাণ প্রকৌশলের অবিরাম উৎকর্ষসাধন করতে হত। উৎকর্ষসাধনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের শ্রমদক্ষতা বিকাশের প্রক্রিয়াও পাশাপাশি চলতে লাগল।

একমাত্র শ্রমের কল্যাণেই মানুষের হাত নৈপুণ্যের এমন এক উঁচু স্তরে পৌঁছেছে যে বিরাট বিরাট জলসেচ ব্যবস্থা ও আইফেল টাওয়ার গড়ে তোলা, মাইকেলাঞ্জেলোর মূর্তি নির্মাণ এবং রঙ্গিন টেলিভিশনের ডিজাইন করা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে।

একসঙ্গে কাজ করার ফলে মানুষের নিজেদের মধ্যে বাক্যাবিনিময়ের আবশ্যকতা দেখা দিল। এইভাবে মানুষের ভাষার আবির্ভাব ও বিকাশ ঘটে থাকে। শ্রমের প্রক্রিয়ায় এবং তার মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশার ঘনিষ্ঠ যোগ থাকার ফলে মানুষের চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ ঘটে লাগল। আজ মানুষের চিন্তাশক্তি বাস্তবিকই এমন এক অকল্পনীয় পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে সে মহাকাশযান নির্মাণ করতে পারে, কম্পিউটার, পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর নির্মাণ করতে পারে — এক কথায় মানুষ আজ আকাশকুসুম কল্পনাকেও বাস্তবে পরিণত করেছে।

আপাতদৃষ্টিতে মানুষের শ্রমকে পিঁপড়ে, মৌমাছি, বীবর বা পাখি ধরনের কোনো কোনো প্রাণীর ‘কাজের’ মতো মনে হয়। কিন্তু আসলে মানুষের শ্রম ও ওই সমস্ত প্রাণীর ‘কাজের’ মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। মানুষের শ্রম সর্বদা বুদ্ধিপ্রণোদিত, উদ্দেশ্যমূলক, কিন্তু জীবজন্তুরা পরিচালিত হয় সহজ প্রবৃত্তি দ্বারা। সবচেয়ে দক্ষ যে মৌমাছি তার সঙ্গে সবচেয়ে আনাড়ি স্থপতির পার্থক্য এই যে মোম দিয়ে চাক তৈরি করার আগে সে মনে মনে আখার ভেতরে তার একটা পরিকল্পনা গড়ে তোলে।

মানুষের শ্রমের আরও একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এই যে বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনের জন্য শ্রমের যে হাতিয়ার সে ব্যবহার করে তা তার নিজের তৈরি। প্রাণিজগতে কখনো কখনো এমন কারও কারও সাক্ষাৎ মেলে যারা প্রধানত খাদ্যবস্তু শিকারের জন্য হাতিয়ার

ব্যবহার করে থাকে। যেমন মিশরে গ্রিফন নামে এক জাতীয় শকুন আছে যারা কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাতিয়ার হিশেবে টিল ব্যবহার করে। গালাপাগোস কাঠঠোকরা ছোট ছোট ধারাল লাঠির সাহায্যে গাছের ভেতর থেকে পোকামাকড় খুঁটে বার করে। সামুদ্রিক উঁদ্রিড়াল পাথর দিয়ে ঝিনুকের খোল ভাঙে। শিম্পাঞ্জী নানা রকমের হাতিয়ার ব্যবহার করে। এ সব উদাহরণই কোতূহলজনক বটে, কিন্তু সেগর্দলি প্রাণীর জীবনের আকস্মিক ঘটনামাত্র। জীবজন্তুদের কেউই শ্রমের হাতিয়ার বানায় না। শ্রমের কল্যাণেই মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে বশে আনতে পারে, তাকে দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে, কিন্তু অন্য প্রাণীরা প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে মাত্র — সচেতনভাবে তার উপর প্রভাব বা প্রভুত্ববিস্তারের ক্ষমতা তাদের নেই। এখানেই মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর মৌলিক পার্থক্য, আর এর জন্য সে শ্রমের কাছে ঋণী।

শ্রমের মানবীয়, শিক্ষামূলক কার্যপ্রণালীর সমৃদ্ধি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ব্যক্তিত্বের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশের বাহনরূপে, তার সৃজনী সম্ভাবনা বিকাশের বাহনরূপে শ্রমের প্রতিষ্ঠা ঘটতে থাকে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শ্রম-প্রক্রিয়ার মধ্যে তিনটি মৌল উপাদান আছে।

প্রথম উপাদান — শ্রম নিজে, বা উদ্দেশ্যমূলক কার্যকলাপের প্রক্রিয়া হিশেবে শ্রম।

মানুষের উদ্দেশ্যমূলক কার্যকলাপের দ্বিতীয় মৌল উপাদান হল শ্রমের হাতিয়ার — তাকে শ্রমের উপকরণও

বলা হয় — অর্থাৎ সেই সমস্ত জিনিস, যার সাহায্যে মানুস প্রকৃতির ওপর প্রভাব বিস্তার করে, প্রকৃতির সামগ্রীকে তার নিজের ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তোলে। শ্রমের উপকরণ বৈষয়িক ও আত্মিক — এই দুই ভাগে বিভক্ত। শ্রমের উপকরণের মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে তার সক্রিয় অংশ — উৎপাদনের হাতিয়ার — মেশিন, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম।

উৎপাদনের হাতিয়ারের সাহায্যে মানুস যেন অনেকটা তার নিজের দেহের অঙ্গগুলির শক্তি বৃদ্ধি করে। যেমন, খালি চোখে, বাইরের কোনো যন্ত্রের সাহায্য না নিয়ে তার পক্ষে প্রাণী অথবা উদ্ভিদের কোষের গঠনপ্রকৃতি দেখা সম্ভব নয়, কিন্তু ইলেকট্রনিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সে তা সম্ভব করে তুলেছে।

উৎপাদনের জন্য দালানকোঠা, বায়ুসঞ্চালন ব্যবস্থা, রেলপথ, বড় বড় সড়ক, রাস্তাঘাট ইত্যাদি নির্মাণ, খাল — এগুলিও শ্রমের গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। শ্রমের উপকরণ হিশেবে ভূমিরও একটা ভূমিকা আছে, যেহেতু ভূমি হল সেই স্থান যেখানে শ্রমের প্রক্রিয়া অনর্দিত হয়, ভূমি কৃষিদ্রব্য উৎপাদনের পক্ষে অপরিহার্য প্রাকৃতিক ধর্মের মূর্ত প্রকাশ এবং খনিজসম্পদের (আকরিক লৌহ, হীরক, সোনা, বক্সাইট, তামা, ইউরেনিয়াম, তেল, গ্যাস, পটাসিয়াম লবণ ইত্যাদির) ভাণ্ডার বিশেষ।

আদিম যে মানুস হাতে লাঠি অথবা পাথর নিয়ে তাই দিয়ে নিজের প্রকৃতিদত্ত শক্তি বৃদ্ধি করত, তার কাছ থেকে আমরা বহু সহস্রাব্দ দূরে সরে এসেছি।

আজ মানুষ তার নিজেরই তৈরি হাতিয়ারের সাহায্যে চন্দ্র, মঙ্গল ও শুক্লগ্রহের পর্যন্ত 'নাগাল পাচ্ছে'।

প্রগতির এই দুই প্রত্যস্ত মেরুর মাঝখানেই নিহিত আছে মানুষের প্রকৃতি জয়ের সমগ্র ইতিহাস। অবশ্য এটা ঠিক যে মানুষের প্রকৃতি জয়ের কথাটা শুধু আপেক্ষিক অর্থেই প্রযোজ্য। মানুষ নিজেই তো প্রকৃতির একটি অঙ্গ। মানুষের জীবনের ভিত্তি হিশেবে তার শ্রমসংক্রান্ত কার্যকলাপ প্রকৃতির দেওয়া সামগ্রী ছাড়া সম্পন্ন হতে পারে না। কিন্তু আসল কথাটা হল এই যে প্রকৃতির গোপন রহস্য ও তার ঐশ্বর্য-ভান্ডার উদ্ঘাটন করতে গিয়ে মানুষকে নিরন্তর প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয়। যত বেশি পরিমাণে বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক এবং অন্যান্য সহযোগীদের কাজে লাগানো যায় এই শ্রমের ফলপ্রসূতাও হবে তত বেশি।

আরো এমন কয়েকটি তথ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে যাতে শ্রমের প্রক্রিয়ায় মানুষের সহযোগীদের ভূমিকার অন্তত মোটামুটি মূল্যায়ন করা সম্ভব। বস্তু উৎপাদনের পেছনে মোট যে শক্তি ব্যয়িত হয় আজ থেকে একশ বছরের সামান্য আগে তার মধ্যে মানুষের নিজের শ্রমের ভাগ ছিল ১৫ শতাংশ (শতকরা ৭৯ এবং ৬ ভাগ যথাক্রমে ভারবাহী গবাদি পশু আর যন্ত্রপাতির উপর দিয়ে যেত)। বর্তমানে মানুষের শ্রমের ভাগ হ্রাস পেয়ে শতকরা ৩ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে (ভারবাহী গবাদি পশুর শক্তি ব্যয় হ্রাস পেয়ে হয়েছে শতকরা ১ ভাগ আর যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে তা বৃদ্ধি পেয়ে শতকরা ৯৬ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে)।

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত শ্রম-প্রক্রিয়ার তৃতীয় উপাদান হল শ্রমের সামগ্রী, অর্থাৎ সেই সমস্ত উপকরণ, প্রক্রিয়া সাধন করে যাদের অদলবদল করতে হয়। শ্রমের কোনো কোনো সামগ্রী যেমন কয়লা ও তেলের খনি, আর্কারিক, হীরকখনি, বনসম্পদ ইত্যাদি প্রকৃতির নিজের সরাসরি দান। এগুলি শ্রমের প্রাথমিক সামগ্রী। অন্য আরেক ধরনের সামগ্রী আছে যাকে ব্যবহার করতে গেলে প্রাথমিক প্রক্রিয়া সাধন করে নিতে হয়। যেমন, শস্যের দানা পিষে আটা-ময়দা তৈরি, ধাতু গলানোর জন্য কোক কয়লার প্রক্রিয়া সাধন ইত্যাদি। শ্রমের এ ধরনের সামগ্রীকে কাঁচামাল বা শ্রমের আনুষঙ্গিক সামগ্রী বলা হয়।

সামাজিক উৎপাদনের উষালগ্নে শ্রমের প্রাথমিক সামগ্রী মৃদু তাত্পর্য বহন করত, কিন্তু সামাজিক উৎপাদন বিকাশলাভের সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক সামগ্রীর তাত্পর্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। আধুনিক যুগে কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন শ্রমের সামগ্রী — রাসায়নিক তন্তু, প্লাস্টিক, পলিমার, সংকর ধাতু ইত্যাদি — বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাছাড়া উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় জ্বালানি, লেপন ইত্যাদি নানাবিধ সহায়ক উপাদানও ব্যবহৃত হচ্ছে।

শ্রমের উপকরণ ও সামগ্রী হল শ্রম-প্রক্রিয়ার বস্তু-উপাদান, যার সাহায্যে মানুষ তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করে। সামগ্রিকভাবে সেগুলিই মিলে হয় উৎপাদনের উপায়।

উৎপাদনের উপায় উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় খুবই বড় ভূমিকা গ্রহণ করলে কী হবে, মানুষ ছাড়া তার কোনো

দাম নেই। তন্তু যদি কাপড় বা পশম বোনার কাজে না-ই লাগানো হয় তাকে বিনষ্ট তুলো বা পশম ছাড়া আর কিছই বলা যায় না। মানুষ চামড়ার উপর নিজের শ্রম প্রয়োগ না করলে চামড়া থেকে কখনোই জুতো হত না। জীবন্ত শ্রম এই সব বস্তুকে গ্রহণ করে তাদের পুনরুজ্জীবন ঘটায়। এর জন্য উৎপাদনের উপায়কে মানুষের শ্রমশক্তির সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। মানুষের কার্যিক ও মানসিক ক্ষমতা এবং উৎপাদনের উপায়ের সাহায্যে বৈষয়িক সম্পদ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে যে পেশাগত দক্ষতা ও উৎপাদন সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা সে প্রয়োগ করে, শ্রমশক্তি অর্থে তাকেই বোঝায়।

উৎপাদনের উপায় এবং মানুষের শ্রমশক্তি মিলে সামগ্রিকভাবে সমাজের উৎপাদিকা শক্তি রূপে গণ্য। উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বৃদ্ধি ও উৎকর্ষ প্রাকৃতিক শক্তির উপর মানুষের আধিপত্যের সম্প্রসারণ ঘটায়, মানবসমাজ বিকাশের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। উৎপাদিকা শক্তির মধ্যে মানুষ চূড়ান্ত ভূমিকার অধিকারী। মানুষ উৎপাদনের উপায় শুদ্ধ কাজে লাগায় না, তৈরিও করে। মানুষের কাজ করার ক্ষমতা আছে বলে, উৎপাদনের উপায়ে গতিসত্তার ক্ষমতা আছে বলে সে-ই হল উৎপাদিকা শক্তির মূখ্য উপাদান।

মানুষ কখনও একা এককভাবে বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদন করে নি। এমন কি আদিম মানুষও শিকার করত মিলিতভাবে, জমি চাষ করত একসঙ্গে। আধুনিক উদ্যোগগুলিতে শ্রমিকদের সংখ্যা অনেক সময় বহু

সহস্র হয়ে থাকে। প্রতিটি উদ্যোগ আরও বেশ কয়েকটি উদ্যোগ থেকে, সময় সময় অন্য আরও কয়েক শত উদ্যোগ থেকে কাঁচামাল ও বস্তু-উপকরণ পেয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মোটর কারখানাগুলিকে শত শত যোগানদারের উপর নির্ভর করতে হয়। লোকে উত্তরোত্তর বেশি মাত্রায় মানুষের সৃষ্টিত জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগাচ্ছে। এইভাবে শ্রমের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ অনিবার্যভাবে পরস্পরের সংস্পর্শে আসে, তাদের শ্রম সামাজিক চরিত্র বহন করে। উৎপাদন সর্বদাই সামাজিক উৎপাদন, আর শ্রমও সামাজিক শ্রম।

কেউ কেউ বলেন শ্রমকে যে চরিত্রগতভাবে অবশ্যই সামাজিক হতে হবে তার কোনো মানে নেই। এই প্রসঙ্গে তাঁরা ইংরেজ লেখক ড্যানিয়েল ডিফোর রবিন্সন ক্রুসো নামে পরিচিত চরিত্রের নজির দিয়ে থাকেন। রবিন্সন ক্রুসো প্রায় তিরিশ বছর এক নির্জন দ্বীপে থাকার সময় কৃষিকাজ, পশুপালন ও হস্তশিল্পে নিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে সে ভাঙা জাহাজ থেকে যে-সমস্ত উপকরণ ও হাতিয়ার পেয়েছিল সেগুলি কাজে লাগিয়েছিল, আর তার নিজের পোশাকের পকেটে যে শস্যের বীজ সে পেয়েছিল তাই দিয়ে ফসল ফলিয়েছিল। এ সবই হল আরও বহু লোকের অতীতের শ্রমের ফসল। তাছাড়া ওই বিখ্যাত উপন্যাসের নায়ক উৎপাদনের কৌশল জানত, আর সে কৌশল কোনো এক সময় যখন সে মনুষ্য সমাজে বাস করত তখনই অর্জন করে। সে যাই হোক না কেন, তার পরিপূর্ণ নিঃসঙ্গতা কিন্তু দীর্ঘকাল

চলে নি — দ্বীপে ফ্রাইডের আবির্ভাব ঘটল। তার মানে, রবিন্সন ক্রুসোর কাহিনী আদৌ এই যুক্তি খণ্ডন করছে না যে মানুষ এককভাবে না, সম্মিলিতভাবেই সর্বদা জীবনধারণের উপায় সংস্থান করেছে।

বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় এবং ভোগের মধ্যে দিয়ে মানুষ অপরিহার্যভাবে, নিজের ইচ্ছা ও সচেতন প্রয়াস ছাড়াই নিজেদের মধ্যে বিশেষ ধরনের সামাজিক সম্পর্কের সূচনা করে। সেই সম্পর্কের নাম উৎপাদন সম্পর্ক। একমাত্র এই সামাজিক যোগসূত্র ও সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যেই উৎপাদনের অস্তিত্ব ও মানুষের শ্রম সম্পাদন সম্ভব। তাছাড়া এই সম্পর্কগুলি সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা-রূপের উপর নির্ভর করে। মালিকানার রূপ বলতে বোঝায় উৎপাদনের উপায় ভোগদখল করা এবং ফলত অন্যের শ্রমের ফলাফল ভোগদখল করার নির্দিষ্ট একটা প্রণালী।

উৎপাদনের উপায় কার হাতে আছে তারই ভিত্তিতে উৎপাদন সম্পর্ক ব্যবস্থার মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মানুষের স্থানও নির্ধারিত হয়ে থাকে। জমির মালিক অথবা অন্য যে কোনো ব্যক্তিগত মালিকানার (কলকারখানা, কর্মশালা, ব্যাঙ্ক ইত্যাদির) মালিকের অবস্থা সাধারণ কর্মী, ইঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তিবিদ ইত্যাদি দ্বারা উৎপাদনের উপায়ের উপর কর্তৃত্বকারী ব্যক্তিদের কাছে নিজেদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করে তাদের অবস্থার চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। সুতরাং উৎপাদনের উপায়ের

মালিকানা সম্পর্কের মধ্যেই প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের সামাজিক অবস্থার বিষয়গত মূল পার্থক্য, শ্রম-প্রক্রিয়ায় তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সামগ্রিকভাবে সমাজ ব্যবস্থার চরিত্র নিহিত থাকে।

উৎপাদনের উপায়ের ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্রে বৈষয়িক সামাজিক উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ওই উপায়গুলি থেকে বঞ্চিত প্রাকৃতিক সম্পদ, কলকারখানা, কর্মশালা, ব্যাংক, দোকানপাট এবং উৎপাদনের অন্যান্য উপায়ের অধিকারী নগণ্য সংখ্যালঘু অংশের উপর তাদের অধীনতা দেখা দেয় এবং বজায় থাকে — সে অধীনতা যেমন অর্থনৈতিক হতে পারে, তেমনি অর্থনীতি বহির্ভূতও হতে পারে।

মানবসমাজের ইতিহাসে ব্যক্তিগত মালিকানার বিভিন্ন ধরনের কয়েকটি রূপ দেখা যায়। সেগুলি হল দাসপ্রথাভিত্তিক মালিকানা, সামন্ততান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী মালিকানা।

উৎপাদনের উপায়ের উপরি-উক্ত মালিকানা ব্যবস্থার সঙ্গে উৎপাদনের উপায়ের সামাজিক মালিকানার পার্থক্য এই যে উৎপাদনের উপায়ের উপর মানুষের যৌথ অধিকার এর ভিত্তি। তাই এই ব্যবস্থায় উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সমস্ত মানুষের, অর্থাৎ সমাজের সকল সদস্যের তাদের শ্রমক্ষেত্রে বৈষয়িক পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্ক একই রকম। আদিম গোষ্ঠী সমাজে যার অস্তিত্ব ছিল সেই দলীয় মালিকানা, সার্বজনিক (রাষ্ট্রীয়) সমাজতান্ত্রিক

মালিকানা এবং যৌথখামার ও সমবায় ব্যবস্থাসম্পন্ন সমাজতান্ত্রিক মালিকানা অর্থাৎ যেখানে মালিকানা থাকে মেহনতী কর্মিদলের হাতে — চরিত্রগতভাবে যাকে আমরা সামাজিক মালিকানা বলি এই হল তার বিভিন্ন রূপ।

ভবিষ্যতে সামাজিক মালিকানার সর্বোচ্চ রূপ হয়ে দেখা দেবে উৎপাদনের উপায়ের অখণ্ড কমিউনিস্ট মালিকানা।

ইতিহাসগতভাবে প্রত্যেক যুগে উৎপাদক ও উৎপাদনের উপায়ের মধ্যে সংযোগসাধনের যে বিশেষ ধরনের স্বাভাবিক প্রণালী আছে উক্ত রূপগগুলির প্রতিটিটির মধ্যেই তার প্রকাশ ঘটেছে।

আদিম গোষ্ঠীগত উৎপাদন সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য হল উৎপাদনের আদিম উপায়ের সামাজিক (দলীয়) মালিকানা।

দাস-সমাজে উৎপাদন সম্পর্কের বিশেষত্ব এই যে সেখানে শ্রমের উপকরণ এবং শ্রমের মান্দ্য (দাস) একই ব্যক্তির মালিকানাধীন। দাস-মালিকের কাছে শ্রমের উপকরণ এবং উৎপাদনকারী দাস — সমপর্যায়ের বস্তু, তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

বৃহৎ জমি-মালিকানার ভিত্তিতে গঠিত সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক ছিল জমির মালিক অর্থাৎ সামন্তপ্রভু কর্তৃক কৃষকগণকে শোষণের সম্পর্ক। কৃষকরা সামন্তপ্রভুর জমিতে বেগার দিতে কিংবা নিয়মিতভাবে তাকে খাজনা ও কর দিতে বাধ্য থাকত।

পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে উৎপাদনের মূল উপায়গুলির (কলকারখানা, খনি ইত্যাদি) ব্যক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমশক্তি অর্থাৎ উৎপাদনকারীরা আর ব্যক্তিগত পরাধীনতার বন্ধনে বাঁধা নয়। ব্যক্তিগতভাবে মদুস্ত বটে, কিন্তু উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে জীবনধারণের খাতিরে তাদের শ্রমশক্তি বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। পণ্যদ্রব্যের মতো এই শ্রমশক্তিকে ক্রয় করার পর উৎপাদনের উপায়ের মালিক অর্থাৎ পুঁজিপতি মদুনাফার জন্য তাকে যতদূর সম্ভব বেশি কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। এইভাবে এক দিক থেকে উৎপাদনকারী শ্রমের উপকরণ অধিগত করার সদুযোগ অর্জন করে, তার সঙ্গে যদুস্ত হয়ে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্য দিক থেকে শ্রমশক্তি তার নিজস্ব মদুল্যের উপরে যে মদুল্য উৎপাদন করতে সক্ষম নিয়োগকর্তা সেই উদ্বৃত্ত-মদুল্যের (মদুনাফা) দরদুন ধনী হওয়ার সদুযোগের সদ্ব্যবহার করে। পুঁজিপতি সেই উদ্বৃত্ত-মদুল্য আত্মসাৎ করে।

উৎপাদন সম্পর্কের বৈরভাবাপন্ন চরিত্রের উচ্ছেদ সাধন করতে পারলে পরিস্থিতির আমদুল পরিবর্তন ঘটে। সেটা সম্ভব হয় একমাত্র উৎপাদনের উপায়ের সামাজিক মালিকানার পরিস্থিতিতে, যা কিনা কমিউনিস্ট উৎপাদন সম্পর্ক এবং তার প্রথম পর্যায় সমাজতন্ত্রের সহজাত বৈশিষ্ট্য। নীতিগতভাবে নতুন ধরনের উৎপাদন সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করে সমাজতন্ত্র মানদুষের উপর মানদুষের শোষণের অবসান

ঘটায়, অপরের শ্রমের ফল আত্মসাৎ করে যে সব সামাজিক শ্রেণী জীবনধারণ করে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার উপযোগী পরিবেশের বিনাশ ঘটায়। তৎসত্ত্বেও সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের মধ্যেও মূল দুই মেহনতী শ্রেণীর মধ্যে — শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভেদ সম্পূর্ণ ঘুচে যায় না। উৎপাদনের উপায়ের সামাজিক মালিকানার দুই রূপের মধ্যে — রাষ্ট্রীয় এবং সমবায় ও যৌথখামারী মালিকানার মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান, সমাজতন্ত্রে যেহেতু তা সঙ্গে সঙ্গে অতিক্রান্ত হয় না সেই হেতু এই পার্থক্য থেকেই যায়। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎকর্ষসাধন ও কমিউনিজমের দিকে তার ক্রমিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই পার্থক্যের ধীরে ধীরে অবসান ঘটবে।

এইভাবে মানবসমাজের ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে উৎপাদনের অভ্যন্তরীণ উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের সামগ্রিকতার মধ্যে প্রতিটি নির্দিষ্ট উৎপাদন-প্রণালীর বিকাশের বৈশিষ্ট্য হল মালিকানার রূপ পরিবর্তন। আদিম গোষ্ঠী প্রথা থেকে দাস-সমাজ, তা থেকে সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিবাদী এবং অতঃপর কমিউনিস্ট সমাজে উত্তরণের ইতিহাস একেকটি নির্দিষ্ট উৎপাদন-প্রণালীর জায়গায় আরেকটির প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। মূলত এ হল উৎপাদনের উপায়ের মালিকানার ধারাবাহিক রূপের একটির বদলে আরেকটির আগমনের ইতিহাস।

উৎপাদনের এক প্রণালীর জায়গায় আরেক প্রণালীর এই যে আবির্ভাব, কিসের ওপর তা নির্ভর করে?

উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে উঠে নির্দিষ্ট উৎপাদিকা শক্তির ভিত্তিতে; সেই সম্পর্কগুলি নিজেরাই আবার এই শক্তির উপরও সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে। নির্দিষ্ট উৎপাদিকা শক্তির চরিত্রোপযোগী প্রগতিশীল উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তির বিকাশকে এবং সেই সঙ্গে সামগ্রিকভাবে বৈশ্বিক উৎপাদনকে, তার কার্যকারিতার উৎকর্ষসাধন দ্রুত করে তুলতে সাহায্য করে। অন্য দিকে মান্ব্যাতার আমলের পূর্বনো উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তার বিকাশের ধারা রুদ্ধ করে দেয়।

এ থেকে দেখা দিচ্ছে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের মাত্রা ও চরিত্র অনুযায়ী উৎপাদন সম্পর্কের সাদৃশ্যের নিয়ম। ব্যক্তিগত মালিকানা ও শোষণের ভিত্তিতে গঠিত যে কোনো উৎপাদন-প্রণালীর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই নিয়মের লঙ্ঘন ঘটতে থাকে। এই অসামঞ্জস্যের কারণ হল অপেক্ষাকৃত সক্রিয় উৎপাদিকা শক্তি এবং তুলনামূলকভাবে তার দ্রুত বিকাশ থেকে সচরাচর পিছিয়ে পড়া যে-সমস্ত উৎপাদন সম্পর্ক তাকে ব্যাহত করছে এই দুয়ের মধ্যে বিরোধ। তাদের মধ্যে বিরোধের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যার আওতায় এই বিরোধ বৃদ্ধি পেতে পেতে সংঘাতের আকার ধারণ করে সেই সামাজিক সংগঠনেরও আমূল পরিবর্তন অবশ্যপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এইভাবে সেকেলে অচল উৎপাদন সম্পর্কের উচ্ছেদ ঘটিয়ে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক

প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজ বিপ্লবের আবশ্যকতা দেখা দেয়।

উৎপাদন সম্পর্ক অর্থাৎ উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের সম্পর্ক সামগ্রিকভাবে মিলে সমাজের বনিয়াদ অথবা অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলে। এই বনিয়াদের উপরেই বিচিত্র সামাজিক সম্পর্ক, ধ্যানধারণা ও সংস্থার আবির্ভাব ও বিকাশ ঘটে। যে কোনো সমাজের বনিয়াদের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা তার অতিসৌধ থাকে — সেগদুলি হল রাজনৈতিক, ভাবাদর্শমূলক, আইন সংক্রান্ত, নৈতিক ও ধর্মীয় কতকগুলি সম্পর্ক, যাদের পেছনে আবার থাকে যথোপযুক্ত কতকগুলি সংগঠন ও সংস্থা (রাষ্ট্র, পার্টি, সামাজিক সংগঠন, দেবালয় ইত্যাদি) এবং সমাজ চৈতন্যের বিশিষ্ট কিছু রূপ (ভাবধারা, তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি)। অতিসৌধের শ্রেণীচরিত্র আছে: তা বনিয়াদকে সেবা করে, তাকে রক্ষা করে, সমাজের প্রতিপত্তিশালী শ্রেণীর স্বার্থের পরিপোষক হয়। সমাজ বিপ্লবের সময় পূরনো বনিয়াদের উচ্ছেদ সাধন ঘটে, একই সঙ্গে তার উপরের অতিসৌধের সামগ্রিক ওলটপালট ঘটে।

যে সমাজ তার ঐতিহাসিক বিকাশের কোনো একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, তার উৎপাদন-প্রণালী, অর্থনৈতিক গঠনপ্রকৃতি (বনিয়াদ) এবং তদুপযোগী অতিসৌধ অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নামে সামগ্রিক দেহবস্তুরূপে গণ্য।

ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া বলতে বোঝায় পর্যায়ক্রমে একটির জায়গায় আরেকটি সামাজিক-অর্থনৈতিক

ব্যবস্থার আগমন। পরম্পরাগত এগুনের একেকটি হল সভ্যতার একেকটি অগ্রপদক্ষেপ, দামাজিক বিকাশের উচ্চতর স্তর।

শ্রেণী বিরোধ ভিত্তিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় (দাস-সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিবাদী) নগণ্য কিছু সংখ্যালঘু মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ থেটে খাওয়া মানুষকে শোষণ করে, তাদের উপর অত্যাচার চালিয়ে বেঁচে থাকে। যাদের অনেক আছে এবং যাদের কিছুই নেই এই দুই শ্রেণীর মূল স্বার্থের আপসহীনতার মধ্যেই নিহিত আছে তাদের পরস্পরের মধ্যকার সংগ্রামের উৎস। আপসহীন শ্রেণী সংগ্রামের ফলে এক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে আরেক ব্যবস্থায় উত্তরণ ঘটে থাকে। শ্রেণী সংগ্রামই হল বৈরভাবাপন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিকাশের চালিকা শক্তি, আর তারই চরম প্রকাশস্বরূপ সমাজ বিপ্লব হল সেই নিয়ম যার দ্বারা নিম্নস্তরের ব্যবস্থা থেকে উচ্চস্তরের ব্যবস্থায় উত্তরণ নির্ধারিত হয়ে থাকে।

প্রতিটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শ্রমের নিজস্ব রূপ, মর্মবস্তু ও চরিত্র আছে। সে সম্পর্কেই একটু পরে আমরা আলোচনা করব। সেই সঙ্গে সবগুণী সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই এমন সমস্ত শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে যাদের প্রভাব সর্বজনীন। এই ধরনের শক্তির মধ্যে সর্বাপ্রাে উল্লেখ করতে হয় শ্রম-বিভাজন ও শ্রম-সহযোগিতার।

শ্রম-বিভাজন যত প্রকট হয়ে উঠতে থাকে মানুষের বিকাশের ক্ষেত্রে শ্রমের ভূমিকাও তত বেশি বৃদ্ধি পেতে

থাকে। শ্রম-বিভাজন পরিণামে সমাজের মূল উৎপাদিকা শক্তিস্বরূপ যে মানুষ, তার শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। শ্রম-বিভাজনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শ্রম সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা ও অভ্যাস সঞ্চিত হয়, ব্যক্তি মানুষের যোগ্যতা ও জ্ঞানের উৎকর্ষ ঘটে।

শ্রম সংক্রান্ত উদ্যোগের নানা রূপের বিচ্ছিন্নতাস্বরূপ এই শ্রম-বিভাজন দু'টি উপবিভাগে ভাগ করা যায়: সমাজের অভ্যন্তরে এবং পৃথক কোনো আলাদা উদ্যোগের অভ্যন্তরে।

সমাজের অভ্যন্তরীণ শ্রম-বিভাজন সংঘটিত হয় উৎপাদনের প্রকার অনুযায়ী (শিল্প, কৃষি, যানবাহন, নির্মাণকর্ম ইত্যাদি)। উৎপাদনের প্রকারকেও আবার আরও নানা বিভাগে ও উপবিভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন শিল্পকে মেশিন নির্মাণ শিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, খাদ্য শিল্প ও বয়ন শিল্প ইত্যাদি নানা ভাগে ভাগ করা যায়।

বিশেষ কোনো উদ্যোগের অভ্যন্তরে শ্রম-বিভাজনের অর্থ হল বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তির লোকদের মধ্যে—ইস্পাত নির্মাণকারী, খনিমজদুর, ছুতোর, অভিনেতা ইত্যাদির মধ্যে শ্রমের বিভাজন।

শ্রম-বিভাজন শ্রমের সামাজিকীকরণের এক উল্লেখযোগ্য দিক। শ্রমের সামাজিকীকরণ বলতে যা বোঝায় তা হল সামাজিক উৎপাদনদ্রব্যের উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের প্রক্রিয়ায় মানুষে মানুষে সামাজিক শ্রম-বিভাজনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা অর্থনৈতিক সম্পর্ক। উৎপাদিকা শক্তি ও উৎপাদন

সম্পর্ক বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্কও জটিলতা প্রাপ্ত হতে থাকে।

শ্রমের সামাজিক বিভাজনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রূপ হল উৎপাদনের বিশেষীকরণ। উৎপাদনের স্বয়ংসম্পূর্ণ, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার মধ্যে এই বিশেষীকরণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষীকৃত শিল্পশাখা ও শিল্পোদ্যোগের প্রধান লক্ষণ — কোনো এক বিশেষ ধরনের, একই জাতীয় দ্রব্য উৎপাদন।

বিশেষীকরণের ফলে বস্তুর যে ধারাবাহিক ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয় তা উচ্চ উৎপাদনক্ষমতাসম্পন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের, উন্নত প্রয়োগকৌশল প্রচলনের এবং উৎপাদন ও শ্রম সংগঠনের সর্বাপেক্ষা কার্যকর রূপের শর্ত হয়ে দাঁড়ায়। এক কথায়, বিশেষীকরণ বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত উন্নতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্তস্বরূপ।

মানবসমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রম-বিভাজনের নয়, শ্রম-সহযোগিতারও বৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

শ্রম-সহযোগিতা হল সামাজিক শ্রমের এমন এক রূপ যে ক্ষেত্রে বেশ কিছু সংখ্যক লোক পারস্পরিক ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একই কাজ অথবা তাদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্কিত কাজ সম্পাদন করে থাকে।

শ্রম-সহযোগিতা বহির্ভূত ব্যক্তিগত শ্রমের তুলনায় শ্রম-সহযোগিতা বিরাট শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। শ্রম-সহযোগিতার ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ

কাজ করা যায়, বড় বড় নির্মাণকর্ম সম্পাদন করা যায়।

শ্রম-বিভাজনের মতো শ্রম-সহযোগিতাও একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। উৎপাদনকারীদের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্পর্কের জটিলতাপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতি-পর্যায়ে শ্রম-সহযোগিতার অপরিহার্যতা দেখা দেয়।

শ্রম-বিভাজনের মতো শ্রম-সহযোগিতারও দুটো দিক আছে: প্রযুক্তিগত-অর্থনৈতিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক। প্রযুক্তিগত-অর্থনৈতিক দিকের ভিত্তিস্বরূপ আছে যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং সমাজের শ্রম সম্পদ, বৈষয়িক ও অর্থ সম্পদের সহযোগিতা। সহযোগিতার এই দিকটি সমাজের উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। সামাজিক-অর্থনৈতিক দিকের ভিত্তিস্বরূপ আছে উৎপাদনের উপায়ের ক্ষেত্রে মালিকানার রূপ। এবারে আমরা বিচার করে দেখব প্রথম দিকটি, অর্থাৎ দেখব কীভাবে যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যবহার মানুষের শ্রমের অন্তর্বস্তুর পরিবর্তন ঘটায়।

শ্রমের অন্তর্বস্তুর বলতে আমরা যা বুঝি তা হল শ্রমে ব্যবহৃত শ্রমের উপকরণ ও কাঁচামাল, শ্রমিকের কার্যপ্রণালী এবং উৎপাদিত বস্তুর প্রকৃতির বিচারে শ্রমের চারিত্রবৈশিষ্ট্য। শ্রম সংক্রান্ত কার্য পরিচালনার মর্মবস্তুতে পরিবর্তনের মূল করণশক্তি হল শ্রমের হাতিয়ারের বিকাশ। শ্রমের হাতিয়ারের উৎকর্ষসাধনের

সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের অন্তর্বস্তুর কীভাবে পরিবর্তিত হয় তা বুদ্ধিতে গেলে কোদাল অথবা শাবল দিয়ে একজন মাটি-কাটা-মজদুরের নদমা খোঁড়া এবং মাটি-খোঁড়া যন্ত্রের চালকের শ্রম, গাঁইতি দিয়ে একজন খনিমজদুরের খনি খোঁড়া এবং খনির স্তর কাটা যন্ত্র দিয়ে একজন খনিমজদুরের শ্রমের তুলনা করলেই যথেষ্ট হবে।

নতুন নতুন ধরনের কাঁচামাল ও উপকরণ ব্যবহারের ফলে শ্রমের অন্তর্বস্তুর পরিবর্তন ঘটে। যেমন কৃষিযন্ত্রপাতি, বিমান ও খনিজ সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে চাষীদের শারীরিক শ্রমের লাঘব ঘটছে, তাদের শ্রম ক্রমেই বেশি করে কলকারখানার শ্রমের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে।

শুদ্ধ শ্রমের উপকরণের উৎকর্ষসাধনের সঙ্গে সঙ্গে নয়, মানুষের উত্তরোত্তর জটিল কর্মপরিচালনার ক্ষমতা এবং বড় বড় লক্ষ্য সামনে রেখে সেই লক্ষ্য অর্জনের ক্ষমতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেও শ্রমের অন্তর্বস্তুর পরিবর্তন ঘটে। পুরুষানুক্রমে শ্রমের অন্তর্বস্তুর পরিবর্তন দেখা যায়, শ্রম হয়ে উঠতে থাকে আরও বিচিত্র, আরও বহুমুখী। এইভাবেই মানবসমাজের বিকাশে শ্রমের ভূমিকার উন্নতির (শ্রম-বিভাজনের) সঙ্গে সঙ্গে শিকার ও পশুপালনের সঙ্গে কৃষিকর্ম, অতঃপর সূতো কাটা, তাঁত বোনা, ধাতু প্রসেসিং, মৃৎপাত্রাদি তৈরি, নৌচালন ইত্যাদি যুক্ত হতে থাকল। ব্যবসা-বাণিজ্য ও হস্তশিল্পের পাশাপাশি দেখা দিল শিল্পকলা ও বিজ্ঞান; কায়িক ও মানসিক কাজের,

গ্রাম ও শহরের প্রভেদ দেখা দিল। শূদ্ধ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার বৃদ্ধি নয়, কর্মীদের শিক্ষাদীক্ষা ও যোগ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেও শ্রমের অন্তর্বস্তুর পরিবর্তন ঘটে।

নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার সুযোগ কাজে লাগানোর পরিমাণের উপরও শ্রমের অন্তর্বস্তু নির্ভর করে। যত বেশি সেই সুযোগ কাজে লাগানো যায়, এক্ষেত্রে বৈচিত্র্যহীন হাতের কাজের পরিমাণও তত হ্রাস পায়।

অন্তর্বস্তুর বিচারে মানুষের শ্রম সরল হতে পারে বা জটিল হতে পারে, কায়িক হতে পারে, মানসিকও হতে পারে, সৃজনশীল হতে পারে আবার সৃজনশীল নাও হতে পারে, তার শ্রম যেমন পরিচালকের শ্রম হতে পারে, তেমনি কার্খানির্বাহকের শ্রমও হতে পারে।

সরল শ্রম হল সেই শ্রম যেখানে কর্মীর কোনো বিশেষ প্রস্তুতি বা যোগ্যতার দরকার হয় না — যাকে বলা হয় অদক্ষ শ্রম। জোগানদার শ্রমিক ও মদুটের কাজ এই শ্রমের পর্যায়ে পড়ে।

টার্নার, ফিটার, বিদ্যুৎকর্মী, অপারেটর ইত্যাদি ধরনের কর্মীদের কাজে ঢোকার আগে কম-বেশি পরিমাণে দীর্ঘ, বিশেষ শিক্ষাক্রমে তালিম নিতে হয়। এই যে বিশেষীকৃত শ্রম, যার জন্য বিশেষ ধরনের প্রস্তুতির, তালিমের দরকার হয় তাকে বলে জটিল শ্রম। জটিল শ্রম অনেকটা যেন সরল শ্রমেরই এক বহুগুণবৃদ্ধিপ्राप्त উন্নত পর্যায়।

এরই ভিত্তিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নগর ও পল্লীর

মধ্যে বিরোধ আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। শহরাঞ্চলে বড় বড় কলকারখানা, ব্যাঙ্ক, যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রমশক্তি এবং শ্রমের অপেক্ষাকৃত উচ্চ উৎপাদনশীলতা থাকায় পল্লী অঞ্চলের সরল, অপেক্ষাকৃত ন্যূন পরিমাণে শিল্পযোজিত শ্রম ক্রমেই পুঞ্জিবাদি শহরের চরম শোষণের শিকার হতে থাকে।

এক অর্থে ‘নগর’ ও ‘পল্লীর’ মধ্যে — বৃহৎ বৃহৎ উন্নত পুঞ্জিবাদী রাষ্ট্র আর এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে এই যে বিরোধ (এই বিরোধকে আরও ‘আধুনিক ভাষায়’ ‘উত্তর’ ও ‘দক্ষিণের’ মধ্যকার বিরোধও আখ্যা দেওয়া যেতে পারে) তা আজ গভীর অর্থনৈতিক সংকটের পর্যায়ে উঠেছে। বড় বড় একচেটিয়া কারবারীদের নয়া উপনিবেশবাদী নীতি, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের বৈষম্য এবং বৈদেশিক ঋণের বিপুল বোঝা, যার পরিমাণ আকাশ ছোঁয়া এক লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে — এ সবের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলির অনেকেরই যা হাল হয়েছে তাকে এক কথায়, শোচনীয় বলা যেতে পারে। উন্নত পুঞ্জিবাদী দেশগুলির সঙ্গে একমাত্র অসম বাণিজ্যিক বিনিময়েরই যা ফল হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলির উৎপন্নদ্রব্যের — খনিজসম্পদ, চিনি, মাংস, কলা এবং আরও বহু চিরাচরিত রপ্তানি দ্রব্যের মূল্যমান দিন দিন কমে যাচ্ছে, অথচ মোশিন, যন্ত্রপাতি, ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ইত্যাদি আমদানি দ্রব্যের দর সমানেই বেড়ে চলেছে।

এই অসম বিনিময় ব্যবস্থার ফলে একমাত্র লাতিন আমেরিকার দেশগুলিরই ১৯৮৪ সালে ২ হাজার কোটি মার্কিন ডলার লোকসান গেছে। এই পরিস্থিতিতে ঋণগ্রস্ত হওয়া এবং উল্লিখিত বিরোধের তীব্র আকার ধারণ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

কার্যিক শ্রম ও মানসিক শ্রমের পৃথক্করণ প্রসঙ্গে এই কথাই বলতে হয় যে তাদের স্বতন্ত্র বিকাশ শ্রমের আরও গভীর সামাজিক বিভাজনের অন্যতম রূপ হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের শ্রম তার নিজস্ব প্রকৃতিতে অঙ্গাঙ্গিভাবে মস্তিষ্ক ও পেশীর কাজকে প্রকৃতির উপর প্রভাব এবং প্রকৃতির রূপান্তরসাধনের একক প্রক্রিয়ার সূত্রে গ্রথিত করে। কিন্তু শ্রম-প্রক্রিয়ায় মানুষের মানসিক ও কার্যিক ক্রিয়াকলাপের এই সংযোগ ও পারস্পরিক প্রভাব এক জটিল ও পরস্পরবিরোধী চরিত্র বহন করে, তার মধ্যে নিহিত থাকে উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তাদের বিষদুস্ত করার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা।

উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের একটা বিশেষ পর্যায়ে শ্রম-প্রক্রিয়া থেকে তার একটি উপাদান — প্রকৃতি ও সমাজ বিকাশের নিয়ম উপলব্ধির প্রক্রিয়া হিশেবে মানসিক কার্যকলাপ এবং বিজ্ঞান, শিল্পকলা ইত্যাদি রূপে তার স্বতন্ত্র বিকাশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শ্রম যতক্ষণ পর্যন্ত বিখণ্ডিত না হচ্ছে ততক্ষণ মানসিক কার্যকলাপের বিকাশ সীমাবদ্ধ থাকে, কার্যিক কাজের প্রাধান্যের ফলে তাতেই মানুষের সমস্ত সময় ও শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যায় বলে তার বিকাশ ব্যাহত হয়।

শ্রমের বিকাশ যত কম, তার উৎপাদনশীলতা যত কম, মানবসমাজ তার জৈবিক পুনরুৎপাদনের পেছনে (অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর পেছনে) তত বেশি কার্যিক শক্তি ব্যয় করে, আর অন্য কোনো কাজ করার পক্ষে — সর্বোপরি মানসিক কার্যকলাপের পক্ষে — তার ততই কম শক্তি ও সময় থাকে।

শ্রম-বিভাজনের ফলে দেখা গেল অধিকাংশ লোকই প্রধানত কার্যিক শ্রমের ক্ষেত্রে নিযুক্ত; সামান্য কিছু সংখ্যক লোক — সচরাচর তারা শাসক শ্রেণীভুক্ত — মানসিক শ্রম নির্বাহ করে। তারা কর্মপরিচালনা করে, রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাজ করে, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার চর্চা করে। এর ফলে কার্যিক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে একটা বিরোধ দেখা দেয়, কেননা এক্ষেত্রে মানসিক শ্রমে নিযুক্ত লোকেরা কার্যিক শ্রমে নিযুক্ত কর্মীদের শোষণ করে।

শ্রমে মানসিক কার্যকলাপের উপাদান বুদ্ধি শ্রমকে সৃজনী প্রক্রিয়ায় রূপান্তরে সহায়তা করে। সৃজনী শ্রম হল এমন এক শ্রম যার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একজন কর্মী অসাধারণ, প্রচলিত মান-বহির্ভূত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে, তাকে যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে তার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সে উপলব্ধি করতে পারে। এর জন্য কর্মীকে হতে হবে উপযুক্ত তালিমপ্রাপ্ত, তাকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত প্রগতির আধুনিকতম সাফল্য সম্পর্কে রীতিমতো ওয়াকিবহাল থাকতে হবে। যে শ্রম সৃজনশীল নয় তা বৈচিত্র্যহীন,

একঘেয়ে — অনেকটা যেন আগে থাকতেই বোধে দেওয়া। এ ধরনের কাজের নিদর্শন — কনভেন্সরের কাজ।

আর আছে পরিচালকের কাজ — এ কাজ স্বভাবতই সৃজনধর্মী, যেহেতু একজন পরিচালককে তার অধীনস্থ লোকেদের কাজ সংগঠনে, তাদের কর্মসংস্থান ও ব্যবস্থাপনার পেছনে উদ্যোগ নিতে হয়। অন্য দিকে কর্মনির্বাহী শ্রমিকের শ্রম সেই তুলনায় অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ ও বিশেষীকৃত এবং অন্যদের নির্দেশের উপর নির্ভরশীল, সেই কারণে তার প্রক্রিয়াও অপেক্ষাকৃত কম সৃজনধর্মী।

সামাজিক-অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে গেলে শ্রম-বিভাজন সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের উপায়ের মালিকানার রূপের উপর নির্ভর করে এবং শ্রমের চরিত্রে মৌলিক পরিবর্তন সূচনা করে। এখানে একটু বিশদ আলোচনার প্রয়োজন।

আমরা আগেই বলেছি যে উৎপাদিকা শক্তির চূড়ান্ত উপাদান হল শ্রমের হাতিয়ার — উপকরণ, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি। এগুলির বিকাশের স্তরই প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্বের সূচক, শ্রমশক্তির নিজের, অর্থাৎ মানুষ এবং সামগ্রিকভাবে সমাজ যে উৎপাদনক্ষমতার অধিকারী তার বিকাশের মাপকাঠি। তাছাড়া শ্রমের হাতিয়ার উৎপাদিকা শক্তির সবচেয়ে সচল উপাদান। উৎপাদন বিকাশের প্রতিটি ঐতিহাসিক পর্বে প্রধান বৈশিষ্ট্য সর্বোপরি শ্রমের হাতিয়ার কতটা উন্নত তারই মধ্যে নিহিত।

মানুষ কীভাবে কাজ করে — সমবেতভাবে না এককভাবে — তা নির্ভর করে শ্রমের কোনো হাতিয়ার মানুষ ব্যবহার করে তার উপর। এই কারণে বলা যেতে পারে যে শ্রমের হাতিয়ারের চরিত্র, অর্থাৎ সেই হাতিয়ার সমবেত না একক ব্যবহারের উপযোগী তা শ্রমের যথোচিত চরিত্র নির্ধারণ করে।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আদিম গোষ্ঠী-সমাজব্যবস্থার পরিস্থিতিতে মানুষ স্বৈ-সমস্ত প্রাথমিক হাতিয়ার ব্যবহার করত সেগুণের আদিম সামাজিক চরিত্রের হেতু হল সমবেত শ্রমের প্রয়োজনীয়তা। শ্রমের হাতিয়ারের সমবেত ব্যবহার, অর্থাৎ সমবেত শ্রমের কারণে উৎপাদনের উপায় অধিকারের রূপ ছিল যৌথ, আর সেই হেতু উৎপাদনের উপায়ের মালিকানার প্রথম ঐতিহাসিক রূপটিও ছিল দলগত, সামাজিক। সেখানে কোনো মানুষের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে উৎপাদনের উপায় অধিকার করার এবং অন্যদের তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোনো সুযোগ ছিল না, অর্থাৎ মানুষে মানুষে শোষণের সম্পর্ক ছিল না।

যত বেশি সম্ভব দ্রব্য উৎপাদন করে বহুলতর পরিমাণে নিজের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করতে গিয়ে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ তার ব্যবহৃত শ্রমের হাতিয়ারের উৎকর্ষসাধন করে। আদিম গোষ্ঠী-সমাজব্যবস্থার স্তরে শ্রমের হাতিয়ারের উৎকর্ষসাধনের ফলে শ্রমের হাতিয়ারের ব্যক্তিগত চরিত্রপ্রাপ্তি ঘটল। শ্রমের একক ব্যক্তিগত হাতিয়ার বলতে এমন হাতিয়ার বোঝায় যা একজনের ব্যবহারের উপযোগী — ওই

হাতিয়ার দিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে একেকজন মানুষ কাজ করতে পারে।

শ্রমের হাতিয়ারের ব্যক্তিগত, বিশেষীকৃত চরিত্র — লাঙল, কুমোরের ঢাকা, তক্‌লি, তীরধনুক এবং উক্ত চরিত্রের ভিত্তিতে গঠিত ব্যক্তিগত, একক শ্রম উৎপাদনের উপায় অধিকারের প্রণালীতে পরিবর্তনের সূচনা করল — যৌথ অধিকার থেকে ব্যক্তিগত অধিকারে অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়ের ব্যক্তিগত মালিকানায় উত্তরণ অপরিহার্য হয়ে উঠল। উৎপাদনের পরিবর্তন এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষের অংশগ্রহণের চরিত্র পরিবর্তনের ফলে এ ধরনের উত্তরণ অনিবার্য ছিল।

এইভাবে, উৎপাদনের মূল উপায় — জমি, কলকারখানা, রেলপথ, বিমান ইত্যাদি, ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে না সামগ্রিকভাবে সামাজিক মালিকানাধীনে — কার হাতে আছে, শ্রমের প্রক্রিয়াকালে কে এগুনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে, তারই উপর নির্ভর করছে শ্রমের চরিত্র। উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা সম্পর্ক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের প্রক্রিয়ার মধ্যে মানুষে মানুষে সম্পর্কের চরিত্রেও পরিবর্তন ঘটে।

অতএব এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে শ্রমের চরিত্র সমাজব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত — প্রতিটি সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল তার শ্রমের বিশেষ রূপ।

আদিম গোষ্ঠী-সমাজব্যবস্থায় যার সাহায্যে মানুষ তার জীবনধারণের সামান্যতম উপায় সংস্থান করত, সেই শ্রমের হাতিয়ার ছিল পাথর আর লাঠিসোঁটার

মতো একেবারেই আদিম। একথা আমরা আগেই বলেছি। এই পরিস্থিতিতে দলগত মালিকানা এবং সমমাত্রিক বণ্টন ব্যবস্থার ফলে একদল মানুষের অসাফল্য আরেক দলের সাফল্য দিয়ে পূরিয়ে যেত এবং মোটের ওপর সকলেরই ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর গ্যারান্টি ছিল। যেমন, গোষ্ঠীর সদস্যদের এককভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে সংগৃহীত যে-কোন খাদ্য সমগ্র যুথের সম্পূর্ণ মালিকানাধীনে আসত। তেমনি মানুষ যার সাহায্যে পশুপাখি শিকার করত, মাছ ধরত সেই হাতিয়ারও ছিল সমগ্র গোত্র বা গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ মালিকানাধীন। সকলের শ্রম এবং পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটি মানুষের শ্রম ছিল সকলের জন্য।

আদিম গোষ্ঠী-সমাজব্যবস্থা মানবসমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে এক দীর্ঘকালীন পর্যায় — এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সামাজিক শ্রম-বিভাজন প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। চাষবাস, পশুপালন, হস্তশিল্প ও বাণিজ্য বৈষয়িক উৎপাদনের স্বাধীন স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে পরিণত হল। ফলমূল ও শাকসবজি সংগ্রহ ও বন্যজন্তু শিকার করা থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে ফসল, ফলমূল ও শাকসবজি ফলানো এবং গৃহপালিত জীবজন্তুর বংশবৃদ্ধি করার দিকে মানুষের যে প্রবণতা দেখা দিল তাকে মানবসমাজের অগ্রগতির ইতিহাসে এক গুরুগত মোড় পরিবর্তন বলতে হয়। মানবসমাজের এই স্তরে শ্রম বিকাশের প্রধান করণশক্তি ছিল শ্রম-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আদিম হাতিয়ারের ব্যবহার থেকে শ্রমের জটিলতর হাতিয়ার নির্মাণের কাজে উত্তরণ।

শ্রম-প্রক্রিয়ার মধ্যে কাজ করে দু' ধরনের শ্রম — জীবন্ত শ্রম ও বাস্তবায়িত শ্রম। জীবন্ত শ্রম হল নির্দিষ্ট বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদনের পেছনে মানুষের লক্ষ্যনিষ্ঠ কার্যকলাপ। অন্য দিকে উৎপাদনের উপায় (যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, দালানকোঠা, জ্বালানি, কাঁচামাল ইত্যাদি) তৈরি করার পেছনে মানুষ অতীতে যে শ্রম ব্যয় করেছে তাকে আমরা বলছি বাস্তবায়িত শ্রম।

উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়িত শ্রমের ভাগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই কারণে উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগের প্রক্রিয়ায় মানুষে মানুষে সম্পর্কের উপর উৎপাদনের উপায়ের মালিকদের প্রভাবও বৃদ্ধি পেতে থাকে। উৎপাদনের উপায়ের মালিক সেগুন্টি আরও বেশি পরিমাণে পেতে আগ্রহী, যেহেতু তা তার আরও বেশি বৈষয়িক ও আর্থিক কল্যাণের প্রতিশ্রুতিবহ। এর জন্য, যে-সমস্ত লোকের হাতে উৎপাদনের উপায় নেই তাদের দিয়ে সে নিজের জন্য কাজ করিয়ে নেয়।

উৎপাদনের উপায়ের ব্যক্তিগত মালিকানা উদ্ভবের ফলে শ্রম-বিভাজন আরও প্রকট হয়ে উঠল। উৎপাদনকারীর নিজের ভোগের জন্য যতটা নয় তার চেয়েও বেশি দ্রব্য উত্তরোত্তর উৎপন্ন হতে লাগল অন্য দ্রব্য দিয়ে সেগুন্টি বিনিময়ের জন্য। উৎপাদনের উপায়ের মালিকরা নির্দিষ্ট ধরনের পণ্য উৎপাদনে বিশেষজ্ঞতা লাভ করল, তার ফলে বাজার হয়ে দাঁড়াল মানুষের কর্ম-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ।

বিনিময়ের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শ্রম হয়ে দাঁড়াল দ্বৈতচারিত্যবহ। ঘটনা এই যে বিনিময়ের উদ্ভবের ফলে কোনো পণ্যদ্রব্য কতটা দিলে তার বদলে অন্য পণ্যদ্রব্য কতটা পাওয়া যাবে তা স্থির করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিল। শ্রমের অন্তর্বস্তু নির্বিশেষে কোনো পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমকে লোকে তুলনা করতে শিখল। পণ্যদ্রব্যে বাস্তবায়িত শ্রম (এই শর্তে যে যা উৎপন্ন হচ্ছে তা অন্যদের অবশ্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য অথবা সেবাব্যবস্থা) অর্থাৎ মানুষের উদ্যোগ ব্যয়ের নাম **বিলম্বিত শ্রম**। পণ্যদ্রব্যের মূল্যমানের ভিত্তিতে তা রয়েছে, অর্থাৎ এর দ্বারাই নির্ধারিত হয় বাজারে তার বিনিময়ে কী পরিমাণ অর্থ অথবা অন্যান্য পণ্যদ্রব্য পাওয়া যায়।

সেই সঙ্গে যে কোনো শ্রমই আবার **মূল্যবান**ও বটে, যেহেতু তা গড়ে তোলে পণ্যদ্রব্যের এক বিশেষ গুণ — তার ব্যবহার-মূল্য, যা মানুষের পক্ষে অপরিহার্য, হিতকর।

শ্রম দ্বৈতচারিত্যবহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ব্যক্তিগত ও সামাজিক এই দুই ভাগে বিভক্ত হতে শুরু করল। যে কোনো বস্তু উৎপাদনের কাজে, শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, বিভিন্ন জীবিকার বহু লোক অংশগ্রহণ করে। যে কোনো জিনিসই যে তৈরি হয় তার কারণ কারও তা দরকার। তার অর্থ হল যে কোনো পণ্য-উৎপাদনকারীর শ্রম সামাজিক শ্রমের একাংশ, সামাজিক চরিত্রবহ। কিন্তু যে সমাজে ব্যক্তিগত মালিকানা আছে, সেখানে পণ্য-উৎপাদনকারীরা একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন

থেকে পৃথক পৃথক ভাবে উৎপাদন পরিচালনা করে। এই কারণে আসলে সামাজিক হলেও তাদের শ্রম বাহিরঙ্গ ব্যক্তিগত রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়। শ্রমের সামাজিক চরিত্র বলতে যা বোঝায় তার প্রকাশ ঘটে বিনিময়ের মধ্যে।

এরই ভিত্তিতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক শ্রমের মধ্যে দেখা যায় বিরোধ, উদ্ভূত হয় মানুষের নিজের ওপর মানবিক শ্রমের উৎপন্নদ্রব্যের প্রভুত্ব। মানুষের বাহিরঙ্গ সম্পর্ক বস্তুগত সম্পর্ক হয়ে প্রকাশ পায়। বাজারে যখন পণ্যদ্রব্য বেচাকেনার প্রশ্ন তীব্র হয়ে ওঠে তখন এই বিরোধ লক্ষ করা যায়। মানুষের উপর উৎপন্নদ্রব্যের প্রভুত্ব আরও প্রকট হয়ে ওঠে এই কারণে যে ব্যক্তিগতভাবে কে কতটা শ্রম ব্যয় করেছে, উৎপন্নদ্রব্যের মূল্যমান তার দ্বারা নির্ধারিত না হয়ে নির্ধারিত হয় সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় শ্রমের ব্যয়ের দ্বারা। উৎপাদনের গড়পড়তা সামাজিক পরিস্থিতিতে অর্থাৎ যন্ত্রপাতি, উৎপাদনকারীদের দক্ষতা, তাদের শ্রমের প্রখরতার গড়পড়তা স্তরে কোনো পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে যতটা শ্রম-সময় দরকার হয় তাকেই সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় শ্রমের ব্যয় বলে। স্বভাবতই যে পরিস্থিতিতে কোনো এক বিশেষ ধরনের উৎপন্নদ্রব্যের মূল পরিমাণ সৃষ্টি হয় তারই দ্বারা নির্ধারিত হয় সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় শ্রমের ব্যয়।

ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব ও পণ্যবিনিময় বিকাশের ফলে আদিম কোমের সদস্যদের মধ্যে ধনী ও দরিদ্রের

আবির্ভাব ঘটল। যে ব্যক্তি সর্বস্বান্ত হয়ে গেল সে ঋণের দায়ে ধনী ব্যক্তির কাছে নিজেকে বাঁধা দিল, তার হয়ে কাজ করতে লাগল। দখলদারী যুদ্ধ, বন্দীদের দাসে পরিণত করা, ঋণের দায়ে নিজেদের কোঁমের লোকজনকে দাস হিশেবে বিক্রি করে দেওয়া — এ সবের ফলে দাসেরা ধনী দাস-মালিকদের সম্পূর্ণ অধীন হয়ে পড়ল। আদিম গোষ্ঠী সমাজব্যবস্থা ধসে পড়ল, তার জায়গায় দেখা দিল দাস-মালিক সামাজিক-অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থা।

দাস-মালিক ব্যবস্থা ছিল মানবেতিহাসে ব্যক্তিগত মালিকানা ও শ্রমের পরকীকরণের ভিত্তিতে গঠিত প্রথম সমাজব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হল একাধারে উৎপাদনের উপায় ও কর্মী, অর্থাৎ দাসেরা — দুইই দাস-মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তিরূপে গণ্য।

শ্রমের পরকীকরণের উদ্ভব তখনই হল যখন একদল লোক আরেক দলের শ্রমের ফল আত্মসাৎ করতে লাগল। যে-সমস্ত লোকের কাছ থেকে উৎপাদনের উপায় ও শ্রমের ফল কেড়ে নেওয়া হল শ্রম তাদের কাছে হয়ে গেল পরকৃত কার্যকলাপ, আর এই কারণে শ্রমের প্রতি তাদের ঔদাসীণ্য, এমন কি বিমুখতা দেখা দিল। এইভাবে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত মালিকানাধীন সম্পত্তি হয়ে পড়ায় তাদের নিজেদের না রইল উৎপাদনের উপায়, না জীবনধারণের কোনো উপায়। যেমন দাসেরা তেমনি তাদের শ্রমের ফলও মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হল; সরাসরি জুলুম খাটিয়ে, অর্থাৎ অর্থনীতি বহির্ভূত চাপ সৃষ্টি করে তাদের

ওপর শোষণ চলল। উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারী দাসদের বাধ্যতামূলক সংযোগের মধ্যে নিহিত ছিল এই সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ বিরোধ। দাসদের আরও বেশি করে এবং ভালো করে কাজ করিয়ে নেওয়ার চেষ্টার ফলে তাদের দিক থেকে বাধা দেখা দিতে লাগল। বাধার কারণ এই যে দাসেরা তাদের শ্রমের ফলে এবং শ্রমের হাতিয়ারের প্রতি যন্ত্রের ব্যাপারে আদৌ আগ্রহী নয় — এগুনিকে তারা তাদের উপর শোষণ বৃদ্ধির উপায় মাত্র বলে গণ্য করত। সামগ্রিকভাবে দাসের শ্রমের বাহিরস প্রকাশ ঘটত দাস-মালিকের জন্য শ্রম রূপে, দাম-না-দেওয়া শ্রম রূপে।

দাস-মালিক সমাজব্যবস্থায় শ্রমের অন্তর্বস্তু ও চরিত্রের পরিবর্তন ঘটল। শ্রমের জন্য পাথরের আর কাঠের হাতিয়ারের জায়গায় এলো তামা আর ব্রোঞ্জের হাতিয়ার এবং আরও পরবর্তীকালে — লোহার শ্রমের হাতিয়ার। তা সত্ত্বেও দাসেরা যেহেতু তাদের বাধ্যতামূলক শ্রমকে ঘৃণা করার দরুন দামী ও জটিল যন্ত্রপাতি হারিয়ে অথবা নষ্ট করে ফেলত সেই হেতু দাস-মালিকরা তাদের অপেক্ষাকৃত আদিম ধরনের হাতিয়ার দিত। দাসদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ একটা অংশ উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায় (চাষাবাস, পশুপালন, নির্মাণকর্ম, পরিবহন, খনির কাজ ইত্যাদি) প্রয়োজনীয় শক্তির উৎসস্বরূপ তাদের পেশীশক্তি প্রয়োগ করত। তারা প্রচণ্ড কার্যিক শক্তি খাটিয়ে কাজ করত। শূদ্ধ শাসক শ্রেণীর প্রতিনিধিরাই রাষ্ট্রপরিচালনা, বিজ্ঞান ও

শিল্পকলার চর্চায় লিপ্ত হতে পারত। এইভাবে মানসিক ও কার্যিক শ্রমের মধ্যে বৈপরীত্যের আবির্ভাব ঘটল।

দাসসম্প্রদায়ের উপর কঠিন শোষণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রাচীন জগতে এমন কালপর্বও এসেছিল যখন অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি লক্ষ করা গেছে। ভারী ভারী কাজে বিপুল সংখ্যক দাসদের লাগানোর ফলে খাল ও বাঁধ তৈরি হল, জলসেচ ও আকরিক উত্তোলনের কাজ সম্ভব হল, বড় বড় শিল্পশালা সৃষ্টি হল, গড়ে উঠল সেতু, রাস্তাঘাট, প্রাসাদ, মন্দির আর পিরামিড।

দাস-মালিকানাভিত্তিক সমাজ প্রকৃতি ও মানববিদ্যা চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ কতকগুলি সাফল্য অর্জন করেছিল। সেই যুগে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমরা চীনে মো-জি, গ্রীসে আরিস্তটল ও পিথাগোরস, ভারতবর্ষে কালিদাস, রোম সাম্রাজ্যে সিসেরো প্রমুখ বিখ্যাত জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিদের নাম পাই।

এই সব সত্ত্বেও দাস-মালিক ব্যবস্থায় শ্রম কাজে লাগানোর সুযোগ ছিল সীমাবদ্ধ; তার কারণ এই যে দাসেরা তত্ত্বাবধায়কদের চাবুকের ভয়ে কাজ করত। দাস-মালিকদের প্রতি প্রবল ঘৃণা ও বাধ্যতামূলক শ্রমের প্রতি বিতৃষ্ণাবশত দাসেরা তাদের শোষকদের বিরুদ্ধে প্রায়ই মাথা তুলে দাঁড়াত। দাসের শ্রম অর্থনীতির প্রয়োজনীয় বিকাশ সুনিশ্চিত করতে পারল না। দাস-মালিকরা নিজেরাই কার্যিক শ্রমকে স্বাধীন মানুষের অযোগ্য, কলঙ্কজনক ব্যাপার বলে গণ্য করতে লাগল। শ্রমের প্রতি এই দৃষ্টিভঙ্গির ফল হল

এই যে সমাজের দীনদরিদ্র স্তরের লোকেরা পর্যন্ত আর কাজ করতে চাইত না — সমাজের ক্ষমতাসম্পন্ন লোকদের কাছ থেকে তারা নৈবেদ্য (‘খাদ্য আর আমোদ-প্রমোদ’) প্রত্যাশা করত।

আলস্য আর শ্রম পরস্পরবিরোধী। দাস-মালিক সমাজ বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে মদ্য উৎপাদন সম্পর্ক উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করতে লাগল। উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে এই আপসহীন বিরোধের ফলে দাস-মালিকানার বিনাশ ঘটল। পরিণামে আবির্ভাব ঘটল সামন্ততন্ত্রের পূর্বসূরী ভাগচাষ প্রথার। আগেকার দিনে যারা ছিল দাস কিংবা যে-সমস্ত কৃষক সর্বস্বান্ত হওয়ার পর জমি ও শ্রমের হাতিয়ার ইজারা পেয়েছে তারাই হল ভাগচাষী। যেহেতু তারা ফসলের একটা ভাগ পেত সেই কারণে ভালো ফসল ফলানোয় তাদের আগ্রহ দেখা যেত। বিশেষ আইনের বলে ভাগচাষীরা জমির সঙ্গে বাঁধা থাকত, তাদের গতিবিধির স্বাধীনতা ছিল না, সেনাবাহিনীতে চাকরীর অধিকার এবং আরও বহু অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত থাকত। ভাগচাষ প্রথার মধ্যেই পরবর্তী পর্যায়ের অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যায়।

দাস-মালিক সমাজব্যবস্থার স্থান নিল সামন্ততন্ত্র। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় পূর্বতন ব্যবস্থার তুলনায় উৎপাদিকা শক্তি অনেকখানি উঁচু পর্যায়ে পৌঁছানোর ফলে শ্রমের অন্তর্বস্তুর পরিবর্তন ঘটল। অর্থনীতির

নতুন নতুন শাখার আবির্ভাব ঘটল। শহরাঞ্চলে কাঁচামাল প্রসেসিং-এর পদ্ধতির ধীরে ধীরে উৎকর্ষ ঘটতে লাগল, হস্তশিল্প আরও বিশেষীকৃত হয়ে উঠল। ১৬০০ সালে ইউরোপে বেল্ট প্রথার তাঁতের উদ্ভাবন ঘটল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রথম ব্লাস্ট ফার্নেস, দিকদর্শনযন্ত্র, বইমুদ্রণ প্রথা ও যান্ত্রিক ঘড়ির প্রচলন হল।

কৃষি অর্থনীতির ক্ষেত্রে চাষবাসের অপেক্ষাকৃত উন্নত ব্যবস্থার (দোফলা ও তেফলা ব্যবস্থা, অতঃপর ফসল বদল করে জমি চাষের ব্যবস্থা) প্রচলন ও প্রসার ঘটল। আমেরিকা থেকে ইউরোপে আলু, টম্যাটো, সুবর্ণমুখী ফুল, তামাকের মতন নতুন নতুন ফসল এনে চাষ করা হতে লাগল। শ্রমের হাতিয়ারের উৎকর্ষ সাধিত হল। লোহার লাঙল এবং লোহার তৈরি আরও কৃষি-যন্ত্রপাতিরও ব্যাপক প্রসার ঘটল। সেই যুগে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের ক্ষেত্রে শ্রমের মধ্য দিয়ে মানুষের অর্জিত নতুন নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

কিন্তু সামগ্রিকভাবে সামন্ততান্ত্রিক যুগে প্রযুক্তি বলতে যা বোঝাত তার ভিত্তি ছিল কার্যিক শ্রম, তার বিকাশের মাত্রাও ছিল অপেক্ষাকৃত কম। দায়বদ্ধ কৃষকসম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ শ্রমের প্রক্রিয়ায় আদিম হাতিয়ার ব্যবহার করত।

তা সত্ত্বেও শ্রমের চরিত্রে কিন্তু পরিবর্তন ঘটতে লাগল। শ্রম-বিভাজন ও শ্রম-সহযোগিতা আরও বিকাশ লাভ করল। কৃষির অর্থনীতির ক্ষেত্রে ঘি-মাখন তৈরি,

মৌমাছিপালন, উদ্ভিদপালন ইত্যাদি বিশেষীকৃত শাখার উদ্ভব ঘটতে লাগল।

সামন্ততন্ত্রে পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের বিকাশ অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। তার মূলকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় শহর। এই পর্বে কোনো কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ নানা প্রদেশের মধ্যে ধীরে ধীরে বাণিজ্যসম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে, জাতীয় বাজার উদ্ভবের প্রক্রিয়া শুরুর হয়। সামাজিক শ্রম-বিভাজনের ভিত্তিতে, বাজারের কথা মনে রেখে এবং বিভিন্ন গৃহস্থের মধ্যে শ্রমের ফল বিনিময়ের উদ্দেশ্যে উৎপাদন অর্থাৎ পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের বিকাশ উৎপাদিকা শক্তির উৎকর্ষসাধনে শ্রমের ভূমিকা উন্নয়নের সহায়ক হয়।

সামন্ততন্ত্রে সমাজের মূখ্য উৎপাদিকা শক্তিরূপে মানুষের বিকাশের ক্ষেত্রে শ্রমের ভূমিকা উন্নয়নে শ্রমের সামাজিক রূপ আগের চেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় হয়ে উঠল। দাসদের তুলনায় কৃষককুল ও হস্তশিল্পীরা শ্রমে অনেকটা বেশি আগ্রহী হল। তারা উৎপাদনের উপায়ের কোনো কোনো অংশের মালিক ছিল, ফলে সামন্তপ্রভুর স্বার্থে বাধ্যতামূলক কতকগুলি কাজ করার পর (বেগার খাটো, খাজনাপরিশোধ, প্রভুর দুর্গে খিদমদ্‌গারি করা ইত্যাদি) যে-সমস্ত ফাঁকা দিন তারা পেত তখন স্বাধীনভাবে গৃহস্থালী পরিচালনাও করতে পারত — ইচ্ছেমতো চাষবাস করতে পারত, পশুপালন করতে পারত, হস্তশিল্প চর্চা করতে পারত।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সময়ে ভূমিদাস কৃষকদের শ্রম আবশ্যকীয় শ্রম ও উদ্ভূত শ্রম — স্পষ্ট

এই দুই ভাগে বিভক্ত হল। উদ্ভূত শ্রম বলতে বোঝায় দাম-না-দেওয়া শ্রম যা সামন্তপ্রভু মাটি, জল, বনজঙ্গল ইত্যাদির ব্যক্তিগত মালিক হওয়ার ফলে কোনো রকম ক্ষতিপূরণ ছাড়া নিজের ভোগে লাগায়। কৃষক স্বাধীন ব্যক্তি না হওয়ায় যতটা না সামন্তপ্রভুর উপর অর্থনৈতিক নির্ভরতার দরদুন কাজ করতে বাধ্য হত তার চেয়ে বেশি কাজ করতে বাধ্য হত অর্থনীতি-বাহির্ভূত সরাসরি চাপে পড়ে। শ্রমের উপর অর্থনীতি-বাহির্ভূত চাপের অর্থ হল এই যে কৃষকরা ছিল সামন্তপ্রভুদের এজিয়ারভুক্ত, তাদের অধীন। সামন্তপ্রভুরা ইচ্ছে করলে যে কোনো সময় তাদের কৃষক প্রজাদের জমিসুদ্ধ অথবা জমি ছাড়াই বিক্রি করতে অথবা উপহার দিতে পারত।

সামন্তপ্রভুদের জমিমালিকানা এবং সেই সঙ্গে চাষের জমির জন্য ভূস্বামীদের উপর কৃষকদের নির্ভরতা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রম কাজে লাগানোর চরিত্র নির্ধারণ করে। শ্রমের শোষণ ঘটে বহু বিচিত্র উপায়ে এবং তার প্রকাশ ঘটে তথাকথিত সামন্ততান্ত্রিক খাজনার মধ্যে। এই খাজনা কৃষকের সমস্ত উদ্ভূত শ্রম গ্রাস করে ফেলত। নানা রকমের কর ও বাধ্যবাধকতার ফলে ন্যূনতম সঞ্চিত নিয়ে কৃষকদের জীবনধারণ করতে হত।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজের এই সহজাত বৈরভাবাপন্ন বিরোধের ফলে কায়িক ও মানসিক শ্রমের, নগর ও পল্লীগ্রামের বৈপরীত্য ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়ে চলল।

কৃষকরা তাদের নিপীড়িত অবস্থা মেনে নিতে রাজী হল না। সামন্ততন্ত্রের সমগ্র পর্বের মধ্যে

সামন্তপ্রভুদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে অসংখ্য কৃষক অভ্যুত্থান লক্ষ করা যায়।

জমির সামন্ততান্ত্রিক মালিকানা এবং ভূমিদাস কৃষকদের ব্যক্তিগত অধীনতাভিত্তিক শ্রমের সামাজিক রূপ যখন উৎপাদিকা শক্তি বিকাশের প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দিল, তখনই সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির সংকট বিশেষ প্রকট হয়ে ওঠে। বিনিময়ের উপযোগী পণ্যের উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। বাজার যত প্রসারিত হতে লাগল ততই দেখা যেতে লাগল মোটা-মর্দীটভাবে যারা কম-বেশি পণ্য উৎপাদনকারী তারা অনেক সময়ই সর্বস্বান্ত কৃষক ও হস্তশিল্পীদের ভাড়া খাটাচ্ছে। এর অর্থ হল এই যে সামন্ততন্ত্রের গর্ভে উদ্ভূত হয়েছে পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানা ও মজুরি শ্রম শোষণের ভিত্তিতে গঠিত উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক রূপ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পুঁজিতন্ত্রে শ্রম

১। পুঁজিতন্ত্রে শ্রমের প্রক্রিয়া

আগেকার সমস্ত সমাজব্যবস্থার তুলনায় পুঁজিতন্ত্র সমাজের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে শ্রমের ভূমিকা উন্নয়ন করে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হওয়ার ফলে শ্রমের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে। পুঁজিতন্ত্র ধরাবাঁধা প্রযুক্তির ধ্বংস সাধন করে মানদ্বয়ের শ্রমকে কেবল নতুন নতুন অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার দ্বারাই সজ্জিত করল না, পেশাদারী জ্ঞানেও তাকে সমৃদ্ধ করে তুলল।

উৎপাদনের পুঁজিতান্ত্রিক প্রণালীতে শ্রম-প্রক্রিয়ার নিম্নলিখিত দুটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। প্রথমত, উৎপাদনের উপায় যেহেতু পুঁজিপতির সম্পত্তি এবং পুঁজিপতি শ্রমশক্তি ক্রয় করলে একমাত্র তার পরই

উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে শ্রমশক্তির সম্মিলন ঘটে, সেই হেতু পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীতে শ্রম-প্রক্রিয়াকালে মজদুরি শ্রমিক অর্থনীতিগতভাবে পুঁজির সঙ্গে বাঁধা, আর তার শ্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ তার নিজের হাতে না থেকে থাকে পুঁজিপতির হাতে।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদনের উপায় যার অধিকারে থাকে সেই শ্রমের ফসলের অধিকারী বলে শ্রমের ফসল পুঁজিপতির সম্পত্তিরূপে গণ্য হয়। সরল পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেখানে উৎপাদনকারী নিজেই উৎপাদনের উপায়ের মালিক হত, সেখানে শ্রমের ফসলও থাকত তার অধিকারে। কিন্তু এখন কলকারখানা, জমি, বিপণনকেন্দ্র, রেলপথ, ব্যাঙ্ক, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, বিমান বন্দর ইত্যাদির অধিকারী হল পুঁজিপতিরা, যারা নিজেরা বৈষয়িক সম্পদ উৎপাদন ও সেবাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ করে না। পুঁজিতন্ত্রে সকল প্রকার সামাজিক সম্পদ সৃষ্টি করে মজদুরি শ্রমিক অর্থাৎ সেই সমস্ত মানুষের শ্রম, উৎপাদনের উপায়ের উপর যাদের কোনো অধিকার নেই আর সেই হেতু পুঁজিবাদী শোষণযন্ত্রে না পড়ে যাদের কোনো উপায় থাকে না। আইনত স্বাধীন ব্যক্তি হলেও মজদুরি শ্রমিক অর্থনীতিগতভাবে পুঁজির সঙ্গে বাঁধা।

ভাড়াটে মজদুরের শ্রম যাতে উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে পুঁজিপতিকে অবশ্যই আগে বাজারে যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, জ্বালানি ও শ্রমশক্তি কিনতে হয়।

যে কোনো পণ্যদ্রব্যের মতো শ্রমশক্তিরও ব্যবহার-

মূল্য ও সামগ্রিক মূল্য আছে। একজন শ্রমিক ও তার পরিবারের লোকজনের জীবনযাত্রা নির্বাহের উপায় উৎপাদনের জন্য ব্যয়িত সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় শ্রম-সময় দ্বারা শ্রমশক্তির মূল্য নির্ধারিত হয়। অন্য দিকে ব্যবহার-মূল্য বলতে বোঝায় শ্রম-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একজন শ্রমিকের নিজের শ্রমশক্তির মূল্যের চেয়েও বেশি মূল্য সৃষ্টি করার ক্ষমতা। মজুরি শ্রমিক তার নিজের শ্রমশক্তির মূল্যের উপরে যে বাড়তি মূল্য সৃষ্টি করে তার নাম উদ্ধৃত-মূল্য। এই উদ্ধৃত-মূল্যকেই পুঁজিপতিরা ক্ষতিপূরণ না দিয়ে আত্মসাৎ করে। এই কারণে উদ্ধৃত-মূল্যই হল পুঁজিবাদী উৎপাদনের উদ্দেশ্য।

পুঁজিপতির দৃষ্টিকোণ থেকে যে কোনো শ্রম উৎপাদনশীল নয় — যে শ্রম উদ্ধৃত-মূল্য উৎপাদন করে, তার পুঁজি বৃদ্ধি করে একমাত্র তাকেই উৎপাদনশীল বলা হয়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল — শ্রমের এই দুই বিভাগের ভিত্তি হল তার বৈতচারিত্য। এক দিক থেকে দেখতে গেলে শ্রম পণ্যদ্রব্যের ব্যবহার-মূল্য সৃষ্টি করে। এই কারণে সেই শ্রম হবে উৎপাদনশীল যার ব্যবহার-মূল্য ক্ষেতর চাহিদা মেটায়। অপর পক্ষে, পুঁজিতন্ত্রে শ্রম পণ্যদ্রব্যের মূল্য এবং তার বাড়তি আরও কিছু অর্থাৎ উদ্ধৃত-মূল্য সৃষ্টি করে। শ্রমিকের শ্রম যদি উৎপাদনের উপায়ের মালিককে উদ্ধৃত-মূল্য প্রদান করে এবং তাকে পুঁজিপতিতে পরিণত করে তাহলে সেই পুঁজিপতির

দৃষ্টিতে তা হল উৎপাদনশীল শ্রম। সুতরাং পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতিকে উদ্ধৃত-মূল্য প্রদান করছে কিনা তার উপর নির্ভর করে একই ধরনের শ্রম উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল দুইই হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, কাপড়ের মিলের শ্রমিকের শ্রম যেহেতু মিল-মালিকের জন্য উদ্ধৃত-মূল্য সৃষ্টি করে সেই হেতু তা উৎপাদন-শীল বলে গণ্য। একজন কুটীরশিল্পী যখন তার কর্মশালায় কাপড় তৈরি করে তখন সে কারও জন্য উদ্ধৃত-মূল্য সৃষ্টি করে না, তাই পুঁজিপতির দৃষ্টিতে তার শ্রম হল অনুৎপাদনশীল শ্রম।

শুদ্ধ বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্রে কেন, সৃজনী প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও শ্রমের এ ধরনের বিভাজন দেখা যায়। অনুষ্ঠানের উদ্যোগকর্তা অর্থাৎ পুঁজিপতি যখন কোনো গায়িকাকে ভাড়া নেয় তখন গায়িকা তাকে মুনাসফা প্রদান করে, তাই পুঁজিপতির কাছে তার শ্রম হল উৎপাদনশীল। কিন্তু সে যদি স্বাধীনভাবে, নিজেই সমস্ত রকম ঋণ নিয়ে কাজে নামে তাহলে তার শ্রম হয় অনুৎপাদনশীল।

সামন্তান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীর গভেই যার জন্ম সেই পুঁজি প্রথম প্রথম সমাজের উৎপাদিকা শক্তিতে উৎপাদনের বৈষয়িক বনিয়াদের কোনো বিপ্লবাত্মক ভাঙন না ধরিয়ে শ্রমের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। এই পর্বের বিশেষত্ব বলে যা আখ্যাত হয়েছে তা হল শ্রমের আনুষ্ঠানিক পুঁজিনির্ভরতা, অর্থাৎ শ্রম তখনও পরিপূর্ণভাবে পুঁজির কুক্ষিগত হয় নি। সেই পর্বে, তখনও পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ ঘটিছিল আদিম

হস্তশিল্প-কারিগরির ভিত্তিতে, তার ফলে পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে তেমন উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটতে পারত না। শ্রমের অন্তর্বস্তুতে তখনও গভীর বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে নি। উৎপাদনের এমন সমস্ত উপায়ের প্রয়োগভিত্তিতে শ্রম সম্পাদিত হত যেগুলি শ্রমের প্রযুক্তি পরিবর্তন করত না। উৎপাদনের বৈষয়িক ভিত্তি আগের মতোই থেকে যায় সেই কায়িক শ্রম।

কিন্তু উৎপাদনের রূপে ও শ্রমের প্রকৃতিতে গুরুগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। উৎপাদনের সামন্ততান্ত্রিক রূপের বদলে এল পুঁজিতান্ত্রিক রূপ, পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত মালিকানা সংস্থা, মজুরি শ্রম। উৎপাদনের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল উদ্ধৃত-মূল্য অর্জন করা। কিন্তু সেই পর্বে প্রভূত পরিমাণে উদ্ধৃত-মূল্য অর্জন করতে গেলে, অর্থাৎ শ্রমিকদের উপর শোষণের মাত্রা বৃদ্ধি করতে গেলে কর্ম-দিবস দীর্ঘায়ত করা ছাড়া পুঁজিপতির আর কোনো উপায় থাকত না। কর্ম-দিবসের স্থিতিকাল বৃদ্ধির দরুন যে উদ্ধৃত-মূল্য পাওয়া যায় তাকে বলে অনাপেক্ষিক উদ্ধৃত-মূল্য। পুঁজিপতির পক্ষে এই অনাপেক্ষিক উদ্ধৃত-মূল্য অর্জনই ছিল শ্রমের আনুষ্ঠানিক পুঁজিনির্ভরতার পর্বের বৈশিষ্ট্য।

শ্রমের আনুষ্ঠানিক পুঁজিনির্ভরতার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের চরিত্রের সঙ্গে শ্রমের অন্তর্বস্তুর বিরোধ দেখা দিল। শ্রমের প্রযুক্তিগত ভিত্তি শ্রমের সম্পূর্ণ পুঁজিনির্ভরতার অন্তরায় হওয়ায় সেই পর্বে কৃষকদের জমি বেষ্টন (দখল) এবং দীর্ঘকালের বাসস্থান থেকে তাদের উচ্ছেদ, কঠোর আইনপ্রণয়ন ও অন্যান্য

বিধিব্যবস্থা ইত্যাদি নানা ধরনের অর্থনীতি-বহির্ভূত বাধ্যবাধকতার বিস্তৃত প্রয়োগ ঘটে। ইংলণ্ডে সরকার বাধ্যতামূলক আইন প্রচলনের সাহায্যে (দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৩৪৯ সালের আইন) ১২ থেকে ৬০ বছর বয়ঃসীমার অন্তর্ভুক্ত যে-সমস্ত অধিবাসীর ব্যক্তিগত জমি এবং জীবনধারণের অন্য কোনো উপায় নেই, তাদের সকলকে পুঁজিপতিদের উদ্যোগগুলিতে কাজ করতে বাধ্য করা হত। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে নিয়োগকর্তার কাছ থেকে কাজ ছেড়ে চলে গেলে তার শাস্তি হত কারাদণ্ড। ১৩৫১ সালে ‘শ্রমিক সংক্রান্ত সংবিধি’ নামে যে আইন প্রবর্তিত হয় তাতে যে ব্যক্তি কাজ করতে অস্বীকৃত হত তাকে কাঠের বেড়ি বেঁধে কারারুদ্ধ করার নির্দেশ ছিল। যে-সমস্ত শ্রমিক তাদের নিয়োগকর্তাদের ছেড়ে চলে যেত তাদের সমাজবিরোধী বলে ঘোষণা করা হত এবং তপ্ত লোহার ছেঁকা দিয়ে ছাপ মেরে দেওয়া হত।

কর্ম-দিবস ছিল বড় বেশি দীর্ঘ। আর ব্যাপারটা যদি পুঁজিপতিদের হাতে থাকত তাহলে তারা শ্রমিকদের হয়তো দিনে-রাতে চব্বিশ ঘণ্টাই খাটিয়ে নিত। কিন্তু যেহেতু মানুষের আহারনিদ্রা ইত্যাদির প্রয়োজন আছে সেই হেতু তা সম্ভব নয়। এখানেই কর্ম-দিবসের শারীরিক সীমারেখা নির্দিষ্ট। শারীরিক সীমারেখা ছাড়াও আছে সামাজিক সীমারেখা যা একজন শ্রমিকের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চাহিদা পরিতৃপ্তির সঙ্গে জড়িত।

প্রমের আনুষ্ঠানিক পুঁজিনির্ভরতার সঙ্গে সঙ্গে

পুঞ্জিপতিরা কর্ম-দিবসকে তার শারীরিক সীমারেখা পর্যন্ত প্রসারিত করতে প্রবৃত্ত হন। ইংলন্ডে ১৪৪৬ সালে বিধিবদ্ধ এক আইনের বলে বসন্তকালে ও গ্রীষ্মকালে আহারের জন্য মোট তিন ঘণ্টার তিনটে বিরতিসমেত সকাল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা-আটটা পর্যন্ত কর্ম-দিবস নির্দিষ্ট করা হয়। অন্য কথায় বলতে গেলে, কর্ম-দিবসের প্রকৃত দৈর্ঘ্য হল ১১-১২ ঘণ্টা। উক্ত আইন অনুযায়ী শীতকালের জন্য কর্ম-দিবস নির্দিষ্ট হয় সকাল পাঁচটা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। এই সমস্ত আইন শ্রমিকের শ্রম ও জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তুলল।

পুঞ্জিতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতি এসে কুটারীশিল্পের হাতিয়ার ও কায়িক শ্রমকে কোণঠাসা করে দিতে লাগল। শ্রমের সামাজিক বিভাজনে এবং আলাদা আলাদা পুঞ্জিবাদী উদ্যোগে শ্রম-বিভাজনের গভীর পরিবর্তন দেখা দিল। শিল্পবিপ্লবের ফলে জীবন্ত শ্রমের উপর আগের বাস্তবায়িত শ্রমের প্রভুত্ব বৃদ্ধি পেল। মজুরি শ্রমিকদের দাম-না-দেওয়া শ্রম পুঞ্জিপতিরা আত্মসাৎ করতে থাকার দরুন আগেকার শ্রম দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে লাগল। যন্ত্রপাতি, দালানকোঠার সংখ্যা অভূতপূর্ব দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকায় সেগুলি উত্তরোত্তর বেশি পরিমাণে উদ্ভূত-মূল্য গ্রাস করতে লাগল। বাস্তবায়িত শ্রম মজুরি শ্রমিকদের কাছ থেকে উদ্ভূত-মূল্যের আরও নতুন নতুন অংশ শুষে নিতে থাকায় তা ক্রমেই আরও বেশি পরিমাণে সঞ্চিত উদ্ভূত-মূল্যে পরিণত হল। বাস্তবায়িত

শ্রম লোকের মাথার ওপর ডামোকলের খাঁড়ার মতো
ঝুলে থেকে সমানে খাটিয়ে নিয়ে চলল তাদের।
শিল্পবিপ্লবের যুগের বৈশিষ্ট্যস্বরূপ শ্রমের এই
পুঞ্জিনির্ভরতাকে প্রকৃত নির্ভরতা বলা হয়।

এই পর্বে, অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তির প্রবল
বিকাশের যুগে পুঞ্জিপতিদের সামনে উদ্ধৃত্ত-মূল্য
বৃদ্ধির সম্ভাবনা খুলে গেল — তবে এবারে কর্ম-দিবসের
চূড়ান্ত বৃদ্ধি না ঘটিয়ে কর্ম-দিবসের নির্দিষ্ট
স্থিতিকালের মধ্যে আবশ্যিক শ্রম-সময় কমিয়ে এনে।
আবশ্যিক শ্রম-সময় কমিয়ে এনে সেই অনুযায়ী উদ্ধৃত্ত
সময়ের বৃদ্ধি ঘটিয়ে পুঞ্জিপতি যে উদ্ধৃত্ত-মূল্য অর্জন
করে তাকে বলা হয় আপেক্ষিক উদ্ধৃত্ত-মূল্য।

শ্রমের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি হল আপেক্ষিক
উদ্ধৃত্ত-মূল্য উৎপাদনের ভিত্তি। যে-সমস্ত শিল্পশাখায়
শ্রমিকদের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ
উৎপন্ন হয় সেখানে শ্রমের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি
ঘটানোর ফলে জীবনধারণের উপকরণের মূল্য হ্রাস
পায়। জীবনধারণের উপকরণের মূল্য হ্রাস পাওয়ার
পরিণামস্বরূপ শ্রমশক্তির মূল্যও হ্রাস পায়। এইভাবে
আবশ্যিক শ্রম-সময়ের হ্রাস এবং তার দরুন উদ্ধৃত্ত
শ্রম-সময়ের বৃদ্ধি ঘটে।

সদুতরাং দেখা যাচ্ছে শ্রমিকদের উপর পুঞ্জিপতিদের
শোষণের মাত্রা শুধু কর্ম-দিবস (অন্যাপেক্ষিক উদ্ধৃত্ত-
মূল্য) বিস্তারের সাহায্যেই বৃদ্ধি পায় না, শ্রমের
উৎপাদনশীলতা (আপেক্ষিক উদ্ধৃত্ত-মূল্য) বৃদ্ধির
পরিণামেও তা ঘটে।

পুঁজিতন্ত্রে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে যায়। পুঁজিবাদী শিল্পব্যবস্থা বিকাশের প্রথম স্তরে, হস্তশিল্পীদের কর্মশালায় যেমন ছিল, শ্রমের প্রক্রিয়া তখনও তেমনি কার্যক প্রযুক্তির ভিত্তিতে সম্পন্ন হত, কলকারখানার অভ্যন্তরে তখনও শ্রম-বিভাজন ছিল না। কিন্তু অন্তত এক দিক থেকে দেখতে গেলে পুঁজিপতিদের কর্মশালাগর্ভস্থ শ্রম-প্রক্রিয়া হস্তশিল্পীদের কর্মশালার শ্রম-প্রক্রিয়ার চেয়ে ইতিমধ্যেই পৃথক হয়ে পড়েছিল: নিজের কারবারে কারুজীবীর একক শ্রমের পরিবর্তে পুঁজিপতিদের কর্মশালায় একজন পুঁজিপতির পরিচালনায় বহুসংখ্যক মজুরি শ্রমিক সমবেতভাবে শ্রম ব্যয় করে। পুঁজিবাদী উৎপাদন বিকাশের এই প্রথম স্তরই হল পুঁজিবাদী সরল শ্রম-সহযোগিতা।

শিল্পক্ষেত্রে পুঁজিবাদ বিকাশের দ্বিতীয় স্তর প্রথম স্তর থেকে ভিন্ন ছিল এখানেই যে এই স্তরে শুধু সরল সহযোগিতা কেন, শ্রমিকদের মধ্যে শ্রম-বিভাজনও পুঁজিপতিদের কলকারখানায় বহু মজুরি শ্রমিকের যৌথ শ্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে শুরু করল। পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের সমগ্র প্রক্রিয়াটি এক সারি উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় ভাগ ভাগ হয়ে গেল, সেখানে একেকটি পর্ব পরিচালনার জন্য একেক ধরনের শ্রমিক দায়ী থাকত। পুঁজিবাদী উৎপাদন বিকাশের এই দ্বিতীয় স্তরের নাম হল পুঁজিবাদের ম্যানুফ্যাকচারি পর্ব।

ম্যানুফ্যাকচারি বলতে এমন এক ধরনের উদ্যোগ বোঝায় যা শ্রম-বিভাজন ও হস্তশিল্পপ্রকৌশলের

ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। ম্যানুফ্যাকটরিগুলির উদ্ভব ঘটে দুটি ধারায়: একজন পুঁজিপতির কর্তৃত্বে এক কর্মশালায় একই বৃত্তির কারুজীবীদের সম্মিলন ঘটে, তাদের প্রত্যেকের ছিল একই কাজ, অথবা দেখা যেত বিভিন্ন ধরনের বৃত্তির কারুজীবীরা ওইভাবে একই কর্মশালায় সম্মিলিত হয়ে দ্রব্য উৎপাদনের কাজে পরম্পরায় অংশগ্রহণ করছে। স্বাধীন হস্তশিল্পী যেখানে পুরো পণ্যদ্রব্য শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত নিজে তৈরি করত, সেখানে ম্যানুফ্যাকটরি শ্রমিক উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মাত্র একটি অংশের জন্য দায়ী থাকত। এইভাবে সে পরিণত হল আংশিক বা খুঁটিনাটি বস্তুর শ্রমিকে। আংশিক শ্রমিক রূপে সে যে ম্যানুফ্যাকটরির বাইরে কাজ করতে পারত না তার কারণ শুধু এই নয় যে উৎপাদনের উপায়ের অধিকারী সে ছিল না, আরও কারণ হল স্বাধীনভাবে কোনো পণ্যদ্রব্যের সামগ্রিক উৎপাদনের জন্য যে দক্ষতার প্রয়োজন ইতিমধ্যে সে তা হারিয়ে ফেলেছে।

ম্যানুফ্যাকটরিতে কাজ করার পরিবেশ ছিল অত্যন্ত কঠিন। এখানে কাজ করার অর্থ হল নিরন্তর একই ধরনের সরল কোনো কাজের পুনরাবৃত্তি, যার ফলে শ্রমিক দেহে ও মনে অপটু হয়ে পড়ত। কর্ম-দিবস ১৮ ঘণ্টা ও তদুর্ধ্ব হত, উপরন্তু মজুরি ছিল নিতান্তই কম।

ম্যানুফ্যাকটরির আবির্ভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটল। কিন্তু তার বিনিয়াদ কায়িক প্রয়োগকৌশল হওয়ায় বিকাশের একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে

আসার পর দেখা গেল ক্রমবর্ধমান পুঁজিবাদী উৎপাদন ও বাজারের চাহিদার সঙ্গে ম্যানুফ্যাকচারের সংকীর্ণ কারিগরি ভিত্তি এবং তাতে নিষ্পত্ত শ্রমের বিরোধ ঘটেছে।

ম্যানুফ্যাকচার উৎপাদনের আবির্ভাব তৃতীয় আরেকটি স্তরে — বৃহৎ যন্ত্রচালিত শিল্পে উত্তরণের প্রয়োজনীয় শর্ত গড়ে তুলল। ম্যানুফ্যাকচারের স্থান নিল ফ্যাক্টরি। ফ্যাক্টরি হল যন্ত্রব্যবস্থা প্রয়োগের ভিত্তিতে গঠিত শিল্পপ্রতিষ্ঠান। ম্যানুফ্যাকচারের মতো ফ্যাক্টরিরও বৈশিষ্ট্য হল মজুরি শ্রমিকদের যৌথ শ্রম কাজে লাগানো। কিন্তু ফ্যাক্টরিতে ও ম্যানুফ্যাকচারিতে শ্রম-বিভাজন হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ধারায়। ম্যানুফ্যাকচারিতে শ্রম-বিভাজনের ভিত্তি হল আংশিক কাজের শ্রমিক এবং তার শ্রমের হাতিয়ার। অপর পক্ষে ফ্যাক্টরিতে, মার্কসের কথায়, উৎপাদনের মেরুদণ্ড হল যন্ত্রপাতির সহযোগিতা।

পুঁজিতান্ত্রিক ফ্যাক্টরি শ্রমকে পুঁজির দাসত্ববন্ধনে বাঁধার এক নতুন পর্যায়ের সূচনা করল। ফ্যাক্টরিতে শ্রমিক যন্ত্রের লেজুড়ে পরিণত হয়। পুঁজিতান্ত্রিক উপায়ে যন্ত্র কাজে লাগানোর ফলে কর্ম-দিবস দীর্ঘায়িত হয়, উৎপাদনক্ষেত্রে নারী ও শিশুদের টেনে আনা হয়, বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে, প্রলেতারিয়েত আরও নিঃস্ব হয়ে পড়তে থাকে। কিন্তু পুঁজিতন্ত্রে যন্ত্র প্রয়োগের ব্যাপারে কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। সীমাবদ্ধতা এখানেই যে পুঁজিপতিরা একমাত্র তখনই যন্ত্রের প্রচলন ঘটায় যখন দেখে যে-সমস্ত শ্রমিককে

তারা কর্মচ্যুত করেছে, তাদের যে মজদুরি দিতে হত যন্ত্রের বাজার দর তার চেয়ে কম পড়ছে। পুঁজিপতি একমাত্র তখনই যন্ত্রের আশ্রয় নেয় যখন দেখে যন্ত্র তার পক্ষে লাভজনক। এই কারণে যন্ত্রচালিত উৎপাদন কখনই হস্তচালিত শ্রম বা কার্যিক শ্রমের সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটাতে পারে না।

পুঁজিবাদী ফ্যাক্টরি কার্যিক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে বৈপরীত্য প্রকট করে তোলে। শ্রমিকদের অদৃষ্টে জোটে হাড়ভাঙা কার্যিক শ্রম — সৃজনী অন্তর্ভুক্ত তার মধ্যে থাকে না। মানসিক শ্রমের কর্মপ্রণালী কার্যিক শ্রম থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে অতি অল্প সংখ্যক কিছু ভাড়াটে কর্মচারীর দ্বারা (ইঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তিবিদ ইত্যাদি) সাধিত হয়। ওই সব কর্মচারী প্রযুক্তিগত পরিচালনা এবং তদারকির কাজ নির্বাহ করা ছাড়াও পুঁজিপতির তরফ থেকে এবং তারই স্বার্থে মজদুরি শ্রমিকদের উপর শোষণপ্রক্রিয়ার কাজে অংশগ্রহণ করে। উৎপাদনের প্রত্যক্ষ পরিচালনার ভার থেকে মুক্ত হয়ে পুঁজিপতি ফ্যাক্টরি-মালিক শ্রমের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নেওয়ার দিকে মনোনিবেশ করে।

শিল্পক্ষেত্রে পুঁজিবাদ বিকাশের তিনটি স্তর একই সঙ্গে আপেক্ষিক উদ্ভূত-মূল্যের উৎপাদন বিকাশের তিনটি স্তর রূপে গণ্য। এই কারণে বাস্তবায়িত ও জীবন্ত শ্রমের মধ্যে সমতার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। বাস্তবায়িত শ্রম জীবন্ত শ্রমকে দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ

করার হাতিয়ার স্বরূপ হয়ে প্রকাশ পায়। জীবন্ত শ্রমের উপর তার কর্তৃত্ব অবাধ।

শ্রমের প্রকৃত পুঞ্জিনির্ভরতা এক দিকে যেমন শ্রমের অন্তর্বস্তু ও চরিত্রের পরিবর্তন ঘটায়, অন্য দিকে তেমনি খোদ শ্রম-প্রক্রিয়ারও পরিবর্তন ঘটায়। সেই সঙ্গে শ্রমের প্রকৃত পুঞ্জিনির্ভরতার স্তরে আনুষ্ঠানিক নির্ভরতার সাধারণ বৈশিষ্ট্যও নষ্ট হয় না। তার কারণ এই যে দৃঢ় ধরনের নির্ভরতারই বিকাশের ভিত্তি সেই এক — পুঞ্জিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত মালিকানা এবং মজদুরি শ্রমের শোষণ।

২। জীবিকানির্বাহের উপায়রূপে শ্রম

পুঞ্জিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রম একমাত্র তখনই জীবিকানির্বাহের উপায় হয়ে উঠতে পারে যখন শ্রমিকের পক্ষে তার শ্রমশক্তি পুঞ্জিপতির কাছে বিক্রয় করা সম্ভব হয়। সে যদি মজদুরি, অথবা পেনশন পায় কিংবা অন্য কোনো ধরনের সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় পড়তে পারে তাহলে প্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তু কেনা তার পক্ষে সম্ভব হয়। তা না হলেই সে বেকার।

শ্রমের পুঞ্জিনির্ভরতার পরিস্থিতিতে মজদুরির একটি বিশেষ স্থান আছে। মজদুরির বহিঃপ্রকাশ ঘটে শ্রমের দাম হিশেবে, এই কারণে তা শ্রমের শোষণকে গোপন করে রাখে।

পুঞ্জিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকের পক্ষে শ্রম অর্থ উপার্জনের উপায় ছাড়া আর কিছুই নয়। শ্রমিক যে

শ্রম ব্যয় করে তার সমস্তটাই শ্রমিকের জীবনধারণের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী লাভ করার উপায় মাত্র। এই কারণে শ্রমিকের ধারণায় মজদুরি হল তার শ্রমের দরদুন প্রাপ্য পারিশ্রমিক। শ্রমিক যখন তার শ্রমশক্তি ব্যয় করেছে, শ্রমশক্তিকে সক্রিয় করে তুলেছে অর্থাৎ খাটাখাটুনি শেষ করেছে, একমাত্র তার পরই সে মজদুরি পেয়ে থাকে। এই পরিস্থিতির জন্যই শ্রমিকের মনে এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মায় যে তার মজদুরি হল তার সমগ্র শ্রমের পারিশ্রমিক।

আসলে কিন্তু মজদুরি যেহেতু শ্রম-সময়কে আবশ্যিক ও উদ্ধৃত শ্রম-সময়ে, দাম-দেওয়া ও দাম-না-দেওয়া সময়ে বিভাজনের সমস্ত চিহ্ন মদুছে দেয় সেই হেতু তা শ্রমিকদের উপর পুঁজিপতিদের শোষণের সম্পর্ককে গোপন করে রাখে। পুঁজিতন্ত্রে কর্ম-দিবসকে আবশ্যিক ও উদ্ধৃত সময়ে ভাগ করার ব্যাপারটা শ্রমশক্তি কেনাবেচার সম্পর্কের আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকে। উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় শ্রমিক তার শ্রমশক্তির যা মূল্য তার চেয়ে বেশি মূল্য সৃষ্টি করে। সুতরাং মজদুরি হল নবসৃষ্ট মূল্যের একটা অংশ, বাকি অংশটা — উদ্ধৃত-মূল্য — পুঁজিপতি শোধ না করে নিজেই আত্মসাৎ করে।

মজদুরির আয়তন শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার মানের মূল সূচক। নামিক মজদুরি এবং প্রকৃত মজদুরির পার্থক্যটা জানা দরকার। পুঁজিপতিকে শ্রমশক্তি বিক্রি করে শ্রমিক যে মোট অর্থ পায় তাকে বলে নামিক মজদুরি। নামিক মজদুরির পরিমাণ এবং শ্রমিকের

জীবনধারণের সামগ্রীর দামের সেই স্তর যেক্ষেত্রে একজন শ্রমিক তার আর্থিক মজদুরি দিয়ে বস্তুত যে পরিমাণ ভোগ্যবস্তু ও সেবাব্যবস্থা কিনতে পারে তাই হল প্রকৃত মজদুরি।

পুঁজিতন্ত্রে প্রকৃত মজদুরি সরাসরিভাবে অসংখ্য পরিমাণ এমন কতকগুলি করণশক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত যেগুলি প্রায়ই বৃদ্ধি ও হ্রাসের মতো পরস্পরাবিরোধী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে (শ্রমশক্তির মূল্যমানের পরিবর্তন, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, অল্প মজদুরি দিয়ে নারী ও শিশু শ্রম কাজে লাগানোর প্রবণতা বৃদ্ধি ইত্যাদি), পরিণামে সর্বদাই কোনো না কোনো সময় হ্রাসের প্রবণতা দেখা যায়।

বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকের মজদুরির স্তর এক রকম নয়। এর কারণ বহুবিধ। বলাই বাহুল্য, কোনো কোনো দেশের পুঁজিপতিরা যে অন্য দেশের পুঁজিপতিদের চেয়ে বেশি উদার এ থেকে এমন ধারণা করা ঠিক হবে না। সর্বদাই পুঁজিপতিরা যত দূর সম্ভব কম মজদুরি দেওয়ার চেষ্টা করে। তবে বিভিন্ন দেশের মজদুরির তুলনা করার সময় কোনো দেশের শ্রমিক শ্রেণী গড়ে ওঠার ঐতিহাসিক পরিস্থিতি, তার বৈষয়িক ও মানসিক চাহিদার স্তর, দক্ষতা অর্জনের দরুন খরচপাতি, কোনো দেশের জলবায়ু, শ্রমের উৎপাদনশীলতা, শ্রেণী সংগ্রাম এবং সেই দেশের বৈশিষ্ট্যসূচক আরও অনেক অনেক বিষয় বিবেচনা করা অবশ্যই দরকার।

মজদুরি বিশেষ করে কম হল উন্নয়নশীল

দেশগুলিতে। উপনিবেশবাদের অন্যতম গুরুতর পরিণামস্বরূপ এটা ঘটে। জাতিসংঘের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বর্তমান কালে আফ্রিকার দেশগুলিতে শ্রমিকের যা মজুরি তা পশ্চিম ইউরোপীয় দেশসমূহের শ্রমিকদের গড় মজুরির এক-দশমাংশের বেশি নয়। উন্নয়নশীল দেশগুলির বড় বড় কলকারখানাতে পর্যাপ্ত শ্রমজীবীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকেই প্রায় ভিখারীর জীবনযাপন করতে হয়। বৃহদায়তন ফ্যাক্টরি শিল্প ছাড়াও ওই সব দেশে তাদের ঐতিহ্যগত শিল্পশালা — কুটীরশিল্প ও হস্তচালিত কায়িক শিল্পশালা বজায় আছে। সে সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ফ্যাক্টরি ও কলকারখানার তুলনায় মজুরির হার অনেক কম।

ঐতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে, ঐতিহ্যগত শিল্পক্ষেত্রে মজুরি ব্যবস্থার স্তরের উদ্ভব ঘটে সেই উপনিবেশিক যুগে, যখন উপনিবেশবাদীরা পূর্ণমূল্যের শ্রমশক্তি পুনরুৎপাদনের দিকে মনোযোগ না দিয়ে সম্ভার পেশীশক্তির এক সমসত্ত্ব উৎস হিসেবে মেহনতীদের রিহুট করে তাদের চরম শোষণ করত।

মেশিনে পরিশ্রম করার ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত বেশি মজুরির কারণ হল ফ্যাক্টরি ও কলকারখানা ভিত্তিক শিল্পের বিকাশের ফলে আরও বেশি পরিমাণে যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রমশক্তির চাহিদা। এই ধরনের শ্রমশক্তির মূল্য বেশি হওয়ায় তার পারিশ্রমিকও বাড়াতে হয়। এমন কি অল্প দক্ষতাসম্পন্ন যে-সমস্ত শ্রমিক ফ্যাক্টরি ও

কলকারখানায় কাজ করে তারাও অনেক সময় উন্নয়নশীল দেশগুলির ঐতিহ্যসম্পন্ন শিল্পশালায় কর্মরত কারিগরদের গড় আয়ের ৩-৫ গুণের বেশি মজুরি পায়। সামগ্রিকভাবে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির তুলনায় অর্থনীতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে পারিশ্রমিকের পার্থক্য অনেক বেশি।

কলকারখানা ও ফ্যাক্টরির অভ্যন্তরেই আবার পারিশ্রমিকের হারের মধ্যে বড় রকমের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের আয়তন এবং শ্রমিকদের যোগ্যতার স্তরের উপর তা নির্ভর করে। অপেক্ষাকৃত বড় বড় কলকারখানায় ও ফ্যাক্টরিতে যন্ত্রীকরণের স্তর অনেকটা উঁচু এবং উৎপাদনক্রিয়াও জটিলতর হওয়ায় কাজের মান রীতিমত উন্নত হওয়া দরকার, তাই সেখানে পারিশ্রমিকও বেশি।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দক্ষ শ্রমিকের মজুরি অদক্ষ শ্রমিকের তুলনায় ২-৩ গুণ বেশি। এই প্রভেদ আরও প্রকট হয়ে ওঠে এই কারণে যে বড় বড় কলকারখানায় ও ফ্যাক্টরিতে সামাজিক বীমা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা আছে, ন্যূনতম রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠানের মদুনাফার অংশ লাভের অধিকার আছে, সেখানে বিনামূল্যে অথবা অবহারে সেবাব্যবস্থার (চিকিৎসা, কোম্পানির গাড়িতে কাজের জায়গায় ও বাড়িতে যাতায়াত, সস্তার খাবার, শিশু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) সুযোগ দেওয়া হয়। শ্রমিকদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি বাড়ি অথবা ফ্ল্যাট তাদের সস্তা ভাড়া দেওয়া হয়। কিন্তু সরাসরি আয়ের অতিরিক্ত

এই যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা যা শ্রমজীবী মানদ্বয়ের জীবনযাত্রার প্রকৃত স্তর গড়ে তোলে মূল প্রলেতারীয় জনগণের তা হাতের বাইরেই থেকে যায়।

মোটের উপর, উৎপাদন পরিস্থিতির দ্বারা মজদুরির যে পার্থক্য নির্ধারিত হয় তা বিশ্লেষণ করলে এই প্রবণতাই প্রকট হয়ে ওঠে যে আধুনিক অর্থনীতির ক্ষেত্র থেকে ঐতিহ্যিক অর্থনীতির দূরত্ব বেশি, শিল্প থেকে কৃষি অর্থনীতির, বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান থেকে ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান, বড় শহর থেকে মফস্বল অঞ্চলের দূরত্ব যত বেশি শ্রমিকদের মজদুরিও তত কম।

রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রগুলির মধ্যে মজদুরির যে স্তরভেদ আছে, শ্রমের মজদুরির প্রভেদ অনেক পরিমাণে তারই প্রভাবে ঘটে থাকে। বড় বড় ব্যক্তিগত শিল্পোদ্যোগগুলিতে রাষ্ট্রীয় শিল্পক্ষেত্রগুলির তুলনায় সর্ব স্তরের কর্মীদেরই মজদুরি বেশি। ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমিক ও অদক্ষ শ্রমিকের মজদুরির মধ্যে তফাতটা খুবই বেশি। তার কারণ এই যে ব্যক্তিগত শিল্পক্ষেত্র মূলত বাজারমুখাপেক্ষী, অর্থাৎ শ্রমশক্তির চাহিদা ও সরবরাহের পারস্পরিক অনুরূপত অনুরূপী তা ঠিক হয়। অন্য দিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি মজদুরি সম্পর্কে যে সরকারী নীতি মেনে চলে তার উদ্দেশ্য হল স্বল্পবিত্ত শ্রমিকদের সাহায্য করা এবং মজদুরির মধ্যকার বিভেদ কমিয়ে আনা।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মজদুরির হারের উপর ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার করে জাতি-অতিগ

কর্পোরেশনগুলি। জাতি-অতিগ শিল্পোদ্যোগগুলিতে উন্নত দেশসমূহে অবস্থিত অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের তুলনায় মজদুরির হার অনেক নিচে। জাতি-অতিগ কর্পোরেশনগুলি তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠানে ঘণ্টা পিছদ্বয়ৎসামান্য মজদুরি বেঁধে দিয়ে দীর্ঘায়ত কর্ম-দিবস স্বীকার করে নিতে শ্রমিকদের বাধ্য করে। যেমন সিঙ্গাপুরে ও দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন জাতি-অতিগ যে-সমস্ত কর্পোরেশনের শাখা আছে সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কর্ম-দিবসের স্থিতিকাল যথাক্রমে ১৮ শতাংশ ও ২৪ শতাংশ বেশি। লক্ষণীয় এই যে অতীতে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মজদুরির নিম্ন হারের কারণ ছিল শ্রমের উৎপাদনশীলতার নিম্ন মাত্রা। কিন্তু বর্তমানে উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা বৃদ্ধি পেতে থাকায় নবীন রাষ্ট্রগুলিতে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বহুত উন্নত দেশগুলির সূচকের কাছাকাছি চলে এসেছে, মজদুরির পার্থক্য কিন্তু কিছুতেই দূর হচ্ছে না।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও স্ত্রী-পুরুষের পার্থক্য ইত্যাদি বিচার মজদুরির বৈষম্যের ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে। নির্দিষ্ট কোনো কোনো পর্যায়ের কর্মী যাতে উচ্চ বেতনের সম্মানীয় বৃত্তিতে না যেতে পারে তার জন্য সামাজিক বিধিনিষেধের নানা গন্ডী বেঁধে দিয়ে অনেক সময় এই বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়। এই প্রবণতা বিশেষ প্রকট হয়ে ওঠে নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যাপারে — দেখা যায় আধুনিক সমাজের দৃষ্টিতে যে-সমস্ত কাজের বিশেষ

কোনো মর্যাদা নেই। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রধানত শিল্পের অপেক্ষাকৃত স্বল্প উৎপাদনশীল সব ক্ষেত্রে, বাণিজ্য ও সেবাব্যবস্থায় নারীরা অদক্ষ হাতের কাজ করে থাকে। এই কারণেই স্ত্রীলোকের গড়পড়তা আয় পুরুষের আয়ের ৫০ থেকে ৬৫ শতাংশ হয়। কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি খারাপ হলে প্রথমে ছাঁটাই হয় নারীরা।

ভাড়া খাটার সুযোগ, মজুরি ও সামাজিক অধিকারের ক্ষেত্রে খোলাখুলিভাবে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় বহিরাগত শ্রমিকদের প্রতি। সমস্ত রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত এই শ্রমিকদের প্রধানত অদক্ষ শ্রমের সাময়িক কাজে সস্তার শ্রমশক্তি হিসেবে কাজে লাগানো হয়। এদের মজুরি নিয়মিত শ্রমিকদের তুলনায় ২০-৫০ শতাংশ কম। কলকারখানার নিয়মিত পর্যায়ের প্রলেতারিয়েত কর্মিদল আর বহিরাগত শ্রমিকদের মাঝখানে আরেক স্তরের শ্রমিক আছে যারা চুক্তিবদ্ধ, যাদের রিক্রুট করা হয়েছে পাড়াগাঁ আর শহরের গরিব মহল্লাগুলো থেকে। এই রকমের চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের গড়পড়তা আয় নিয়মিত শ্রমিকদের তুলনায় ৬০-৬৫ শতাংশ হয়।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মজুরির হারের পার্থক্য বহুল পরিমাণে অর্থনীতি-বহির্ভূত কারণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু নবীন রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক কারণগুলিই ক্রমে প্রাধান্য পাচ্ছে, তাই সেই সব দেশের মজুরির প্রভেদ

ধীরে ধীরে উন্নত দেশসমূহের মজদুরির প্রভেদের কাছাকাছি চলে আসছে।

উল্লেখযোগ্য এই যে মজদুরিই শ্রমজীবী মানুষের আয়ের একমাত্র উৎস নয়।

পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রণালীর প্রতিষ্ঠালাভের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীরা উৎপাদনের উপায় থেকে বঞ্চিত হতে থাকে, সৃষ্টি হয় প্রলেতারিয়েতের এক বিশাল বাহিনী। বেকারি, কলকারখানায় প্রাপ্ত আঘাতের ফলে দৈহিক অসুস্থতা ও পেশাসংশ্লিষ্ট রোগ, অকালে কর্মক্ষমতা হারানো, অকালবার্ধক্য — পুঁজিবাদের কল্যাণে এই ‘সম্পদই’ অর্জন করেছে শ্রমিক শ্রেণী। শ্রমিকেরা তাদের অবস্থা ও শ্রম পরিস্থিতির উন্নতির জন্য, স্বেচ্ছাচারী শোষণের বিরুদ্ধে বহু দশক ধরে শ্রেণী সংগ্রাম চালায়। পুঁজিবাদী দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণীর শক্তি ও সংগঠনক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পুঁজিপতিদের প্রবল বাধা সত্ত্বেও শ্রমিক শ্রেণী ধর্মঘট ও হরতাল পালন করে, ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত হয়ে ধীরে ধীরে তাদের জীবনযাপন অনেকটা সহনীয় করে তুলতে সক্ষম হয়েছে — তাদের মজদুরির হার বৃদ্ধি হয়েছে, তারা সামাজিক বীমা ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে প্রবর্তিত এই শেষোক্ত ব্যবস্থাটিই হবে আমাদের পরবর্তী আলোচ্য বিষয়।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সচরাচর সামাজিক বীমা, সরকারী ভাতা এবং ‘সার্বিক’ সামাজিক নিরাপত্তা — এই তিন ধরনের রাষ্ট্রীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার

প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত ব্যবস্থা সামাজিক বীমার বৈশিষ্ট্য এই যে শ্রমিকদের মজদুরি থেকে জীবনবীমা বাবদ চাঁদা বাধ্যতামূলক ভিত্তিতে কেটে নিয়ে জীবনবীমাকৃত ব্যক্তির পরিবারের আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে সকলকে পেনশন ও আর্থিক সাহায্য লাভের অধিকার দান (অবশ্য বীমার প্রয়োজনীয় কাল সীমা, নির্দিষ্ট বয়ঃসীমা ইত্যাদি আরও কিছু কিছু শর্ত প্রতিপালিত হলে)।

সরকারী ভাতা সম্পূর্ণভাবে প্রদান করা হয়ে থাকে রাষ্ট্রের বাজেট থেকে। তবে কাজে অক্ষম হয়ে পড়ে অথবা বেকার হয়ে রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গেলেই যে তা পাওয়া যাবে এমন নয়। পরিবারের সকল সদস্যদের আয় যাচাই করে দেখার পর আনুষ্ঠানিকভাবে যদি স্বীকৃত হয় যে শ্রমজীবীর পরিবারের জীবন-ধারণের কোনো সঙ্গতি নেই একমাত্র তখনই এই ভাতা পাওয়া সম্ভব। প্রশাসন দপ্তরের বিবেচনার উপর আর্থিক সাহায্যের অনুমোদন নির্ভর করে।

‘সার্বিক’ ব্যবস্থা বলতে যা বোঝায় তা প্রধানত পেনশন লাভের সুযোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সুইডেন, ফিনল্যান্ড, নরওয়ে, কানাডা ও স্পেনে এই ব্যবস্থার প্রচলন আছে। ওই সমস্ত দেশে যারা অবসরগ্রহণের বয়ঃসীমায় পৌঁছেছে, পঙ্গু হয়ে পড়েছে অথবা ভরণপোষণকারীকে হারিয়েছে, তারা সকলেই পেনশন লাভের অধিকারী। পেনশনের পরিমাণ নির্দিষ্ট, সকলের জন্য সমান। ১৬-১৮ বছর বয়স থেকে শুরু

করে অবসরগ্রহণের বয়ঃসীমা পর্যন্ত সমস্ত নাগরিকের কাছ থেকে বিশেষ এক ধরনের কর আদায়ের মাধ্যমে ওই পেনশনের তহবিল গড়ে তোলা হয়।

রাষ্ট্রীয় সামাজিক নিরাপত্তা ছাড়াও ভবিষ্যতে রোজগার বন্ধ হয়ে গেলে তার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার আরও যে একটি রূপ পুঁজিবাদী দেশগুলিতে আছে তা হল প্রাইভেট জীবনবীমা। জীবনবীমা কোম্পানিগুলির মালিকদের মূনাফালাভের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ-গ্রহণের যে পুঁজিতান্ত্রিক মূলনীতি আছে পুরোপুরি তারই ভিত্তিতে এই জীবনবীমা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সামাজিক নিরাপত্তার সবচেয়ে বহুল প্রচলিত রূপ হল তথাকথিত প্রিভিডেন্ট ফান্ড বা ভবিষ্য নিধি, ব্যবস্থা। কর্মে নিযুক্ত প্রতিটি মানব যাকে ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজের কল্যাণের দায়িত্ব নিজেই সূনিশ্চিতভাবে পালন করতে পারে সেটাই প্রিভিডেন্ট ফান্ডের উদ্দেশ্য। এই ব্যবস্থা অনেকটা সেভিংস ব্যাঙ্কের মতো — একমাত্র তফাত হল এই যে এক্ষেত্রে সঞ্চয়ের জন্য অর্থ প্রদান করাটা বাধ্যতামূলক।

ওই সমস্ত দেশে অসামরিক ও সামরিক কর্মচারী (এশিয়া ও আফ্রিকার কোনো কোনো দেশে একমাত্র এই দুটি গোষ্ঠীই সামাজিক নিরাপত্তার সুযোগসুবিধা ভোগ করে) এবং আধুনিক শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত মজুরি শ্রমিকদের একটি অংশ (তাদের কে কোন্ শিল্পশাখায় আছে, শিল্পপ্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা কত তার ভিত্তিতে এবং উক্ত শ্রমিকরা মজুরির একটি

নির্দিষ্ট স্তরে পেঁছলে তবেই) — অর্থাৎ শ্রমজীবীদের একটা নগণ্য অংশ সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় পড়ে। এই সব দেশের জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ — যারা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে, সেই সঙ্গে কুটীরশিল্পী, ছোটখাটো ব্যবসায়ী, ঝি-চাকর, অসংগঠিত শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত কর্মী — এরা কেউই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারী নয়।

আমরা এখনও কিন্তু পুঁজিতন্ত্রে সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল গঠনের উৎস নিয়ে আলোচনা করি নি। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে, এই তহবিলের প্রধান উৎস হল শ্রমিক ও কর্মচারীদের নিজেদেরই প্রদত্ত চাঁদা। সামাজিক নিরাপত্তা তহবিলে যে পরিমাণ অর্থ জমা পড়ে তার মধ্যে শ্রমজীবীদের নিজেদের অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৯.৫, অস্ট্রিয়ায় ৩১.৯, কানাডায় ৩৫, হল্যান্ডে ৪৮.১ এবং গ্রীসে ৬৩ শতাংশ।

কোনো কোনো দেশে সামাজিক নিরাপত্তা তহবিলে শ্রমিক ও কর্মচারীদের দেয় পরিমাণ তাদের মজুরির ৪ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। যেমন, অস্ট্রিয়ার একজন শ্রমিকের প্রতি মাসের মাইনে থেকে বার্ষিক্য ও পঙ্গুতাজনিত পেনশন এবং ভরণপোষণকারীকে হারানোর সম্ভাবনায় বীমাবাদ ৮.৭৫ শতাংশ, অসুস্থতা, গর্ভধারণ ও সন্তানের জন্মজনিত বীমাবাদ ৩.৬৫ শতাংশ, কর্মহীনতাজনিত বীমাবাদ ১ শতাংশ এবং পারিবারিক ভাতার কর বাবদ ৩ শতাংশ কাটা যায়। এইভাবে একজন শ্রমিকের

মাসিক আয় থেকে মোট ১৬.৪ শতাংশ পর্যন্ত অর্থ কাটা গিয়ে সামাজিক নিরাপত্তা তহবিলে জমা হতে পারে।

বীমাবাদ দেয় অর্থের পরিমাণ সময় সময় বৃদ্ধি পেতে থাকায় শ্রমজীবীদের গড়পড়তা আয়ের ক্ষেত্রে তার অংশও ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে করদাতাদের পকেট থেকে পুঁজিবাদী দেশগুলির বাজেটে ক্রমবর্ধিত হারে এই যে বিপুল পরিমাণ অর্থের আগম হচ্ছে, পরন্তু যার উদ্দেশ্য সামাজিক নিরাপত্তা গড়ে তোলা, তার ফলে বৃদ্ধি বা শ্রমজীবী জনসাধারণের সামাজিক নিরাপত্তার উৎকর্ষসাধনের বৈষয়িক ভিত্তি সৃষ্টি হয়। কিন্তু পুঁজিপতির হাতে কোনো জিনিস পড়লে সে অত সহজে তা হাতছাড়া করতে রাজী নয়। যে টাকার মালিক মেহনতী জনসাধারণ, বুর্জোয়া সরকারগুলি শোষক শ্রেণীর স্বার্থে কৌশলে তা হস্তগত করে। শ্রমজীবীদের কাছ থেকে সামাজিক বীমাবাদ সংগৃহীত অর্থের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ কখনোই তাদের পরিশোধ করা হয় না। সামাজিক নিরাপত্তা তহবিলে চাঁদা বাবদ শ্রমিকের প্রদত্ত অংশ সেখান থেকে সে যে উপকার পায় তাকে ছাড়িয়ে যায়। কানাডায় এই ছাড়িয়ে যাওয়ার পরিমাণ ১৮.১ শতাংশ, ফিনল্যান্ডে ১০.৬, আইসল্যান্ডে ১৬.৬, জাপানে ২৭.৪, নেদারল্যান্ডস-এ ১৫.৬, পর্তুগালে ২৭.৪, সুইডেনে ১৮.২, সুইজারল্যান্ডে ১৩.৯ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১০.৩ শতাংশ।

বহু পুঁজিবাদী দেশে বাধ্যতামূলক সামাজিক বীমাব্যবস্থা জনসাধারণের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপানোর একটি রূপ হিসেবে কাজে লাগানো হয়। এই কারণে বন্টনযোগ্য তহবিল গড়ে তোলার জন্য যত পরিমাণ অর্থের আবশ্যক, বীমার চাঁদা তার চেয়ে ১.৫ থেকে ৫ গুণ উপরে বেঁধে দেওয়া হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, তুরস্ক সামাজিক নিরাপত্তার জন্য শ্রমজীবীদের কাছ থেকে যে কর আদায় করা হয় তার ৫৪ শতাংশ উক্ত উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়, বাদবাকি অংশে রাষ্ট্রের অন্যান্য ব্যয় নির্বাহিত হয়।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল গঠনে শ্রমজীবী জনসাধারণের অংশগ্রহণ আইনের দ্বারা সামাজিক বীমায় তাদের যে বাধ্যতামূলক চাঁদার হার নির্দিষ্ট হয়েছে তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শ্রমিকদের একটা অংশ বেশি পরিমাণে অথবা অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক শর্তে পেনশনভোগের অধিকার লাভের উদ্দেশ্যে তাদের কলকারখানা বা কোম্পানির নানাবিধ প্রাইভেট বীমাব্যবস্থার শরণাপন্ন হয়। সচরাচর এই সব প্রাইভেট পেনশন ফান্ডের অর্থ সরবরাহ ও অর্থব্যয়ের যে পদ্ধতি, তা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এই কারণে উক্ত তহবিল থেকে শ্রমিকের পেনশন পাওয়ার অধিকার গ্যারান্টিযুক্ত নয়। কর্মী যদি তার কাজের জায়গা ছেড়ে যায় তাহলে সে এই অধিকার তো হারায়ই, সঙ্গে সঙ্গে যে চাঁদা সে ইতিমধ্যে দিয়েছে তাও হারায়।

আন্তর্জাতিক আইনসম্মত যে মান আন্তর্জাতিক

শ্রমসংস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা সহায়তা, অসুস্থতার কারণে ভাতা, কর্মহীনতার দরুন ভাতা, বার্ধক্যজনিত পেনশন, উৎপাদনক্ষেত্রে অঙ্গহানি ও পেশাগত রোগের দরুন ভাতা, পারিবারিক ভাতা, অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় ও সন্তান প্রসবকালীন ভাতা, পঙ্গুতাজনিত ভাতা ও ভরণপোষণকারীকে হারানোর ক্ষেত্রে ভাতা — এই নয় ধরনের বীমা সামাজিক নিরাপত্তার পর্যায়ে পড়ে। এমন একটিও পুঞ্জিবাদী দেশ নেই যেখানে এর সবগুলি একসঙ্গে প্রচলিত আছে। এটা সম্ভব হয়েছে একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজে।

পুঞ্জিবাদী দেশগুলির মধ্যে ১১৮টি দেশ উল্লিখিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাগুলির অন্তত একটির উপর আইন প্রচলন করেছে। বার্ধক্য ও পঙ্গুতাজনিত পেনশন এবং ভরণপোষণকারীকে হারানোর ক্ষেত্রে ভাতা ১০৭টি দেশে বিবেচিত হয়েছে, সাময়িক অক্ষমতার দরুন, অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় ও সন্তান প্রসবকালীন ভাতা প্রচলিত আছে ৫৯টি দেশে, ১০৮টি দেশে উৎপাদনক্ষেত্রে অঙ্গহানি ও পেশাগত রোগের দরুন ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

বর্তমান কালে বিকাশের ব্যাপকতা ও স্তরের বিচারে সামাজিক বীমার প্রধান ধরন হল পেনশন ব্যবস্থা। পুঞ্জিবাদী রাষ্ট্রগুলি পেনশন প্রদানের নানাবিধ শর্ত (বয়স, বীমা অথবা চাকুরীর ব্যাপ্তিকাল, নাগরিকতার ব্যাপ্তিকাল), পেনশনের হার নির্দেশের নীতি (বাঁধা, ন্যূনতম অথবা মজদুরির অনুপাতে)

এবং বাঁমা তহবিল গড়ে তোলার বিধিব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও পেনশন ব্যবস্থা প্রসার লাভ করেছে। লাতিন আমেরিকা, ক্যারিবিয়ান অঞ্চল ও আফ্রিকার অধিকাংশ দেশে এবং এশিয়ার এক-তৃতীয়াংশ দেশে এই ব্যবস্থার প্রচলন আছে। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পেনশন নির্ধারণের পদ্ধতির মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো তফাত নেই। তবে শেষোক্ত দেশগুলিতে যেখান থেকে পেনশনের কাল গণনা করা হয় সেই চাকুরীর ব্যাপ্তকাল, পেনশন গণনার ভিত্তিস্বরূপ মজুরির পরিমাণ এবং যে পরিমাণ কর্মকালের হিসাবে পেনশনের উর্ধ্বতম ও নিম্নতম মাত্রা স্থির করা হয় সেগুলির গুরুত্ব বিবেচনা করার ক্ষেত্রে পার্থক্য লক্ষ করা যায়।

পুরুষদের পেনশনযোগ্য বয়স ইতালি, ফ্রান্স, জাপান ও তুরস্ক ৬০ বছর, বেলজিয়ম, গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্র ও মেক্সিকোয় ৬৫ বছর, নরওয়ে, সুইডেন এবং আর কোনো কোনো দেশে ৬৭ বছর। বস্তুতপক্ষে উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রথরতার দরদূন দেখা যায় কোনো শ্রমিক ৪০-৪৫ বছর বয়সের সীমায় উপনীত হলে — বিশেষত কনভেয়র লাইনে যন্ত্রাদি সংযোজনের কাজে — কারিগরি অপারেশন আর তেমন নিখুঁত ও দ্রুত করতে সক্ষম হয় না। কারবারের মালিকরা প্রথমেই চেষ্টা করে প্রোঢ় ব্যক্তিদের খারিজ করার। এই কারণে পরিসংখ্যানে দেখা যায় বেকারদের মধ্যে এদের সংখ্যা অন্যান্য

বয়ঃগোষ্ঠীর লোকের চেয়ে সবসময় বেশি। পরন্তু এটাও লক্ষ করার মতো যে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক ও ভারী ধরনের কাজে নিযুক্ত কর্মীদের বিশেষ সদুযোগসুবিধাজনক পেনশনের ব্যবস্থা খুবই সীমাবদ্ধ।

বর্তমানে লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে যে পেনশন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে সেগুলির বেশির ভাগই ৬০-৬৫ বছর বয়সের ব্যক্তিদের বার্ষিক্যজনিত পেনশন অর্জনের (উরুগুয়ে বাদে — সেখানে পেনশনযোগ্য বয়স ৭০ বছর) বৈধ অধিকার স্বীকার করে। কোনো কোনো দেশে স্ত্রীলোকদের পেনশনযোগ্য বয়স পুরুষদের অপেক্ষা ৫ বছর কম। এশিয়া ও আফ্রিকার অধিকাংশে দেশে পেনশনযোগ্য বয়স ৬০ বছর। বহু উন্নয়নশীল দেশে মানুষের গড়পড়তা আয়ু উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক নীচে (৫০ বছর) — এই তথ্য মনে রাখলে বয়সের উক্ত সীমাকে বেশ উঁচুই বলতে হবে। স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক ও ভারী পরিশ্রমের কাজের ক্ষেত্রে লাতিন আমেরিকার কোনো কোনো দেশে (আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, কলম্বিয়া, নিকারাগুয়া, পেরু, ভেনেজুয়েলা), ইরানে ও তুরস্কে পেনশনযোগ্য বয়ঃসীমা হ্রাসের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এটা কেবল তাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যারা বেশ দীর্ঘকাল ধরে সামাজিক নিরাপত্তা তহবিলে চাঁদা দিয়ে এসেছে অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট একটা মেয়াদ পর্যন্ত কাজ করেছে।

পেনশনযোগ্য বয়স অর্জনের পর এবং প্রয়োজনীয়

কর্মকাল অথবা বীমার ব্যাপ্তিকাল পূর্ণ হওয়ার পর যে পেনশন পাওয়া যায় তা যৎসামান্য — সচরাচর উপার্জনের ২৫-৪০ শতাংশ। সেই আয়ে কোনো মানুষের পক্ষে জীবনধারণের ন্যূনতম দাবিও মেটানো সম্ভব নয়। এরকম হওয়ার কারণ বেশ কয়েকটি। প্রথমত, পেনশনের পরিমাণ অনেক সময়ই নির্ভর করে কর্মকালের ব্যাপ্তির উপর, অথচ শ্রমশক্তির মূল অংশ হল সম্প্রতি গ্রাম থেকে আসা লোকজন। দ্বিতীয়ত, পেনশনের নিম্ন হারের কারণ তাদের অতি নিম্ন পরিমাণের মজদুরি। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্রাজিলের মোটরগাড়ি শিল্পে তা মার্কিন মোটরগাড়ি শিল্পের শ্রমিকের মজদুরির ৬.৯ শতাংশের সমান, আর্জেন্টিনায় — ৬.৪ শতাংশ, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে — ৪, মেক্সিকোয় — ২০.৭, ভেনেজুয়েলায় — ১৮.৫, আর পেরুতে — ১৭.৩ শতাংশ। এছাড়া উন্নত দেশগুলির তুলনায় মদ্রাস্রাফীতির হার বেশি হওয়ার দরুন প্রকৃত টাকার অঙ্কে পেনশনের পরিমাণ বেশ কিছু মাত্রায় হ্রাস পায়। ভোগ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে যেমন পেনশনলব্ধ অর্থের মূল্য, তেমনি কোনো কোনো দেশের সরকার কর্তৃক নানা রকম মাগ্গি ভাতা দিয়ে পেনশনের হার সংশোধনের প্রয়াস প্রকৃতপক্ষে নিরর্থক হয়ে পড়ে। শ্রমজীবী যদি পেনশনযোগ্য বয়সে পৌঁছানোর আগেই অবসর গ্রহণ করে তাহলে তার পেনশনের পরিমাণ ছাঁটাই হয়।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে পঙ্গুতাজনিত পেনশন

এবং ভরণপোষণকারীকে হারানোর দরদুন পেন্‌শনের ব্যবস্থাও সীমাবদ্ধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০-৬৪ বছর পর্যন্ত বয়ঃসীমার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের মোট সংখ্যার ১২.৩ শতাংশ অর্থাৎ ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোক অক্ষম, পঙ্গুপর্ষায়ভুক্ত, অথচ পঙ্গুতাজনিত পেন্‌শনের অধিকারী মাত্র ৭ শতাংশ।

পর্দাজিবাদী দেশগুলিতে বার্ষিক্যজনিত পেন্‌শনের মতো পঙ্গুতাজনিত পেন্‌শন এবং ভরণপোষণকারীকে হারানোর দরদুন পেন্‌শনও পরিমাণে অত্যন্ত কম। অসুস্থতা অথবা মৃত্যুর কারণ এবং বীমার ব্যাপ্তিকাল বিষয়ে যে-সমস্ত কঠোর বিধিনিষেধ আছে তার ফলে যারা এই পেন্‌শনের অধিকারী তাদের সংখ্যা সীমিত। যেমন, পঙ্গুতাজনিত পেন্‌শন অস্ট্রিয়ায় একমাত্র তারাই পায় যারা বীমাবাদ ২৬০ সপ্তাহের চাঁদা পরিশোধ করেছে, জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ৬০ মাসের চাঁদা, ইতালিতে ৫ বছরের। সুইজারল্যান্ডে যে শ্রমিক ২১ বছর বয়স থেকে শুরুর করে একটি বছরও ফাঁক না দিয়ে নিয়মিতভাবে বীমার অর্থ পরিশোধ করেছে একমাত্র সে-ই পঙ্গুতাজনিত পেন্‌শনের অধিকারী বলে বিবেচ্য।

পঙ্গুতাজনিত পেন্‌শন প্রদানের বাধ্যবাধকতা যখন আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট তখন স্থায়ীভাবে, পুরোপুরি অথবা অন্ততপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ কর্মক্ষমতা হারালে তবেই তা দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যের কারণ ছাড়াও পঙ্গুতাজনিত পেন্‌শন অনুমোদনের আরেকটি শর্ত হল ৬৬-৮০ শতাংশ মজুরি হ্রাস। ডেনমার্ক যে

ব্যক্তি দুই-তৃতীয়াংশ কর্মক্ষমতা হারিয়েছে সে পঙ্গুতাজনিত পেনশনের অধিকারী রূপে বিবেচ্য। ফিনল্যান্ডে সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতা যে হারিয়েছে সে উক্ত পেনশনের অধিকারী। সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাহীন এবং দুই-তৃতীয়াংশ কর্মক্ষমতাহীন ব্যক্তি যেহেতু মোট পঙ্গু জনসংখ্যার ৩৫ থেকে ৪০ শতাংশ, সেই হেতু পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অধিকাংশ পঙ্গু ব্যক্তি পেনশনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

এক স্বতন্ত্র ধরনের সামাজিক নিরাপত্তারূপে পারিবারিক ভাতার যে ব্যবস্থা আছে তার প্রচলন যুবই কম: মাত্র ৬৫টি দেশে পরিবারের সন্তানদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আজ পর্যন্ত এ ধরনের ভাতার ব্যবস্থা নেই। এই ভাতা সচরাচর পরিবারের আয়তন ও পারিবারিক আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্র, জাপান এবং আরও কিছু দেশের আইনে যে-সমস্ত পরিবারে সন্তানের সংখ্যা ৩ বা তদুর্ধ্ব, একমাত্র তাদের জন্যই ভাতার সংস্থান আছে। ভাতার পরিমাণ এতই কম যে তাকে সম্ভবত প্রতীকধর্মী বলাই সমীচীন হবে। যেমন, অস্ট্রেলিয়ায় এর পরিমাণ সন্তানের মাথা পিছু ০.৫ ডলার, ইংলন্ডে সপ্তাহে ১ পাউন্ড। পরন্তু এই নগণ্য পরিমাণ অর্থও সংসারী লোকদের করপ্রদানের ক্ষেত্রে যে-সমস্ত অব্যাহতি আছে, সচরাচর তার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

যে-সমস্ত পরিবারে শিশুসন্তান আছে তাদের ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত নতুন একটি

উপাদান হল অনুদা জননীদেব জন্ম ভাতা। এই ব্যবস্থা পুঁজিবাদী সমাজে কিন্তু বহুল প্রচলিত নয়। এই ধরনের ভাতা প্রদানের মেয়াদ খুব একটা বেশি নয় — দৃষ্টান্তস্বরূপ, ফ্রান্সে মাত্র ৩ বছর।

পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ায় শিশুর জন্মমহুতের আগে থেকেই তার স্বার্থ অবহেলিত। বিশেষত তা প্রকট হয়ে ওঠে মাতৃস্বের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে। পশ্চিমের বহু দেশে সমগ্র জাতিভিত্তিক বিশেষ বিধিব্যবস্থা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও কর্মরতা সকল স্ত্রীলোকই অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় ও সন্তানপ্রসবকালে প্রাপ্য ছুটি ষষ্ঠ দীর্ঘ সময়ের জন্য পায় না এবং উক্ত ছুটির পূর্বে যে রোজগার সে হারায় তার উপযুক্ত খেসারতও দেওয়া হয় না। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় ও সন্তানপ্রসবকালে ভাতা পাওয়ার অধিকারিণী নারীদের সংখ্যা সচরাচর অত্যন্ত সীমিত, সর্বোপরি এই কারণে যে এর জন্য অন্ততপক্ষে নিরবচ্ছিন্নভাবে দু বছর কাজের নজির থাকা চাই। স্কুল কলেজ থেকে সদ্য পাশ করে যে সব মেয়ে কাজে ঢুকেছে এবং যে-সমস্ত মহিলা কর্মী ওই সময়ের মধ্যে কাজের জায়গা বদলেছে তারা এই ভাতা থেকে বঞ্চিত হয়।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় ও সন্তানপ্রসবকালে সবেতন ছুটির ব্যবস্থা আছে তা নিভাঁর করে সামাজিক বীমা তহবিলে প্রদত্ত চাঁদার পরিমাণের উপর। এছাড়া আরও কিছু কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন, সিঙ্গাপুরে মহিলারা অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় ও

সন্তানপ্রসবকালে ছুটি পেতে পারে সারা জীবনে মাত্র তিন বার।

অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় ও সন্তানপ্রসবকালে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে যে ছুটির ব্যবস্থা আছে তা নিতান্তই স্বল্পকালীন। বহু পুঁজিবাদী দেশে এই ছুটির মেয়াদ হয় সপ্তাহ। নেপাল, সৌদি আরব ও দক্ষিণ কোরিয়ার মতো উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় ও সন্তানপ্রসবকালে ছুটির আদৌ কোনো ব্যবস্থা নেই। হংকং-এ নারীরা ছুটির অধিকার পায় মাত্র দশ দিনের — তাও আবার বিনা বেতনে। মেয়েদের ভাতার পরিমাণও সীমিত — অস্ট্রিয়ায় ও জাপানে ৬০ শতাংশে, স্পেনে — ৭৫, ইতালিতে — ৮০, শুধু ডেনামার্ক আর ফ্রান্সে বেতনের — ৯০ শতাংশে। এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশসমূহে এই ভাতার পরিমাণ বেতনের ৩৩ থেকে ৮০ শতাংশের মধ্যে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় ও সন্তানপ্রসবকালে ছুটির ব্যবস্থা বহু দেশে স্বতন্ত্র কোনো সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিশেবে প্রচলিত নয় — অনেক সময়ই তা অসুস্থতা ও কর্মহীনতাজনিত ভাতার বিকল্প হয়ে দেখা দেয়; ফলে যাকে বলে ‘প্রতীক্ষাপর্ব’, কাজ থেকে ছাড়া পাওয়ার সেই নির্দিষ্ট পর্বের জন্য যেহেতু কোনো ভাতা দেওয়া হয় না সেই হেতু অর্থপরিশোধের মেয়াদও হ্রাস পায়।

পুঁজিবাদী দেশসমূহে শ্রমজীবীদের সামাজিক নিরাপত্তার চরম অভাব দেখতে পাওয়া যায় চিকিৎসা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। শ্রমজীবীদের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্বগ্রহণ

বুর্জোয়া সরকারদের কাছে বড় বেশি বোঝা বলে মনে হয়, তাই স্বাস্থ্যরক্ষা বাবদ খরচের দায়দায়িত্ব তারা শ্রমজীবীদের নিজেদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করে। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকর্তা একমাত্র তখনই রোগপ্রতিষেধ ব্যবস্থায় আগ্রহ প্রকাশ করে যদি তার মধ্যে লাভের কোনো প্রতিশ্রুতি থাকে — শ্রমিকদের অসুস্থতায় ফলে শ্রমের উৎপাদনশীলতায় যে ঘাটতি দেখা যায় এবং নিয়োগকর্তাদের যে আর্থিক ক্ষতি হয় তা নিবারণ করার উদ্দেশ্যেই অনেক সময় তারা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বেশির ভাগ শ্রমজীবী মানুষ অসুস্থতার দরুন বীমার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় যথা সময়ে চিকিৎসা ব্যবস্থার অথবা হাসপাতালে চিকিৎসিত হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না। অথচ মজুরি শ্রমিকদের অসুস্থতার দরুন যে পরিমাণ কর্ম-নির্বাসের ক্ষতি হয় তার হিসাব করলে চিকিৎসা সংক্রান্ত বীমার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর সাময়িকভারে কর্মক্ষমতা হারানোর দরুন কলকারখানায় নিযুক্ত সর্বাধিক শ্রমিকের মধ্যে শতকরা ১৭ জন কাজের জায়গায় অনুপস্থিত থাকে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে অসুস্থতা শ্রমজীবীদের পক্ষে বিলাসিতার সামিল। ঐ সমস্ত দেশের মাত্র দুটিতে — ইংলন্ড ও ইতালিতে — স্বাস্থ্যরক্ষার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। বাকি দেশগুলিতে চিকিৎসা ব্যবস্থা অর্থব্যয়সাপেক্ষ। তবে তথাকথিত

অবৈতনিক জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাও বহুলাংশে শুধু নামেই রাষ্ট্রায়াত্ত, আসলে বেসরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে তার বিশেষ পার্থক্য নেই।

অধিকাংশ পূঁজিবাদী দেশে শ্রমজীবী মানুষেরা বীমাবাদ যে অর্থ ব্যয় করে তারই একটা অংশ দিয়ে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। যেমন ফ্রান্সে বীমার চুক্তিবদ্ধ একজন ব্যক্তি কিছু কিছু ওষুধপত্রের খরচ বাদে তার চিকিৎসার সমস্ত ব্যয়ের ২০ শতাংশ নির্বাহ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একজন রোগীকে হাসপাতালে যতবার ভর্তি হচ্ছে ততবারই তাকে ভর্তি-ফী বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে হয়। এছাড়া নির্দিষ্ট মেয়াদের (৭০-৯০ দিন) উপরে হাসপাতালে থাকলেও দৈনিক একটা ফী তাকে দিতে হয়।

বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাব এবং সেই সঙ্গে অনেক সময় অসুস্থতাজনিত ভাতার অভাবের দরুন শ্রমজীবীদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে ওঠে। গড়পড়তা হিসেবে মার্কিন দেশের একটি পরিবারকে বছরে চিকিৎসা বাবদ যে ব্যয় করতে হয় তা পরিবারের প্রধানের মাসিক আয়ের প্রায় সমান। আর চিকিৎসা ব্যবস্থার ব্যয় অসংযতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকার ফলে এই অঞ্চলও ক্রমাগত ঊর্ধ্বগামী হয়ে চলে। দক্টারসম্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৭৯ থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থার মূল্য ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে আর ১৯৬৫ সাল থেকে শুরু করে সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ৭০০ শতাংশ।

অসুস্থতা অথবা দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে শ্রমজীবী

মানুষের ঘাড়ের চাপে দুর্দীর্ঘ বোঝা; তাকে চিকিৎসার খরচ তো যোগাতেই হয়, পরন্তু সাময়িকভাবে কর্মক্ষমতা হারানোর দরুন ওই সময় সে কোনো বেতন পায় না। সাময়িকভাবে কর্মক্ষমতা হারানোর দরুন আর্থিক সহায়তার যে ব্যবস্থা আছে তা পরিশোধের ক্ষেত্র সীমিত। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সীমিত তালিকার মধ্যে কর্মক্ষমতা হারানোর যে-সমস্ত কারণের উল্লেখ থাকে তার ভিত্তিতে শ্রমিকদের মাত্র একটা অংশ এই সদুযোগের অধিকারী। অধিকাংশ দেশে ভাতা দেওয়া হয় শুধু কলকারখানায় দুর্ঘটনার ফলে প্রাপ্ত আঘাত ও পেশাগত রোগের ক্ষেত্রে। অতি অল্প সংখ্যক কয়েকটি দেশে অন্য ধরনের অসুস্থতার ক্ষেত্রেও এই সদুবিধা দেওয়া হয়।

সাময়িকভাবে কর্মক্ষমতা হারানোর দরুন ভাতা একমাত্র তাদেরই দেওয়া হয় যারা কর্মক্ষমতা হারানোর অব্যবহিত পূর্বে মৃদুত্বের বীমা তহবিলে চাঁদার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পরিশোধ করেছে। এই ধরনের সীমাবদ্ধতার ফলে সর্বোপরি কমবয়সী নতুন কর্মী, মরশুমী ও সাময়িক কাজের লোকেরা অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়।

পুঁজিতান্ত্রিক দেশসমূহে তথাকথিত ‘প্রতীক্ষাপর্ব’ নামে যে ব্যবস্থার বহুল প্রচলন আছে, তাও সদুযোগসুবিধাকে অনেকখানি সীমিত করে ফেলে। উক্ত ব্যবস্থার মূল কথা হল এই যে অসুস্থতার প্রথম কয়েক দিন (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৭ দিন, গ্রেট ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া ও বেলজিয়মে ৩ দিন, ডেনমার্ক

৬ দিন) শ্রমিক কোনো ভাতা পায় না, সে তার 'প্রতীক্ষায়' থাকে। কর্মক্ষমতা হারানোর সময় যেহেতু সচরাচর পাঁচ দিনের বেশি হয় না, সেই হেতু উক্ত পরিস্থিতির ফলে, যাদের এই ভাতা পাওয়ার কথা তাদের শতকরা ৮০ জনই তা থেকে বঞ্চিত হয়।

সাময়িকভাবে কর্মক্ষমতা হারানোর দরুন যে ভাতা তার পরিমাণ ন্যূনতম মজদুরির শতকরা হারের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় এবং সচরাচর উক্ত মজদুরির ৫০ শতাংশের উর্ধ্ব হয় না। বীমার কল্যাণে পরিবারের চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয়ের গড়পড়তা মাত্র ১৯ শতাংশ নির্বাহিত হয়।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে শ্রমজীবীদের অসুস্থতাজনিত ভাতা লাভের ব্যাপারে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন, তুরস্কে কোনো শ্রমজীবী অসুস্থ হয়ে পড়লে যদি গত বারো মাসের মধ্যে বীমা তহবিলে তার অন্তত ১২০ দিনের চাঁদা দেওয়া থাকে একমাত্র তবেই সে ওই ভাতা পেতে পারে। অন্যান্য দেশেও অনুরূপ সমস্ত বাধ্যবাধকতা আছে। আরও একটি সীমাবদ্ধতা হল বিভিন্ন কলকারখানায় সরকার কর্তৃক কর্মীর ন্যূনতম সংখ্যা স্থির করে দেওয়া। যেমন, সৌদি আরবে নিয়োগকর্তা একমাত্র তখনই অসুস্থতাজনিত ভাতা দেয় যদি তার মজদুরি শ্রমিকের সংখ্যা ২০ জনের বেশি হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যে-সমস্ত শ্রমজীবী সাময়িকভাবে কর্মক্ষমতা হারায় তাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। এদিকে সাময়িকভাবে

কর্মক্ষমতা হারানোর দরুন সামাজিক বীমার হয় আদৌ কোনো ব্যবস্থা নেই, নয়ত সেই ব্যবস্থা থেকে যথেষ্ট পরিমাণে ভাতা পাওয়া যায় না।

পূর্জিতন্ত্রে এক বিশেষ ধরনের সামাজিক বীমা হল বেকারি বীমা। বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বীমার গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। কিন্তু বেকারি বীমা প্রসারের ক্ষেত্র সীমিত এবং কোথাও তা সব মজদুরি শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন, কানাডায় এই বীমা ৮৯ শতাংশ, ফ্রান্সে ৬০, ইতালিতে ৫৯ শতাংশ শ্রমজীবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রম মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৮১ সালে এক-তৃতীয়াংশেরও কম শ্রমশক্তি এর আওতায় পড়ত। সচরাচর সরকারী কর্মচারী, নিম্ন ও উচ্চ বেতনের কর্মী, মরশুমী কর্মী ইত্যাদি আরও কোনো কোনো পর্যায়ে কর্মী বেকারি বীমা সংক্রান্ত আইনের আওতার বাইরে থেকে যায়।

বেকার ভাতা পেতে হলে একজন ব্যক্তির নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্মকালের (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৪৮ সপ্তাহ) নজির থাকা চাই। আরও একটি শর্ত হল বেকারি শুরুর হওয়ার আগের ত্রৈমাসিক পর্বে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থপ্রাপ্তি। যারা প্রথম কাজ খুঁজছে এই সমস্ত শর্তের ফলে তারা ভাতা পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় — যারা স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাশ করে বেরিয়েছে সঙ্গত কারণেই বীমার ওই পর্বের আওতায় তারা আসতে পারে না।

সামাজিক নিরাপত্তামূলক পেনশন তা বলবৎ

থাকার সমস্ত সময় ধরে চলে (যেমন বার্ষিকজনিত পেনশন লোকে যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন পায়, পঙ্গুতাজনিত পেনশনও যতদিন সে কাজ করতে অক্ষম ততদিন পায়), অথচ বেকার ভাতার স্থিতিকাল কোনো ব্যক্তি কতদিন হল নতুন কাজের সন্ধান করছে তার ওপর নির্ভর করে না। বেলজিয়ম ছাড়া আর সমস্ত দেশে উক্ত ভাতা পাওয়ার পূর্ব কড়াকড়িভাবে নির্দিষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তা ২০ সপ্তাহ। এর ফলে অধিকাংশ বেকার ব্যক্তিই (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮৩ সালেই ছিল ৬৭ শতাংশ) রাষ্ট্রীয় সামাজিক বীমার সুযোগসুবিধা পায় না।

এবার বেকার ভাতার পরিমাণ প্রসঙ্গে আসা যাক। এখানে বুল্জেরিয়া প্রচার যন্ত্র পুঁজিবাদী দেশসমূহে প্রচলিত সামাজিক বীমা সংক্রান্ত আইনের মিথ্যা চিত্র উত্থাপনে বিশেষ তৎপর। আইনে সামগ্রিকভাবে যে বিধিব্যবস্থা নির্ধারিত হয়েছে সেখান থেকে পৃথক পৃথক কতকগুলি সংবিধি বার করে উক্ত প্রচারে এই ধারণা সৃষ্টি করা হয় যে একজন কর্মরত ব্যক্তি যে পরিমাণ মজুরি পায় একজন বেকার কাজ না থাকা সত্ত্বেও সেই একই পরিমাণ ভাতা পায়।

বস্তুতই বেশ কিছু দেশে সামাজিক বেকারি বীমা সম্পর্কে প্রচলিত বুল্জেরিয়া আইনে এমন সমস্ত মান খুঁজে পাওয়া যায় যাতে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ধরনের সম্ভাবনার একটা চিত্র ফুটে ওঠে। কিন্তু আইনের অন্তর্নিহিত শর্তগুলি এমনই যার ফলে ঐ সমস্ত ঘোষিত অধিকার আসলে অর্থহীন হয়ে পড়ে। পৃথক

পৃথক দেশের প্রচলিত আইনের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বেকার ভাতা কখনই মজদুরের সমান নয়: অস্ট্রিয়ায় বেকার ভাতা মজদুরের ৪০ শতাংশ, জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রে ৪৪.৮, বেলজিয়াম ও সুইজারল্যান্ডে ৬০ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৫০ শতাংশ। সুতরাং বেকার ভাতার যা পরিমাণ তাতে পুঞ্জিবাদী উৎপাদনক্ষেত্র থেকে বহিস্কৃত ব্যক্তিরা এবং তাদের পরিবারবর্গ প্রায় ভিখারীর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। এই হল পুঞ্জিবাদী দুনিয়ার বাস্তবতা।

বোশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশে বেকারি বীমার কোনো অস্তিত্ব নেই। ইরান ও তুরস্কের মতো কোনো কোনো দেশে আইন অনুযায়ী নিয়োগকর্তা কোনো কর্মীকে ছাঁটাই করলে থোক টাকা দিতে বাধ্য থাকে। কিন্তু উক্ত অর্থের পরিমাণ একেবারেই হাস্যকর — প্রতি বছরের কাজ পিছন্ন পনেরো দিনের মজদুরি। পরন্তু তুরস্ক ওই ভাতা একমাত্র তখনই দেওয়া হয় যদি ছাঁটাইয়ের মূহুর্তে কর্মী অন্তত তিন বছর কাজ করে থাকে।

সমস্ত পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশে সামাজিক বীমাব্যবস্থার পরিপূরক হিসেবে সামাজিক সাহায্যের যে ব্যবস্থা আছে তার বিশেষ লক্ষণগুলি এই রকম: ক) সাহায্য একমাত্র সেই শ্রমজীবীদেরই জন্য নির্ধারিত, যাদের আয়ের পরিমাণ কোনো নির্দিষ্ট মানের নিম্নে; খ) ভাতা দেওয়া হয় আর্থিক অবস্থা যাচাই করে দেখার পর; গ) এই সহায়তার তহবিল গড়ে ওঠে সাধারণের

কর থেকে; ঘ) এই ব্যবস্থা পরিচালনার ভার সচরাচর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত থাকে।

সামাজিক সাহায্যের দুটো দিক আছে: যে-সমস্ত ব্যক্তি বীমাব্যবস্থায় ভাতা পাওয়ার অধিকারী নয় অথবা যাদের ভাতার পরিমাণ সরকারী 'দারিদ্র্য সীমার' উদ্দেশ্যে জীবনযাপনের পক্ষে যথেষ্ট নয় তাদের জন্য অতিরিক্ত আয়ের সংস্থান এবং অভাব-অনটনগ্রস্ত যে সব পরিবারে শিশুসন্তান আছে তাদের সাহায্য করা। এই শেষোক্ত কর্মসূচি অনুযায়ী যে ব্যক্তি ভাতার অধিকার পায় সে একই সঙ্গে আরও দুটি কর্মসূচি অনুযায়ী সাহায্য লাভেরও অধিকারী হয়। সেগুলি হল চিকিৎসা ব্যবস্থা, বিনামূল্যে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের কুপন লাভ এবং 'সাধারণ সাহায্য' — অর্থাৎ যে-সমস্ত কর্মী গরিব, যারা অনেক কাল ধরে বেকার আছে ইত্যাদির জন্য আর্থিক সাহায্য।

পশ্চিমের দেশগুলিতে সামাজিক সাহায্যে সরকারী বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দরিদ্রদের জন্য খাদ্যের কুপন এবং দরিদ্র পরিবারের শিশুসন্তানদের সাহায্য বাবদ ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৮২ সাল থেকে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭৯ সালে ৬০ লক্ষ পরিবার অথবা ২ কোটি ২০ লক্ষ লোক উক্ত সাহায্যের আওতায় পড়ে; তাদের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ ১৭ বছরের নিম্নবয়সী শিশু, ৮ শতাংশ বৃদ্ধ ব্যক্তি আর বাকিরা 'দারিদ্র্য সীমার' নীচে জীবনযাপনকারী ও পঙ্গু, লোকজন। কিন্তু ১৯৮২ সাল থেকে দেখা যাচ্ছে ১০

লক্ষ মানুষ এই ভাতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই বাবদ সরকারের ১৯০ কোটি ডলার সাশ্রয় হয়েছে।

সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে দেখা যাচ্ছে সামাজিক নিরাপত্তার পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থাটি আগাগোড়া শ্রমজীবীদের নিজেদের অর্থানুকূল্যে গড়ে ওঠা।

পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের মজুরি ও সামাজিক অর্থানুকূল্য নিরন্তর এমন পরিমাণে সঙ্কোচনের চেষ্টা করে যাতে জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আর কিছু মিটানো তাদের পক্ষে সম্ভব না হয়। বলাই বাহুল্য এর ফলে পুঁজিপতিদের বেশি মুনাফাপ্রাপ্তি ঘটে।

শ্রমিক শ্রেণী এহেন পরিস্থিতিকে আপসে মেনে নিতে পারে না, তারা মজুরি বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সংগ্রামে নামে।

বুর্জোয়ারা শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামে বুর্জোয়া সমাজের অতিসৌধের সমস্ত উপাদান অর্থাৎ রাষ্ট্রযন্ত্র, আইন, গির্জা, পত্রপত্রিকা, রেডিও ইত্যাদি কাজে লাগায়। তাছাড়া পুঁজিপতিরা নিজেরাই নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের আকারে শ্রমিকদের বিরোধিতা করে।

পুঁজিপতিদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে শ্রমিক শ্রেণী ট্রেড ইউনিয়নে সম্মিলিত হয়। এই ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধনের সংগ্রামে তাদের সংগঠিত করে তোলে। মজুরি ও সামাজিক অর্থানুকূল্যের মাত্রা কতটা হবে তা প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যকার তিক্ত শ্রেণী

সংগ্রামের ফলেই স্থির হয়। ধর্মঘটী শ্রমিক যেখানে যথেষ্ট দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দিতে পারে সেখানে পুঁজিপতিরা অনেক সময় শ্রমিকদের শর্ত মেনে নিতে, তাদের মজদুরি উন্নয়নের এবং সামাজিক নিরাপত্তার উৎকর্ষসাধনে বাধ্য হয়। নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম বর্তমানে বিশেষ ব্যাপক আকার ধারণ করছে।

সংগ্রামের ফলে শ্রমিক শ্রেণী সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কিছু উন্নতি ঘটাতে সমর্থ হয়েছে। বেশ কিছু সংখ্যক দেশে সামাজিক নিরাপত্তার উপর নানা সংবিধি গৃহীত হয়েছে, তৎসংক্রান্ত অন্যান্য আইনকানুন প্রণীত হয়েছে। উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহে ভাড়াটে কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের পক্ষে সামাজিক বীমাব্যবস্থা বাধ্যতামূলক, জনসাধারণের একটা অতি ব্যাপক অংশ তার আওতার পড়ে।

প্রলেতারিয়েতের অর্থনৈতিক সংগ্রামের তাৎপর্য বিরাট। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক সংগ্রামের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েও মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ এই শিক্ষাই দেয় যে উক্ত সংগ্রাম নিজে শোষণের কবল থেকে শ্রমিকদের মুক্ত করতে পারে না। একমাত্র বিপ্লবী, রাজনৈতিক সংগ্রামের পথে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন-প্রণালীকে ধ্বংস করে শ্রমিক শ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নির্যাতনের পরিস্থিতির উচ্ছেদসাধন করা যায়।

৩। পুঁজিতান্ত্রিক পন্থার শ্রমসংগঠন

মজদুরি ব্যবস্থা শ্রমিকদের উপর ক্রমবর্ধমান শোষণের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে অক্ষম। পুঁজিপতিকে এমন সমস্যারও সম্মুখীন হতে হয় যখন দেখা গেছে উচ্চহারে মজদুরি দেওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকের কাছ থেকে সন্তোষজনক উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে না, তাঁর মাল খারাপ হচ্ছে, শ্রমিক কাজে ফাঁকি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই কারণে একমাত্র মজদুরির সাহায্যে উৎসাহবর্ধনের সংকীর্ণ গন্ডীকে শ্রমসংগঠনের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে অতিক্রম করতে সে সচেষ্ট। এর জন্য সে সর্বাগ্রে চেষ্টা করে বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে সৃজনক্ষমতাহীন ভারী শ্রমের উচ্ছেদ ঘটাতে। সামগ্রিকভাবে বাজারের ওঠাপড়ার উপর নির্ভরশীল এবং ঘন ঘন সংকট ও মন্দা-প্রবণ বিশৃঙ্খল অর্থনীতির ক্ষেত্রে কোনো কোনো উদ্যোগে যথেষ্ট নিখুঁতভাবে শ্রমসংগঠন — পুঁজিতন্ত্রের এক নমুনাসই অবস্থা।

পুঁজিতান্ত্রিক উদ্যোগগুলিতে শ্রমসংগঠন শ্রম-প্রক্রিয়াকালে উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে কর্মীদের সম্মিলন সুনিশ্চিত করে তোলে। শ্রমসংগঠনের মধ্যে যা যা পড়ে সেগুলি হল কর্মীদের সঠিক বিন্যাস এবং তাদের প্রত্যেককে নির্দিষ্ট পরিমাণে কাজ বরাদ্দ করে দেওয়া; উৎপাদনের পৃথক পৃথক অংশের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের মধ্যে সংযোগের যথোপযোগী রূপ নির্বাচন; কাজের জায়গা এবং সেখানকার সেবাব্যবস্থা সংগঠন; শ্রমের উপযুক্ত প্রণালী ও প্রকৌশলের প্রতিষ্ঠা; শ্রমের

উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি; উৎপাদনের মাত্রা নির্ধারণ;
শ্রমের উৎসাহবর্ধন ও শৃঙ্খলা সৃষ্টি।

পুঁজিবাদী শোষণের বিবিধ রূপের ক্রমবিকাশে
শ্রমসংগঠনের এক বিশেষ স্থান আছে। বিংশ শতাব্দীর
পুঁজিতান্ত্রিক শ্রমসংগঠনে দুটি পর্যায় স্পষ্ট লক্ষ
করা যায়। প্রথমটি সংশ্লিষ্ট টেইলর পন্থার সঙ্গে —
উৎপাদন ব্যবস্থাপনার এই বহুলপ্রচলিত ধারাটি প্রথম
প্রবর্তন করেন মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার ফ্রেডেরিক উইলিয়াম
টেইলর। দ্বিতীয় ধারাটির বৈশিষ্ট্য হল শ্রমসংগঠনের
গোষ্ঠীরূপ।

টেইলর পন্থার ভিত্তিরূপে আছে এই ধারণা যে
উৎপাদন ক্ষেত্রে নিযুক্ত মানুষ হল প্রকৃতিগতভাবে
অলস, সৃজনকর্মে ও নিজেকে সংগঠনে অক্ষম, অন্যের
তত্ত্বাবধানে, বরখাস্ত হওয়ার অথবা জরিমানা হওয়ার
ভয়ে বাধ্য হয়ে সে কাজ করে। মানুষ প্রযুক্তিবিদ্যার
দ্বারা ‘শিল্পব্যবস্থায় সংযোজিত একটি মৃদু
উপকরণবিশেষ’। একজন কর্মী যে যন্ত্রের অধীন,
শিল্পবিপ্লবের ফলে উদ্ভূত এই প্রক্রিয়া টেইলর পন্থার
মূলকথা।

স্বল্প শিক্ষিত, অল্পে তুষ্ট — পুঁজিতন্ত্র বিকাশের
প্রথম স্তরে এই ধরনের মজদুরি শ্রমিকে পুঁজিপতিদের
দাব্য পূরণে যেত। টেইলর পন্থা অনুযায়ী একজন
শ্রমিককে জড়দ্রব্যে দিনে কয়েক হাজার বৈচিত্র্যহীন
অপারেশন চালাতে হবে। শ্রমিকের কাছে কোনো
সৃজনশীলতা ও পেশাগত চিন্তাভাবনা দাবি করা হচ্ছে
না।

টেইলর পন্থা প্রবর্তনার সময়ে পৃথক পৃথক উৎপাদন পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নির্বাচিত দক্ষ শ্রমিকদের কতটা কর্মকাল ব্যয় হয় সেকেন্ডের ভগ্নাংশে তার চুলচেরা বিচার হয়ে থাকে। এর ভিত্তিতে কাজের যে মাত্রা নির্ধারিত হল তা খুবই উঁচু। যারা নির্ধারিত মাত্রা পূর্ণ করেছে এবং যারা তা পূর্ণ করতে পারছে না তাদের দুই দলের জন্য দুই রকমের মজুরি স্থির করা হল। দ্বিতীয় দলের মজুরি প্রথম দলের তুলনায় অনেক কম হল। এর ফলে মজুরির তহবিলে বিশেষ কোনো পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেল এবং পরিণামে শোষণ চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাল।

টেইলর পন্থা জীবনীশক্তিপূর্ণ। এই পন্থা বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবেরও সহচর বটে। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাধীন উৎপাদনের পরিস্থিতিতে পূর্জিতম্ভ শ্রমিককে যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তিবিজ্ঞান, শ্রমের বিধিব্যবস্থা, হিসাব ও মজুরির অধীনস্থ করে তাকে যন্ত্রের লেজদুড়ে পরিণত করে।

সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে টেইলর পন্থার অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতাও ধরা পড়তে লাগল। সংকীর্ণ বিশেষীকরণ এবং শ্রম পরিমাণ কঠিন নির্ধারণের ফলে একজন শ্রমিকের শ্রমের প্রতি সৃজনী মনোভাব ও উদ্যোগের বিকাশ, যোগ্যতাবৃদ্ধি ও পেশাগত জ্ঞানের পরিধিবিস্তার ব্যাহত হত। নতুন যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ বৃদ্ধি পেতে দেখা গেল টেইলর পন্থা আর শ্রমজনিত

আগমের বৃদ্ধি ও বরবাদী মালের পরিমাণ হ্রাস
 সন্নিহিত করে তুলতে পারছে না। টেইলর পন্থার
 মূলে যে কনভেয়র ব্যবস্থা আছে তা শ্রমের অপেক্ষাকৃত
 পরকীকরণের প্রতীক হয়ে দেখা দিল। টেইলরের
 ব্যবস্থা, তার নিখুঁত সময় পরিমাপ ও শ্রমের মাত্রা
 নির্ধারণ বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের যুগে আর যথেষ্ট
 মনে হল না। নানা ধরনের কাজের বিশ্লেষণমূলক
 মূল্যায়ন, কর্ম-দিবস ও শিফ্টের দৈর্ঘ্য, যন্ত্র চালানোর
 মোট সময়, কাজের জায়গায় কোনো লোকের সংলগ্ন
 থাকার মাত্রা — শ্রমসংগঠনের অন্যান্য এই রকম বহু
 উপকরণ তার পরিপূরক হয়ে দেখা দিল। এই কারণে
 'মানবিক সম্পর্কের' ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হতে
 লাগল। উক্ত ধারণায় উৎপাদনে নিযুক্ত মানুষ একজন
 সামাজিক জীব রূপে বিবেচ্য।

টেইলর পন্থাকে অতিক্রমণের প্রয়াস নানাবিধ রূপ
 পরিগ্রহ করে: ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জায়গা বদলের ভিত্তিতে
 কাজ করানো এবং শ্রমের অন্তর্বস্তুর প্রসারণ থেকে
 শূন্য করে ব্যক্তিগত ও দলগত শ্রমের সমৃদ্ধি সাধন ও
 স্বয়ংশাসিত কর্মিদল গঠন তার মধ্যে পড়ে।
 শ্রমসংগঠনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সূক্ষ্মপ্রসারী পরিবর্তন
 ঘটায় কাজে শ্রমিকের ব্যক্তিগত আগ্রহের কথা বিবেচনা
 করে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যের
 ভিত্তিতে যৌথ বা দলগত শ্রমসংগঠনের প্রচলন।
 উৎপাদনের পুরানো শাখাগর্দিলিতে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের
 পুনর্বিবিন্যাস এবং প্রযুক্তিগতভাবে অগ্রণী শাখাসমূহ
 নবীকরণের ভিত্তিতে এই ব্যবস্থার জন্ম।

শ্রমসংগঠনের আধুনিক দলগত রূপের (বহুতপক্ষে বহুকাল আগেই যার উদ্ভব) প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শ্রমিক দলের অনেক বেশি পরিমাণে আত্মনির্ভরতা। এই ব্যবস্থার অর্থ শ্রমিক আর প্রযুক্তিবিদ্যার মধ্যে সম্পর্কের এক নতুন রূপের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক শ্রমসম্পর্কের পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের ফলপ্রসূতা উন্নয়নের উপায়ও বটে। শ্রমিক দলের উন্নত রূপের মধ্যে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত এবং সাংগঠনিক সম্পূর্ণতা নিহিত থাকে। সাধারণভাবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনো একটা কাজ করার জন্য সংঘবদ্ধ এই দল সম্পাদিত কাজের ফলাফলের জন্য দায়ী থাকে। এই দল কর্মসংগঠন এবং উৎসাহবর্ধন সংক্রান্ত কোনো কোনো প্রশ্ন সমাধানের ব্যাপারেও স্বয়ংসম্পূর্ণ। এ ধরনের দল ফোরম্যান, সুপারভাইজার ও গুণাগুণ যাচাইকারীর নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই কাজ করতে সক্ষম।

মোটরগাড়ি নির্মাণশিল্পে অন্যতম নেতৃস্থানীয় 'ভোল্‌ভো' মোটরগাড়ি নির্মাণ সংস্থায় দলবদ্ধ শ্রমসংগঠনের অভিজ্ঞতার কথাই ধরা যাক। উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত বহু কলকারখানায় উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি কর্মী কাজের নির্দিষ্ট একেকটি অংশের দায়িত্বে থাকে, উক্ত পরিধির মধ্যে সে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নিজের কার্য সমাধানের সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব তারই উপর বর্তায়। শ্রম-প্রক্রিয়ার মধ্যে যদি বিভিন্ন ধরনের বেশ কয়েকটি ক্রিয়া থাকে তাহলে একঘেয়েমি ও বৈচিত্র্যহীনতা দূর করার জন্য সেগুলি একের পর এক পর্যায়ক্রমে করা

যায়। সে তার নিজের বিচারবিবেচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। উক্ত ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকেরা ৫ থেকে ৩০ জনের একেকটি কর্মিদল গঠন করে। ওই সীমানার মধ্যে উদ্ভবিতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই পরিচালন সংক্রান্ত অধিকাংশ সমস্যা সমাধিত হয়।

দলবদ্ধ শ্রমসংগঠন ব্যবস্থা উৎপাদনের ফলপ্রসূতার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। শতকরা ১৮টি ক্ষেত্রে শ্রমের উৎপাদনশীলতার উৎকর্ষ ও উৎপন্নদ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়। শতকরা ৪০টি ক্ষেত্রে কাজের ব্যাপারে শ্রমিকদের অধিকতর সন্তুষ্টি দেখা যায়, নৈতিক পরিবেশের উন্নতি ঘটে, এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার শতকরা ৩৬টি ক্ষেত্রে উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পায়, শতকরা ২০টি ক্ষেত্রে উৎপন্নদ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়, ২৩টি ক্ষেত্রে অনুপস্থিতির হার হ্রাস পায় এবং ১৭টি ক্ষেত্রে শ্রমশক্তির অস্থায়িতা কমে আসে।

সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, যেখানে দলবদ্ধ শ্রম সংগঠিত হয় সেখানে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় (যদিও বহু ক্ষেত্রে মর্চনিয়ে নিতে যত দিন লাগে সেই পর্বে সাময়িকভাবে নিম্নগামী হতে দেখা গেছে), উৎপন্নদ্রব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়, বর্জ্য ও বরবাদী মালের পরিমাণ হ্রাস পায় (কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৩০ থেকে ৮০ শতাংশ)।

যৌথ শৃঙ্খলা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটার ফলে শ্রম-সময় কম নষ্ট হয়। একথা সত্য যে শ্রমের পুনর্গঠনের

উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যবস্থাটির ফলে অনেক সময় সাময়িকভাবে কর্মরত শ্রমিক সমেত সমস্ত শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস পায়।

শ্রমসংগঠনে উৎকর্ষের দলবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের নিয়ন্ত্রণের একটি রূপ হল জাপানী কোম্পানিগুলির উদ্যোগসমূহের প্রবর্তিত 'উৎকর্ষ নিয়ন্ত্রণ গোষ্ঠী'। উক্ত ব্যবস্থা কর্মীদের পেশাগত ও সৃজনশীল উদ্যোগ বৃদ্ধির সহায়ক।

দলবদ্ধ শ্রমব্যবস্থা প্রবর্তনের অন্যতম পরিণতি স্বরূপ দেখা যায় কিছু শ্রমিক বাড়তি হয়ে পড়েছে। যে-সমস্ত কোম্পানির অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানাদি দলবদ্ধ শ্রম-ব্যবস্থার আওতায় আসে সেখানে ক্ষেত্রবিশেষে উৎপাদনে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ১১ থেকে ৪০ শতাংশ হ্রাস পায়, আর উৎপাদনব্যয়ের উৎকর্ষ ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী ২৮ থেকে ৫০ এমন কি ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাঁটাই হয়। ব্যাপক হারে বেকারি বাড়তে থাকায় শ্রমিক শ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই ব্যবস্থার ঘোর বিরোধিতা করে — তারা অনুভব করে যে শ্রমসংগঠনের উৎকর্ষসাধন শারীরিক ও মানসিক চাপবৃদ্ধির নামান্তর।

সত্তরের দশকে বর্জোয়া ব্যবস্থাপনাবিজ্ঞানে এক নতুন ধারার সক্রিয় বিকাশের সূচনা লক্ষ করা যায়। এই ধারার মধ্যে এক দিকে উন্নয়নশীল উৎপাদিকা শক্তি এবং অন্য দিকে পুঁজিতন্ত্রের সেকেলে উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘর্ষ প্রকট হয়ে ওঠে। এই অর্থে, জাপানী সংস্থাগুলি বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার যে

রূপ ও প্রণালী প্রয়োগ করে তার দৃষ্টান্ত
আগ্রহোদ্দীপক।

উৎপাদন ব্যবস্থাপনার জাপানী রীতির পরম
গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে 'মানবিক সম্ভাবনার'
সদুযোগগ্রহণ এবং পূর্নজিপিতিদের চাকুরিতে বহাল
ভাড়াটে পরিচালকবর্গ কর্তৃক সামাজিক কৌশল
সম্পাদন বিশেষ তাৎপর্যবহ। এই ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার
সবচেয়ে বহুলপ্রচলিত রূপগুলি হল যাবজ্জীবন ভাড়ার
ব্যবস্থা, কাজের মেয়াদের ভিত্তিতে ('সিনিয়রিটির'
নীতিতে) পদোন্নতি ও বেতনবৃদ্ধি, কর্মীদের যোগ্যতা-
বৃদ্ধির নিরন্তর প্রক্রিয়া এবং নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও
বৈষয়িক প্রভাব সৃষ্টির ব্যবস্থা, যার ফলে সংস্থার কাজের
সামগ্রিক ফলাফলের উপর কর্মীদের অবস্থা একান্তভাবে
নির্ভর করে।

যাবজ্জীবন ভাড়ার যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে
জাপানের বড় বড় কোম্পানি ও রাষ্ট্রীয়
প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিযুক্ত শ্রমশক্তির মোটামুটি ৩৫
শতাংশ তার আওতায় পড়ে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ
যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীদের একমাত্র সীমিত স্তরেই তা
প্রযোজ্য। দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সদুযোগ দিয়ে এই
ব্যবস্থা স্থায়ী কর্মীদের কাজের গ্যারান্টি, আয় বৃদ্ধি
ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক নিরাপত্তার দ্বারা তাদের বিশেষ
সদুযোগসুবিধার অধিকারী করে তোলে। অন্য দিকে
সাময়িকভাবে এক দিনের অথবা এক বছরের চুক্তিতে
(এক বছরের বেশি কখনই নয়) কোম্পানি যে কর্মীদের

ভাড়া নিয়েছে তারা কোনো রকম সদুযোগসুবিধা পায় না, যে কোনো সময় তারা ছাঁটাই হতে পারে।

তরুণ ম্যানেজারদের তালিম ও চাকুরীক্ষেত্রে পদোন্নতির ব্যাপারে অন্যান্য প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে চাকরীর 'জায়গা বদলের' প্রণালীও বহুলপ্রচলিত। এই ব্যবস্থায় কর্মীরা একই প্রতিষ্ঠানের চৌহদ্দির মধ্যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরিত হয়, আরও বড় বড় কোম্পানির ক্ষেত্রে কোম্পানির অন্যান্য শাখায় ও বিভিন্ন উদ্যোগেও বদলি হতে পারে। চাকরীতে পদোন্নতি হলে কর্মীরা যাতে যে কোনো ধরনের কাজ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বহু বিচিত্র ধরনের কার্যকলাপের সঙ্গে তাদের পরিচিত হওয়ার সদুযোগদান এই বদলির মূল লক্ষ্য।

জাপানী সংস্থাগুলিতে আরও একটি বহুলপ্রচলিত ব্যবস্থা হল 'যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ'। কোনো একটি নির্দিষ্ট সমস্যার সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ও কর্মিদলগুলিকে সেই সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য বিভিন্ন উপায় সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সম্ভাব্য সমাধানগুলি বিশেষ বিশেষ দলিলে লিখে উপস্থিত করা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকল ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সমাধান সম্পর্কে নিজেদের সম্মতি-অসম্মতি জানাতে হয়, নিজস্ব মন্তব্য, সংশোধনী, পরিপূরক ও স্পষ্ট ব্যাখ্যা লিখে জানাতে হয়। সেই দলিল পরিচালনদপ্তরের এক স্তর থেকে আরেক স্তরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত যে কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব তারই উপর বর্তায়।

ব্যবস্থাপনার এই রূপ শ্রেণীবিরোধ মূছে ফেলার, পুঁজিপতি ও মজদুর শ্রমিকদের মধ্যে 'আস্থা' গড়ে তোলার প্রয়াস বলে গণ্য করা যেতে পারে।

বস্তুত এতে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যৌথ দৃষ্টিভঙ্গির বিভ্রমমাত্র সৃষ্টি হয়। শিল্পপতিভিত্তিক সংস্থা, কোম্পানি এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান-গুলিতে পদুৎখানপদুৎখরূপে প্রস্তুত, কঠোর নিয়মানুবর্তী ব্যবস্থাপনার এই যে নির্মম সোপানিক গঠনকাঠামো প্রচলিত আছে সেখানে নিরঙ্কুশ ক্ষমতার উপর 'অংশগ্রহণের' নানা রূপ এবং যৌথ ক্রিয়ার কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি দ্বারা বর্ণলেপ মাত্র করা হয়েছে।

পারস্পরিক আস্থা ও যুথবদ্ধতার পরিবেশ পুঁজিতান্ত্রিক উদ্যোগের নীতিবিরোধী। মূনাফা অর্জনের মূল উপায় সেখানে কর্তৃত্ব ও অধীনতার সম্পর্ক। শ্রমিকেরা ক্রমেই বেশি পরিমাণে শ্রম-প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরে যায়।

নবপ্রবর্তনার শোষণধর্মী মর্মবস্তু ও উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে তার অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত দিকের মধ্যে বেশ কিছু প্রগতিশীল ধারা আছে। এমন কি পুঁজিতান্ত্রিক পরিস্থিতিতেও ব্যবস্থাপনার এই নতুন পদ্ধতি শ্রম-সময় ও যন্ত্রপাতির অনেকটা যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে ব্যবহার সম্ভব করে তোলে, শ্রমিকদের চাহিদার নতুন স্তরের উপযোগী পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

সে যাই হোক না কেন, কোনো বিশেষ ব্যবস্থাই — তা সে যাবজ্জীবন ভাড়া ব্যবস্থাই হোক না —

পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনীতিতে প্রচলিত নিৰ্মম নিয়মকানুনের ক্রিয়া শিথিল করতে পারে না, বেকারির আশংকা, কর্মসংস্থানের তীব্র সমস্যা হ্রাস করতে পারে না।

৪। বেকার সমস্যা: কোটি কোটি মানুষের ট্রাজেডি

পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার বহু শহরের যে কোনো আধিবাসীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় ‘এম্প্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ কোথায়?’ তাহলে সম্ভবত সে নিভুলভাবে দেখিয়ে দেবে তার অবস্থানস্থল। এর যথেষ্ট সঙ্গত কারণও আছে। কর্মনিয়োগকেন্দ্র শহরের অন্যতম কর্মব্যস্ত স্থল। জনসমাগমের বিচারে গিজার্জার চেয়ে এই জায়গাটা কোনো অংশে পিছিয়ে নেই — শুধু তফাত হল এই যে ধর্মবিশ্বাসী লোক নয়, এখানে প্রত্যহ যারা আসে তারা কোনো না কোনো কাজের সন্ধান করছে। সামাজিক অবস্থানের বিচারে তাদের অনেকে সমাজের নীচের মহলের লোক। তারা সমাজের আবর্জনাস্তুপে নিক্ষিপ্ত, কাজ যদি তারা না পায় তাহলে তাদের দারিদ্র্য ও নৈতিক অধঃপতনের মুখে পড়তে হবে, তারা তাদের যোগ্যতা ও উৎপাদনকর্মের অভিজ্ঞতা হারাবে।

বেকারি শ্রমজীবী জনসাধারণের উপর ধ্বংসাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এ হল মানুষের সমস্ত রকম মোহভঙ্গের এক পর্যায়। বেকারি মানুষের পারিবারিক জীবনে ভাঙন ধরায়, ব্যাপক হারে আইনভঙ্গ, রোগ ও

মৃত্যুর হার বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মার্কিন চিকিৎসাবিদদের তথ্য অনুযায়ী, এক শতাংশ বেকারি বৃদ্ধির ফলে জনসংখ্যার মধ্যে মৃত্যুর হার বাড়ে ২ শতাংশ, মানসিক ব্যাধির হার ৩.৪ শতাংশ এবং আত্মহত্যার পরিমাণ ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

মানুষ খাটতে চায়, কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ তাদের কাজের সুযোগ দিতে পারে না। শ্রমজীবীদের একাংশ কেন কাজ খুঁজে পায় না? এর কারণ বিশ্লেষণ করে কার্ল মার্কস দেখিয়েছেন যে যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম, দালান-কোঠা ও শ্রমশক্তি ক্রয়ের পেছনে যে পুঁজি ব্যয় হয় শ্রমশক্তির চাহিদা তার সমস্তটা দ্বারা নির্ধারিত না হয়ে নির্ধারিত হয় শ্রমশক্তি ক্রয়ের পেছনে যেটুকু ব্যয় হয় একমাত্র সেই অংশটুকু দ্বারা।

বাহ্যত বেকারি শ্রমের পুঁজিতান্ত্রিক রূপের সঙ্গে জড়িত নয়। বুদ্ধিজীবি অর্থনীতিবিদরা শ্রমশক্তির অতিরেকের জন্যই জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে দায়ী করে থাকেন। বস্তুত কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির মাত্রা বেকারির কোনো কারণ নয়, তার কারণ হল শ্রমশক্তির জন্য পুঁজির মালিকদের চাহিদা। বেকারির কারণ কোনো প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে যুক্ত নয়, পুঁজিতন্ত্রে শ্রমের যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় সেগুলির সঙ্গেই যুক্ত।

পুঁজিতন্ত্র বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিমাণ পুঁজি জমতে থাকে ক্রমেই তার একটা বড় অংশ কর্মসংস্থানের সংখ্যা বাড়ানোর পেছনে খরচ না হয়ে কাজের জায়গার প্রযুক্তিগত পুনর্বিবিন্যাস এবং নতুন সরঞ্জাম, নতুন নতুন

ধরনের কাঁচামাল, জ্বালানি ও উপাদান উৎপাদনের পেছনে খরচ হতে থাকে। তার অর্থ এই যে পুঁজিতন্ত্র বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতমেই পুঁজির একটা বড় অংশ শ্রমের উপকরণ নবীকরণের কাজে লাগানো হচ্ছে, আর শ্রমশক্তির কর্মসংস্থানের চাহিদা পূরণের পেছনে লাগানো হচ্ছে উত্তরোত্তর কম অংশ। বেকারির কারণ প্রযুক্তিবিজ্ঞানের প্রগতি ঠিক নয়, উক্ত প্রগতিকে পুঁজিপতিরা যেভাবে কাজে লাগায় সেটাই তার কারণ।

পুঁজিপতিরা বেকারির সদুযোগ নিয়ে শ্রমজীবী জনসাধারণের উপর তীব্র শোষণ চালায়। কর্মচ্যুতির ভয়ে মজুরি শ্রমিকরা আরও প্রথরভাবে কাজ করতে বাধ্য হয়। বুর্জোয়া সমাজে শ্রমিকের কাজ করার অধিকার গ্যারান্টিযুক্ত নয় বলে যে কোনো সময় তারা কাজের জায়গা থেকে বিতাড়িত হতে পারে।

বেকারির প্রধান তিনটি রূপ আছে: নৈমিত্তিক, প্রচ্ছন্ন ও অচল প্রকৃতির।

নৈমিত্তিক বেকারি তাকেই বলে যখন কোনো শ্রমিক অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের জন্য কাজ হারায়। কাজ হারানোর কারণ অনেক রকম হতে পারে, তবে মূল কারণ হল বিভিন্ন কলকারখানায় ও শিল্পশাখায় সময়ের বিভিন্ন পর্বে পুঁজি সংগঠন প্রক্রিয়ার অসম্মানিততা। যে-সমস্ত শ্রমিক নতুন ধরনের যন্ত্রপাতি প্রচলন অথবা মন্দার পর্বে উৎপাদন সংকোচনের ফলে কাজ হারায় তারা এই দলে পড়ে। উৎপাদনের পরিমাণ সংকোচনের ফলে পূরনো শিল্পশাখাগুলিতে

কর্মস্থানের সংখ্যার সংকোচন ঘটে, সেই সঙ্গে নবপ্রবর্তিত কলকারখানাগুলিতে শ্রমশক্তির চাহিদা দেখা যায়। এতে দেখা যায় শ্রমিকদের একটি অংশ শ্রমসম্পর্কের ক্ষেত্র থেকে বহিস্কৃত হচ্ছে, কিন্তু অপর একটি অংশ তাতে আকৃষ্ট হচ্ছে।

নারী ও শিশুদের শ্রম কাজে লাগানোও নৈমিত্তিক বেকারির বৃদ্ধির একটি কারণ। এর ফলে পুরুষদের কর্মসংস্থান হ্রাস পায়। শিশু আর কিশোররা সাবালক হয়ে গেলেই কাজ থেকে বরখাস্ত হয়, তখন তাদের আবার নতুন করে কাজ খুঁজতে হয়।

বেকারির আরেক রূপ প্রচ্ছন্ন বেকারি। মূলত পল্লীগrame এর অস্তিত্ব। প্রধানত কৃষকসম্প্রদায় ও হস্তশিল্পীরা এর আওতায় পড়ে। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপে পড়ে তাদের একটা অংশ দেউলিয়া হয়ে পড়ে। আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষুদ্র ব্যক্তি-মালিক বলে গণ্য হলেও আসলে কিন্তু তারা সর্বহারায় পরিণত হওয়ার মুখে। এদিকে শহরে অমনিতেই বেকারের সংখ্যা প্রচুর হওয়ায় সেখানকার কলকারখানায়ও তাদের ঠাই হয় না। এই কারণে তাদের গ্রামাঞ্জে থেকে যেতে হয়, সেখানেই অনাহারে অর্ধাশনে তারা দিনপাত করে। তা সত্ত্বেও যেহেতু তারা ক্ষুদ্র ব্যক্তি-মালিক রূপে চিহ্নিত সেই হেতু বেকারের তালিকায় তাদের ধরা হয় না। পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিমাণ শ্রমিকের চাহিদা একবার দেখা দিলেই হল, অমনি দলে দলে গ্রামবাসী প্রচ্ছন্ন অতিপ্রজতার চাপে শহরে ছুটে আসতে থাকে।

প্রচ্ছন্ন অতিপ্রজ্ঞতা শহরেও লক্ষ করা যায়। শহরের যে-সমস্ত ক্ষুদ্র হস্তশিল্পী ও ব্যবসায়ী পুঁজিতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে তারা এই পর্যায়ে পড়ে।

বেকারির তৃতীয় রূপ অচল প্রকৃতির বেকারী। অসংখ্য ধরনের এমন অনেক কর্মী আছে যাদের কাজ একেবারেই অনিয়মিত, বসে করা কাজ দৈবাৎ কোনো কাজ পেলে অনেক সময়ই বাড়িতে যা উপার্জন হয় তাই দিয়ে তাদের চলে। তারা যখন কাজ পায় তখন তাদের কর্ম-দিবস অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয় আর উপার্জন হয় নগণ্য।

উন্নয়নশীল দেশগুলির বেকার সমস্যার কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। শ্রম-বিভাজনের ঔপনিবেশিক রূপ, আধা সামন্ততান্ত্রিক পশ্চাৎপদ গঠনকাঠামো ও ধারার অস্তিত্ব ও জনপরিসংখ্যান সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য সেগুলির প্রধান কারণ। এক সময় রাশিয়া সম্পর্কে লেনিন যে মন্তব্য করেছিলেন রাশিয়ার দুর্ভোগ পুঁজিতন্ত্র মোটেই ততটা নয়, যতটা তার অপ্রতুল বিকাশ, এই দেশগুলির ক্ষেত্রে তা যেন ঠিক খেটে যায়।

বুর্জোয়া সমাজবিজ্ঞানীরা দেখানোর চেষ্টা করেন যে উন্নয়নশীল দেশসমূহে কর্মসংস্থানের বিশেষ পরিস্থিতি শূন্য বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত প্রগতির অসমমাত্রিক বিকাশের সঙ্গে জড়িত। কোনো কোনো বুর্জোয়া পণ্ডিত, যাঁরা প্রতিষ্ঠানবাদের প্রবক্তা, অর্থাৎ যাঁরা এই মত পোষণ করেন যে প্রযুক্তিগত প্রগতি

বেকার সমস্যা ও সংকটের অবসান ঘটাতে সক্ষম, তাঁরা এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশসমূহের কর্মসংস্থান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পুঁজিতান্ত্রিক শিল্পায়নের মধ্যে বেকার সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পেয়েছেন। অথচ একথা কারোই অবিদিত নেই যে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশ ও কৃষিক্ষেত্রে অতিজনতার মাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থানের সমস্যাও তীব্র আকার ধারণ করে।

শ্রমশক্তির প্রাচুর্য ও সুলভতার আকর্ষণে পশ্চিমী কর্পোরেশনগুলি তাদের বহু শ্রমসাধ্য উৎপাদন ব্যবস্থাকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্থানান্তরিত করে থাকে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে এই ব্যবস্থাও উন্নয়নশীল দেশগুলির বেকারি বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নি। এই 'আকর্ষণ' এখনও আছে, তবে তার মাত্রা কমে আসতে শুরু করেছে, কারণ সস্তার শ্রমশক্তির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আজকাল হয়ে দাঁড়িয়েছে রোবট আর কম্পিউটার। মারাত্মক এই প্রতিদ্বন্দ্বী — মানুষকে শুধু ভারী ও অসাধ্য কাজ থেকেই অব্যাহতি দেয় না, কাজ থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেয়।

উন্নয়নশীল দেশগুলির বৈশিষ্ট্য হল অতি উচ্চ মাত্রায় ও অনিয়ন্ত্রিত পরিমাণে নগরীকরণ। সামন্ততান্ত্রিক জের এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহে জমির নিদারুণ অভাবের ফলে এককালে যারা কৃষক ছিল তারা প্রাণের দায়ে শহরে এসে ভিড় করে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলির পণ্যদ্রব্যের নিম্ন বিক্রয়যোগ্যতা

এবং সেই সঙ্গে জাতি-অতিগ কর্পোরেশনগুলি কর্তৃক সেখান থেকে আর্থিক সঙ্গতি নিঙড়ে নেওয়ার ফলে পুঁজি বিনিয়োগের অভাবে শহরগুলিতে কাজের জায়গায় ঘাটতি হয়ে পড়ে — সেখানে বেকারির সংখ্যা অনেক সময় প্রমশক্তির ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছায়।

কোনো অর্থনীতিবিদের হিসাবমতে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নগরীকরণের ফলে ২০০০ সাল নাগাদ আরও একশ কোটি মানুষ কর্মচ্যুত হয়ে শহরের দিকে ধাবিত হবে। জনস্রোতের এই নগরমুখী প্রবাহ নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সংখ্যাকে বহুল পরিমাণে ছাড়িয়ে যাবে বিশেষত আগামী কয়েক দশকে বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের নতুন জোয়ারের (এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা পরে আছে) যে সম্ভাবনা আছে তার ফলে তো বটেই। তখন কলকারখানা সস্তার প্রমশক্তির উপর ভরসা না করে বেশি পরিমাণে ভরসা করবে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের উপর। বস্তুত উন্নয়নশীল দেশসমূহের এই নতুন একশ কোটি শহরবাসীর মর্দুটিমেয় একটা অংশমাত্র কাজ খুঁজে পেতে পারবে।

বেকারি, কর্মহীনতা, অন্যান্য সমাজব্যবস্থার ফলে শ্রমের সদ্ব্যোগ থেকে, নিজের এবং নিজের পরিবারের পেট চালানোর সদ্ব্যোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া — মানুষের জীবনে এর চেয়ে শোচনীয় আর কী হতে পারে? দীর্ঘ সময় ধরে কাজের সন্ধান, ব্যর্থ সন্ধান, জীবনধারণের মূল উপকরণ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকা,

হিন্মদুল হয়ে পড়া — এই হল পুঁজিবাদী দুনিয়ার কোটি কোটি মানুষের ভাগ্য।

এমন কি যা মানবজাতির আশীর্বাদস্বরূপ সেই বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব পর্যন্ত পুঁজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বেকার সমস্যা আরও বাড়িয়ে তোলে, আরও অসহনীয় করে তোলে শ্রমজীবী মানুষের জীবন।

৫। বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব; শ্রম
ও পুঁজির মধ্যে বিরোধের তীব্রতাবৃদ্ধি

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের সূত্রপাত ৬০-এর দশকে। যন্ত্রব্যবস্থার মধ্যে এক নতুন ধরনের উপাদান — সাইবারনেটিক্স পদ্ধতিতে পরিচালন ব্যবস্থার প্রচলন ঘটিয়ে, পারমাণবিক শক্তি সমেত নতুন নতুন ধরনের নানা শক্তির ব্যাপক প্রচলন সম্ভব করে তুলে এবং লেসার রশ্মি প্রয়োগের মতো সম্পূর্ণ নতুন ধরনের সমস্ত প্রযুক্তিবিদ্যার সৃষ্টি করে বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব শ্রমের অন্তর্ভুক্ত ও সংগঠনে স্বেচ্ছাপ্রসারী পরিবর্তন সাধন করেছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইলেকট্রনিক্স (যেমন মাইক্রোপ্রসেসর-কারী ও রোবট প্রযুক্তির প্রয়োগ) ও জীবপ্রযুক্তিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং কাঁচামাল ও বিস্ময়কর ধর্মসম্পন্ন উপাদানসমূহ উৎপাদনের (যেমন অধুনা প্রচলিত ধাতুর চেয়ে দশগুণ মজবুত রোল করা ধাতু) নতুন নতুন সম্ভাবনা আবিষ্কারের ফলে

শ্রমের সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পায়, বৃদ্ধিবৃন্তিগত, মনস্তাত্ত্বিক ও দৈহিক প্রয়াসের মিতব্যয়ের ব্যাপারে বিপুল প্রতিশ্রুতি বহন করে।

শ্রমের অন্তর্বস্থ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিপুল তাৎপর্য বহন করে তথ্য প্রক্রিয়ামূলক প্রযুক্তি, যার ফলে সাধারণ পাঠাগার ও মিউজিয়ম থেকে বলতে গেলে মহাদূতের মধ্যে তথ্য আহরণ (পাঠের বস্তু, ছবি অথবা নক্সার প্রতিরূপ), চলচ্চিত্র অথবা নাট্যাভিনয়ের ভিডিওরেকর্ড প্রাপ্তি, বিদেশী ভাষা, টাইপিং-এর দক্ষতা ও নানা ধরনের যন্ত্রপরিচালনার 'স্বয়ংক্রিয়' তালিম সহজসাধ্য করে তোলে। ফলপ্রসূ ও বহু গুণ বোশি উৎপাদনশীল শ্রম সংগঠন ও প্রযুক্তির এবং জটিলতম উৎপাদনের স্বয়ংক্রিয়করণের বৈজ্ঞানিক প্রণালীর বিকাশসাধন হতে চলেছে।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের পরিস্থিতিতে শ্রম-প্রক্রিয়া 'বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, উৎপাদন ও উপভোগ'-এর এক বিপুল ক্ষমতাসম্পন্ন সমাহার ব্যবস্থা-ভিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। উক্ত ব্যবস্থার মূলে আছে বিজ্ঞান, যার পেছনে ব্যয় নিদারুণভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শ্রমের সমস্ত রকম সম্ভাবনা বিকাশের ক্ষেত্রে, প্রধান উৎপাদিকা শক্তি হিশেবে মানদুশের বিকাশে শ্রমের ভূমিকার উন্নয়নে, শ্রমসংগঠনের সামাজিক রূপের উৎকর্ষসাধনে, শ্রমের বিশেষীকরণ ও যোথীকরণের বৃদ্ধিতে, শ্রমের সামাজিক উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধিতে বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব এক বিরাট অগ্রপদক্ষেপ গ্রহণ

করেছে। বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিকাশের গতি বৃদ্ধিতে, মানুষের ক্ষমতা বিকাশের ক্ষেত্রে শ্রমের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের পরিস্থিতিতে শ্রমের চরিত্রেও গভীর পরিবর্তন ঘটে।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব শ্রমের সামাজিক বিভাজনের ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী রূপান্তর সাধন করে। যন্ত্রপাতির অংশ উৎপাদন ও প্রযুক্তিবিদ্যায় বিশেষীকরণের ভূমিকা শ্রম-বিভাজনের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উক্ত ধরনের বিশেষীকরণের বহুল প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোটরগাড়ি নির্মাণশিল্পে। সেখানে বড় বড় মূল সংস্থাগুলিকে যন্ত্রপাতির অংশ তৈরির বিশেষীকৃত কলকারখানার বিস্তৃত ব্যবস্থার উপর নির্ভর করতে হয়। বৃহৎ একচেটিয়া কারবার আর তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারীদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে শেষোক্তদের উপর প্রথমোক্তদের প্রভুত্বভিত্তিক। একচেটিয়া কারবারিরা উৎপাদের দর স্থির করে সরবরাহকারীদের উপর তা চাপিয়ে দেয়, তারাই উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করে, তাদের উৎপাদন সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের সকল দিক নিয়ন্ত্রণ করে।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের কল্যাণে শুধুই যে কলকারখানা ও শিল্পশাখাগুলির মধ্যে উৎপাদনের বিশেষীকরণ সম্পন্ন হয় তা নয়। কোনো কোনো পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশও সামগ্রিকভাবে কোনো বিশেষ বিশেষ ধরনের পণ্য উৎপাদনে বিশেষজ্ঞতা লাভ করে

এবং সেগগুলির বিনিময় করে। এইভাবে গড়ে ওঠে ভূখণ্ডগত সামাজিক শ্রম-বিভাজন বিকাশের সর্বোচ্চ পর্যায় — আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাজন।

সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের পরিস্থিতিতে উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশসমূহ আর জাতি-অতিগ কপোরেশনগুলি আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাজনকে উন্নয়নশীল দেশসমূহের উপর শোষণের অস্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করে থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতি আধুনিকতম যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তিবিদ্যা ও জ্ঞানবিজ্ঞান আমদানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, সেগুলির প্রয়োগ সেখানে উত্তরোত্তর বিস্তৃত হতে থাকে; অথচ সেগুলির উদ্ভাবন ও উৎপাদন সবই সম্পন্ন হয়ে থাকে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে। পশ্চিমের নবতম প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ঘটিয়ে নবীন রাষ্ট্রগুলি পুঁজিতান্ত্রিক বিশ্ব শ্রম-বিভাজন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয় -- তবে তা সমাধিকারসম্পন্ন অংশীদাররূপে ততটা নয় যতটা প্রযুক্তিবিজ্ঞান ও অর্থনীতির লেজুড় হয়ে।

উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক বিকাশের সুযোগ বিস্তৃত করার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব ওই সমস্ত দেশ এবং উন্নত দেশগুলির মধ্যবর্তী ব্যবধানও বাড়িয়ে তোলে। অর্থনীতিগতভাবে পশ্চাৎপদ দেশগুলি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার নবতম সাফল্য আয়ত্তে এনে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এর জন্য যে বিশেষীকৃত শ্রমশক্তি এবং উৎপাদন সংক্রান্ত ও সামাজিক অবকাঠামোর

দরকার তার অভাব, আধুনিক পুঞ্জিতান্ত্রিক মাইক্রোইলেকট্রনিক, বয়ন ও সীবনশিল্প এবং মোটরগাড়ি নির্মাণশিল্পের সঙ্গে উৎপাদনের প্রথাসিদ্ধ অর্ধ-হস্তশিল্প ধরনের ব্যবস্থার সম্মিলনের ফলে উক্ত প্রয়াসে পদে পদে বাধা সৃষ্টি হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জাতি-অতিগ কর্পোরেশনগুলি প্রবল শ্রমসাধ্য বিপুল পরিমাণ সাধারণ ক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শিল্প-শাখাসমূহ বিকাশে উৎসাহ দান করে।

বিশ্ব পুঞ্জিতান্ত্রিক অর্থনীতিতে যে তেজী ও মন্দা দেখা যায় উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের শ্রম-বিভাজনের ক্ষেত্রে তা প্রকট হয়ে ওঠে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'তৃতীয় দুনিয়ার' অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল দেশ বলে যাদের গণ্য করা হয়, যে-সমস্ত দেশ উন্নত দেশের পর্যায়ে প্রায় এসে পড়েছিল সেই লাতিন আমেরিকান দেশগুলি সত্তরের দশকের শেষ থেকে শুরুর দশকের সূচনায় এক গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হয়। এ ধরনের অবস্থার অন্যতম কারণ হল উন্নত পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশগুলির কাছে তাদের ৪০ হাজার কোটি ডলারের ঋণ। ১৯৮০-১৯৮২ সালে শিল্পোন্নত দেশগুলিতে উৎপাদনের যে মন্দা দেখা দিয়েছিল তাতে পশ্চিমের দেশগুলিতে লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলির রপ্তানি হ্রাস পায়, পরিণামে এক গভীর অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়।

আন্তর্জাতিক পুঞ্জিতান্ত্রিক শ্রম-বিভাজন যে উন্নত

ও উন্নয়নশীল দেশগুলির স্বার্থের মধ্যে সঙ্গতি ঘটাতে পারে না এটা তারই এক জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

পুঁজিতন্ত্রে জীবনযাত্রা নির্বাহের উপায়রূপে শ্রম এবং সামাজিক চাহিদা মেটানোর উপায়রূপে শ্রমের মধ্যে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানের বিপুল সম্ভাবনা যে মানুষের স্বার্থে না লাগিয়ে তাকে পদানত করার কাজে লাগানো হচ্ছে এই ঘটনার মধ্যেই তা প্রকট হয়ে ওঠে। উৎপাদনের উপায়ের ব্যক্তিগত মালিকানা, একচেটিয়া পুঁজি এবং একচেটিয়া কারবারীদের অতিমাত্রায় মুনাকা লোটার চেঁচা উক্ত বিরোধ সমাধানের পথে দুলভ্য বাধা সৃষ্টি করেছে।

পুঁজিতন্ত্রে বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব মজুদির শ্রমের উপর শোষণের মূল প্রকৃতিকে তীব্র করে তোলে। পুঁজিতন্ত্র শ্রমকে দাসত্ববন্ধনে বাঁধার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগানোর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার অধিকারী। বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের সাফল্য মূলত শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং অবকাশ বৃদ্ধির উপায় হলে কী হবে তা মজুদির শ্রমিকদের উপর শোষণ বৃদ্ধির, মজুদির যথোচিত বৃদ্ধি না ঘটিয়ে শ্রমের উপর অবিরাম বেশি মাত্রায় চাপ সৃষ্টির এবং বেকারি বৃদ্ধির উপায়ে পরিণত হচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব ক্রমেই নতুন নতুন স্তরের মেহনতী মানুষকে তার শোষণের আওতায় টেনে আনে। এ ব্যাপারে মস্তিস্কের কাজ, বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং কার্যকলাপের ক্ষেত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভাড়াটে

কর্মীদের মধ্যে বর্তমানে উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তিবিদ ও অফিস কর্মচারীদের ভাগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। উচ্চ শিক্ষিত ও উপযুক্ত তালিমপ্রাপ্ত এই কর্মীরা যথাসময়ে তাৎক্ষণিক, সৃজনশীল ও মৌলিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। এই পর্যায়ে ভাড়াটে কর্মীরা উচ্চ পেশাগত যোগ্যতার অধিকারী, নতুন প্রযুক্তির সমস্ত রকম সূক্ষ্মতা সম্পর্কে তারা দক্ষুরমতো ওয়াকিবহাল। যে-সমস্ত কাজে বিশেষ যোগ্যতার দরকার হয় তারা সকলে অপেক্ষাকৃত লোভনীয় সেই সব পদে অধিষ্ঠিত। শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে উদ্ভূত-মূল্যের একটা বড় অংশ — পাঁচ-ষষ্ঠাংশ না হলেও চার-পঞ্চমাংশ তো বটেই — সৃষ্টি করে উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে আগত উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীরা। এই কারণেই উন্নত দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মীদের লোভ দেখিয়ে টেনে নিতে চেষ্টা করে।

শ্রমশক্তির অভ্যপ্রয়াণ উন্নয়নশীল দেশসমূহের বিশেষ ক্ষতির কারণ হয়। এর ফলে ওই সমস্ত দেশ থেকে উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন বহু কর্মীর নিষ্ক্রমণ ঘটে। অভ্যপ্রয়াণ ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কর্মক্ষম বয়সের (২৫ থেকে ৪৫ বছর) পেশাগত তালিমপ্রাপ্ত উচ্চ স্তরের কর্মীরা আছে। উন্নয়নশীল দেশগুলি সাহায্য হিশেবে পশ্চিম থেকে যে পরিমাণ অর্থ পায় ‘মস্তিষ্ক নির্গমনের’ ফলে প্রায় ততটাই হারায়। জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত সম্মেলনের সেক্রেটারিয়েটের

এক মূল্যায়ন অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন ও কানাডা — মাত্র এই তিন দেশে বিশেষজ্ঞ অভিপ্রাণের ফলে যে ক্ষতি হচ্ছে তার পরিমাণ বছরে প্রায় ৩৮০ কোটি ডলার। সত্তরের দশকের গোড়ায় মাথাপিছু হিসাবে মস্তিস্ক আমদানির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই মানববিদ্যার ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ থেকে বছরে নীট লাভ হয়েছে প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার ডলার, প্রকৃতিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সেই পরিমাণ ২ লক্ষ ৩৫ হাজার, একজন ইঞ্জিনিয়ারের ক্ষেত্রে ২ লক্ষ ৫০ হাজার এবং ডাক্তারের ক্ষেত্রে ৬ লক্ষ ৪৬ হাজার ডলার মতন দাঁড়াচ্ছে।

পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ার উন্নত দেশগুলিতে এমন বহু শিল্পশাখা আছে যা সম্পূর্ণভাবে বিদেশ থেকে আমদানি করা শ্রমশক্তির উপর নির্ভরশীল। শূন্য সহায়ক শিল্পক্ষেত্র কেন, মূখ্য শিল্পক্ষেত্রগুলির প্রসঙ্গেও (ফ্রান্সের মোটরগাড়ি নির্মাণ, সুইজারল্যান্ডের স্বাস্থ্যোদ্ভাব কেন্দ্র সংক্রান্ত ব্যবসা, দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণনিষ্কাশন) একথা খাটে।

বিদেশ থেকে আগত দুই কোটি পঞ্চাশ লক্ষাধিক কর্মীর (তাদের পরিবারের লোকজন সমেত) মধ্যে ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ মতন বাস করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ বাস করে পশ্চিম ইউরোপে, ৩০ লক্ষ মতো আছে মধ্য প্রাচ্যের তৈল নিষ্কাশনকারী দেশগুলিতে, প্রায় ১৫ লক্ষ — পশ্চিম আফ্রিকার আর বাদবাকিরা আছে দক্ষিণ আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও ওসিয়ানিয়াতে। বহিরাগত শ্রমিকদের

একটা বড় দল এসেছে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ (ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, মেক্সিকো, পাকিস্তান আর আফ্রিকার দরিদ্রতম দেশগুলি) থেকে।

উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে অভিপ্রাণের মূল কারণ হল প্রথাগত গঠনকাঠামো ভাঙার অপেক্ষাকৃত দ্রুত প্রক্রিয়া এবং কলকারখানা ও অবকাঠামোর স্বল্প বিকাশের ফলে উদ্ভূত 'বহিষ্করণ শক্তি'। পুঁজিবাদের বিকাশ এবং কৃষি ও প্রথাগত শিল্পক্ষেত্রে শ্রমশক্তির অব্যাহতির ফলে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে এবং শহর থেকে বিদেশে শ্রমশক্তি বহির্গমনের এক অখণ্ড নিরবচ্ছিন্ন শৃঙ্খল গড়ে ওঠে। অর্থনৈতিক বিকাশ (পুঁজিতন্ত্রের বিকাশের চক্রাকার সীমার মধ্যে) ও স্বল্পদক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকদের কাজের সদুযোগ শিল্পোন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশসমূহের 'আকর্ষণ শক্তি' হয়ে দেখা দেয়।

অপেক্ষাকৃত স্বল্পোন্নত দেশসমূহের শ্রমজীবী মানুষেরা বেকারি ও দারিদ্র্যের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার ও তাদের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি ঘটানোর জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। এর জন্য বৎসমান্য মাইনেতেও তারা কোনো আপত্তি প্রকাশ করে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একজন মেক্সিকান শ্রমিক যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তার উপার্জনের শতকরা ৩০ ভাগ দেশে পাঠাতে পারে তাই দিয়ে সে অন্ততপক্ষে পরিবারের পাঁচজন লোকের ভরণপোষণ করতে সমর্থ হয়।

উন্নত পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে বহিরাগত শ্রমশক্তি প্রধানত এমন সমস্ত শিল্পশাখায় নিযুক্ত থাকে

যেখানে মজদুরির হার নিম্ন। বহিরাগত শ্রমিকরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গৃহনির্মাণ ও হোটেল ব্যবসায়, প্লাস্টিক, রবার ও অ্যাসবেস্টসের কারখানায় কাজ করে। ওই সব জায়গায় প্রায় তিনজনের একজনই বিদেশী।

বুর্জোয়া বিদেশী শ্রমিকদের উপর চরম শোষণ করে, ভারী ও বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে কাজে তাদের লাগায়। উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে আগত লোকেদের অবস্থান সমাজের সর্বনিম্ন সোপানে, তারা 'দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক' রূপে গণ্য।

পশ্চিম ইউরোপের বহু দেশে ট্রেড ইউনিয়নের চাপে পড়ে বিদেশী শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্যের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে আইন গৃহীত হলে কী হবে নিয়োগকর্তারা তারই মধ্যে ঠিক ছিদ্র খুঁজে পায় — স্থানীয় শ্রমিকদের তুলনায় বিদেশী শ্রমিকদের কম মজদুরি দিয়ে থাকে। বোনাস দেওয়ার ব্যাপারে বৈষম্য — নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু বৈষম্যের সবচেয়ে করুণ প্রকাশ হল কাজের জায়গায় বিদেশী শ্রমিকদের পরিস্থিতি। স্বাস্থ্যের নীতিনিয়মবিরুদ্ধ ব্যবস্থা, সংকীর্ণ দালানের মধ্যে নিবিড় ভীড়, ওভারসীয়ারদের নিরন্তর কড়া নজর — এ সবই আমাদের মনে করিয়ে দেয় বিগত শতাব্দীর করুণ চিত্র।

বিদেশী শ্রমিক সহজলভ্য হওয়ার ফলে নিয়োগকর্তার পক্ষে স্বদেশের শ্রমিকদের উপর চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব। এর ফলে শাসক শ্রেণীর মতবাদের প্রবক্তা ও রাজনীতিকরা জনসাধারণের কোনো কোনো মহলে জাতিদম্ভমূলক ভাবপ্রবণতা ছড়ানোর সুযোগ পায়।

উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির বুর্জোয়ারা জাতিবিদ্বেষের ইন্ধন যোগায়, তারা স্থানীয় শ্রমিকদের বহিরাগত শ্রমিকদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়, বহিরাগত শ্রমিকদের উপর এই বলে দোষারোপ করে যে তারা চাকরির জায়গায় ভাগ বসচ্ছে এবং স্থানীয় শ্রমজীবীদের মজুরি হ্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এইভাবে বুর্জোয়ারা শ্রমজীবী জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের দ্রুত অবনতির এবং বেকারির আসল কারণ গোপন করার চেষ্টা করে। আসলে সমস্ত কিছুর মূলে যা আছে তা হল পুঁজিতন্ত্রের অন্তর্নিহিত ক্রমবর্ধমান বিরোধ — উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র ও পুঁজিতান্ত্রিক ব্যক্তিগত আত্মসাৎ প্রণালীর বিরোধ, শ্রম ও পুঁজির মধ্যে এবং অন্যান্য আরও বিরোধ।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের পরিস্থিতিতে শ্রমশক্তির যোগ্যতার নিরন্তর উন্নয়ন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। এক ধরনের জীবিকা ও বৃত্তির বিলোপ ঘটে, তার জায়গায় আরেক ধরনের জীবিকা ও বৃত্তির জন্ম হয়। এই কারণে মজুরি শ্রমিকদের যোগ্যতার উপর চাহিদার প্রকৃতিও দ্রুত পাল্টে যায়। বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের আগে পর্যন্ত দেখা গেছে কোনো একটা বৃত্তি তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি যতদিন ভেঙে চূরে অচল না হয়ে পড়ছে অথবা বাতিল না হয়ে যাচ্ছে ততদিন টিকে থাকছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের পথ উন্মুক্ত হওয়ার ফলে জীবিকা ও বৃত্তি নবায়নের মেয়াদ কমে আসতে লাগল। বর্তমানে তা ৪-৮ বছর পর্যন্ত নেমে গেছে। যন্ত্রপাতির বদলের

তুলনায় বৃদ্ধির বদল ১.৫—২ গুণ দ্রুত ঘটছে। এ
সবের ফলে শ্রমিককে অবিরাম শিখতে হচ্ছে, নিজের
যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে হচ্ছে।

কিন্তু পুঁজিতান্ত্রিক পরিস্থিতিতে কাজের যোগ্যতা
ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা যায়।
শুদ্ধ সামাজিক ও শ্রেণীগত ভিত্তিতে নয়, আর্থিক
দিক থেকেও উচ্চশিক্ষার পথে শ্রমিকের বাধা আছে।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলে কী একচেটিয়া
কারবারীদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলিতে কী তার
বহির্ভূত সেষ্টরে — সর্বত্রই কর্মীদের শ্রমের উপর
ব্যক্তিগত একচেটিয়া মালিকানার আধিপত্য বৃদ্ধি পায়।
একচেটিয়া কারবার বুর্জোয়া রাষ্ট্রবল্লের সমস্ত শক্তিকে
কাজে লাগিয়ে সর্বতোভাবে শ্রমের উপর তার আধিপত্য
বৃদ্ধি করে। মজুরি শ্রমিকদের উপর একচেটিয়া
কারবারীদের শোষণ বৃদ্ধির মধ্যেই শুধু তা প্রকট হয়ে
ওঠে না। একচেটিয়া অধিকারের স্বার্থে একচেটিয়া
অধিকার-বহির্ভূত বহু কারবারে যে উদ্ভূত-মূল্য
সৃষ্টি হয় সেগুলির পুনর্বণ্টন করে একচেটিয়া
কারবারীরা তাদের উপর নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করে।
পুঁজি বাইরে চালান করে দিয়ে এবং জাতি-অতিগ
কর্পোরেশনগুলির খুঁটি শক্ত করে বেশ কিছু উন্নত
পুঁজিবাদী দেশের একচেটিয়া বুর্জোয়া সম্প্রদায়
উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর লুটতরাজ চালিয়ে
যাচ্ছে।

বিভিন্ন দেশের কিছু কোম্পানির অধিকারগ্রহণ ও
সম্মিলনের ফলে জাতি-অতিগ কর্পোরেশনগুলির

জন্ম। আশির দশকের গোড়ায় প্রায় ৪০ শতাংশ শিল্পজাত উৎপাদন, ৬০ শতাংশ বহির্বাণিজ্য এবং পুঁজিতান্ত্রিক দুনিয়ায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তিবিদ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ জাতি-অতিগ কর্পোরেশনগুলির দায়িত্বে ছিল। জাতি-অতিগ ব্যাংকগুলি ব্যাংক-পুঁজির একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ন্ত্রণ করত। জাতি-অতিগ কর্পোরেশনগুলি বৃহৎ পুঁজি ও প্রচুর বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সাপেক্ষ শিল্পশাখাগুলিতে পুঁজি বিনিয়োগের দ্বারা বিপুল পরিমাণে মূল্যবান অর্জন করে (যেমন, কম্পিউটার উৎপাদনের ক্ষেত্রে)। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যে-সমস্ত লাইসেন্স বিক্রি হয় সেগুলির বেশির ভাগই জাতি-অতিগ কর্পোরেশনগুলির হাতে কেন্দ্রীভূত। বিদেশে যে সব প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা অধিক ফলপ্রসূ, জাতি-অতিগ কর্পোরেশনগুলি তাদের অধিকারগ্রহণের চেষ্টা করে, উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রমিক ভাড়া নেওয়ার এবং অন্যান্য দেশের ভালো ভালো শ্রমিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের টোপ দিয়ে আনার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহ দেখায়। আশির দশকের গোড়ায় পুঁজিতান্ত্রিক দেশসমূহের প্রসেসিং শিল্পে নিষুদ্বৃত্ত সমগ্র শ্রমশক্তির শতকরা ২৫ ভাগ জাতি-অতিগ কর্পোরেশনভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাজ করত।

জাতি-অতিগ কর্পোরেশনগুলি উন্নয়নশীল দেশসমূহের উপর লুটতরাজ চালিয়ে, তাদের সম্পদ ও সম্ভার শ্রমশক্তি শোষণ করে এবং বিকাশের গতি ব্যাহত করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন ঘটায়। বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলে এই

অবস্থার যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটবে অথবা পুঁজিবাদী দুনিয়ার উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মাঝখানের ব্যবধান যে হ্রাস পাবে এখন পর্যন্ত সে আশা বাস্তবে পরিণত হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। বরং এই ব্যবধান ক্রমবর্ধমান হয়।

এর কারণ আর কিছুই নয়: পুঁজিতান্ত্রিক দেশ-গুলির মধ্যে যারা 'ধনী', একমাত্র তাদের পক্ষেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলিতে সর্বতোভাবে দ্রুত বেগ সঞ্চার করা এবং তার ভিত্তিতে নিরন্তর উৎপাদনের প্রযুক্তিগত বিনিয়াদ আধুনিকীকরণ সম্ভব। বেশির ভাগ উন্নয়নশীল দেশেরই কিন্তু সে সম্ভাবনা ন্যূনতম।

অপেক্ষাকৃত সুলভ শ্রমশক্তির উপর শোষণ ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর দস্যুতামূলক লুটতরাজ চালিয়ে জাতি-অতিগ কর্পোরেশনগুলি অতি মুনাকা লোটে এটা ঠিকই, কিন্তু সর্বোপরি তারা অতি মুনাকা লোটে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অবস্থিত নিজস্ব কলকারখানায় শ্রমিকদের মজুরির মধ্যে ফারাক সৃষ্টি করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বৈদ্যুতিক প্রযুক্তি শিল্পক্ষেত্রে সংযোজনের কাজে নিযুক্ত একজন শ্রমিক (ফ্রাঙ্কের হিসাবে) স্পেন, ইতালি ও জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রে পায় ঘণ্টায় ৩০-৪০ ফ্রাঙ্ক, মালয়েশিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ায় ৬০ সার্টিম, তাইওয়ানে ১ ফ্রাঙ্ক আর সিঙ্গাপুরে পায় ৩.৭ ফ্রাঙ্ক।

ঘণ্টা পিছুর ষৎসামান্য মজুরি বেঁধে দিয়ে জাতি-অতিগ কর্পোরেশনগুলি কর্ম-দিবস বাড়ানোর চেষ্টা

করে। মার্কিন জাতি-অতিগ কর্পোরেশনগুলির সিঙ্গাপুরে ও দক্ষিণ কোরিয়ায় যে-সমস্ত শাখা আছে সেখানে মার্কিন বক্তৃতাষ্ট্রে অবস্থিত অনুরূপ প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১৮ শতাংশ ও ২৪ শতাংশ বেশি।

যে সব উন্নয়নশীল দেশে একঘেয়ে এসেম্বলি লাইনের শ্রমার্ভিত্তক স্বয়ংক্রিয় কলকারখানা আছে জাতি-অতিগ কর্পোরেশনগুলি সেখানে দ্রুতগতিতে বিকাশ লাভ করে। স্থানীয় সুদৃঢ় শ্রমশক্তি কাজে লাগানোর কথা চিন্তা করে, যে-সমস্ত উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হাতের কাজের দরকার সেগুলিও উন্নয়নশীল দেশসমূহের ঘাড়ে চাপানো হয়।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব শ্রম ও পুঁজির সম্পর্ক এবং অর্থনীতির উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করে। এর ফলে বর্জ্যে রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ একচেটিয়া কারবারের স্বার্থের সঙ্গে মিলে যায়।

পুঁজিবাদী শোষণ ব্যবস্থায় বর্জ্যে রাষ্ট্রগুলির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। প্রথমত, বর্জ্যে রাষ্ট্র পুঁজিবাদী শোষণেরই পৃষ্ঠপোষকতা করে। পুঁজিবাদী দেশসমূহের সংবিধানগুলিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অলঙ্ঘনীয়তার নীতি বিঘোষিত। পুঁলিশ, আদালত, জেলখানা এবং বলপ্রয়োগের আরও নানা উপায় খাটিয়ে বর্জ্যে রাষ্ট্র পুঁজিতান্ত্রিক সম্পত্তি-মালিকানার উপর যে কোনো রকম হস্তক্ষেপকে নিবারণ করে, পুঁজিবাদী শৃঙ্খলা বজায় রাখে।

দ্বিতীয়ত, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারের সীমা সংকোচনের উদ্দেশ্যে শ্রমিকবিরোধী আইন জারী করে, স্থির মজুরি বেঁধে দিয়ে এবং শ্রমজীবীদের আয়ের উপর কর বসিয়ে সেই অর্থ দিয়ে একচেটিয়া কারবারীদের সাহায্য জুগিয়ে বুর্জোয়া রাষ্ট্র নানাবিধ উপায়ে শোষণ তীব্র করে তুলতে সহায়তা করে।

তৃতীয়ত, বুর্জোয়া রাষ্ট্র নিজেই মজুরি শ্রমের শোষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানাগুলিতে শ্রমিকেরা যে উদ্ধৃত-মূল্য গড়ে তোলে তা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের বাজেট ভারতি করে। ওই সমস্ত কলকারখানায় শ্রমের যে বিধিব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা ব্যক্তিগত একচেটিয়া কারবারী পরিচালিত কলকারখানায় প্রচলিত বিধিব্যবস্থারই সমতুল। কোনো কোনো দেশে (যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে) রাষ্ট্রায়ত্ত কলকারখানায় ধর্মঘট নিষিদ্ধ। এইভাবে উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমজীবীদের শোষণ করা ছাড়াও বুর্জোয়া রাষ্ট্র — এবং প্রকৃতপ্রস্তাবে সমগ্র পুঁজিবাদী শ্রেণী — কর চাপিয়ে তাদের আরও শোষণ করে।

রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পুঁজিবাদের পরিস্থিতিতে একচেটিয়া কারবারীর শক্তি আর রাষ্ট্রশক্তি সম্মিলিত হয়ে একটি একক যন্ত্রব্যবস্থায় পরিণত হওয়ার ফলে বুর্জোয়া রাষ্ট্র তার প্রধান কার্যবিধি পরিপূর্ণভাবে সম্পাদন করতে পারে, অর্থাৎ এমন ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে যে মজুরি শ্রমের উপর একচেটিয়া মালিকানার শোষণের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী।

বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সাহায্যপুষ্ট একচেটিয়া কারবারীদের পক্ষে অর্থনীতিতে সামরিক-শিল্প সমাহারের একত্রীকরণ এবং অর্থনীতির বিনিয়াদ সামরিকীকরণের পেছনে অপরিমেয় ব্যয়বৃদ্ধি সম্ভব হয়ে ওঠে। অর্থনীতির সামরিকীকরণের ফলে কর্মসংস্থানের সমস্যা অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করে।

মিশিগানের জনস্বার্থ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক-গবেষণা সংস্থার হিসাব অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিক উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে তার প্রতি একশ কোটি ডলারে ৭০ হাজার শিক্ষকের অথবা ৮৫ হাজার মাঝারি স্তরের চিকিৎসা কর্মীর কর্মসংস্থান হতে পারে। সামরিকীকরণের ফলে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে যে ক্ষতি হয় তা প্রচণ্ড। সত্তরের দশকের প্রথমার্ধে সামরিকীকরণের ফলে শ্রমের চাহিদা বছরে ৩ লক্ষাধিক হ্রাস পায়। তাও আবার ঘটে এমন এক পর্বে যখন সে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক কর্মনিয়োগ সংস্থার মারফৎ কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিও সামরিকীকরণের কক্ষপথে আকৃষ্ট হয়। তার ফলে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতা অতিক্রমণের প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। যে সময় শত শত কোটি ডলার দানবীয় সামরিক প্রকল্প রূপায়ণে ব্যয়িত হচ্ছে তখন নির্মল পানীয় জলের অভাবে দু শ কোটি মতন মানুষ সংক্রামক ব্যাধিতে ভুগছে; ১৫০ কোটি লোক চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত; একশ কোটি লোক দারিদ্র্য সীমানার নীচে দিনপাত করছে; ৮০ কোটি বয়স্ক লোক নিরক্ষর;

২০ কোটি শিশুর স্কুলে যাবার সামর্থ্য নেই; ৬০ কোটি লোকের কোনো চাকরি নেই।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের পটভূমিকায় পুঁজিতন্ত্রের মূল বিরোধের তীব্রতার আরও একটি বহিঃপ্রকাশ হল কার্মিক ও মানসিক শ্রমের বিরোধিতা বৃদ্ধি।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রগতি মানুষ ও তার ক্ষমতা বিকাশের ক্ষেত্রে শ্রমের ভূমিকার আমূল পরিবর্তন ঘটায়। যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিবিজ্ঞানে বিপ্লবের ফলে বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে ও মর্যাদাহীন কার্মিক শ্রম প্রয়োগের ক্ষেত্র সংকীর্ণ হয়ে আসে, বুদ্ধিমত্তা সৃজনী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ শ্রমের ক্ষেত্র প্রসারিত হয়।

পৃথক পৃথক যন্ত্রে কাজ করার ভিত্তিতে যে শ্রম-বিভাজন গড়ে উঠেছিল, বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের পটভূমিকায় তা থেকে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাভিত্তিক শ্রম-বিভাজনে উত্তরণ সংশ্লিষ্ট সমস্যার উদ্ভব ঘটে। পুঁজিতন্ত্র বিকাশের প্রাথমিক স্তরে মজুরি শ্রমিক স্থান ও কাল উভয় ক্ষেত্রেই এক বিশেষ ধরনের সামাজিক শ্রম-বিভাজনে আবদ্ধ ছিল। সে ছিল যন্ত্রের লেজুড়, একজন আংশিক কর্মী মাত্র। তার কাছ থেকে যা দাবি করা হত তা হল বিশেষ ধরনের শ্রমের অভিজ্ঞতা, জ্ঞানের তেমন একটা ভূমিকা সেখানে থাকত না। দিনের পর দিন শ্রমিক একই ধরনের ক্লাস্তিকর একঘেয়ে কাজ করে যেত। যন্ত্র আর শ্রম-বিভাজন তাকে পুঁজির সঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখত, তাই এক অর্থে সে ছিল তাদের দাস।

উৎপাদনে বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের ভূমিকাগ্রহণ এবং যন্ত্রব্যবস্থা প্রয়োগের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক তার শ্রমের প্রকৃতিতে পরিবর্তনের আবশ্যকতা অনুভব করল। এর ফলে শ্রমের ক্ষেত্রে জ্ঞানের ভূমিকা উন্নত হল, যে সব শ্রমিক মদ্যুত কার্যিক শ্রমের কাজে নিযুক্ত, তাদের মানসিক প্রিয়াকলাপ দেখানোর সুযোগ বৃদ্ধি পেল। শ্রম-প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি-বিদ্যা প্রচলনের ফলে শ্রমের ক্ষেত্রে বিরাট ওলটপালট ঘটে গেল, সামাজিক শ্রম-বিভাজনের বিশেষ কোনো এক ধরনের সঙ্গে শ্রামকের যে দাসত্ববন্ধন ছিল তা ঘুচে গেল। এখন আবির্ভাব ঘটল বহুদক্ষী, শিক্ষিত, উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন নতুন এক ধরনের শ্রমিকের।

কিন্তু পুঁজিতন্ত্রের পটভূমিকায় গঠনপ্রকৃতির উল্লিখিত সমস্ত পরিবর্তনই ঘটে এমন পরিস্থিতিতে যখন বহু শিল্পশাখায় গড়পড়তা ও নিম্নস্তরের দক্ষতাসম্পন্ন শ্রামিকদের সম্প্রদায় অব্যাহত গতিতে সামগ্রিক এবং আপেক্ষিক উভয় অর্থেই বেড়ে চলে। সৃজনী শ্রম প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ সত্ত্বেও কার্যিক ও মানসিক শ্রমের বিরোধিতা হ্রাস পায় না।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের পথে শুধু কার্যিক শ্রমের কর্মীরা নয়, মানসিক শ্রমের কর্মীরাও (যোগ্যতাসম্পন্ন শ্রামিক, ইঞ্জিনিয়ার, কারিগর ও অফিস কর্মচারী) মজুদী শ্রমিক হয়ে পড়ে। আধুনিক পুঁজিতন্ত্রী কলকারখানাগুলিতে বিশেষত স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাসম্পন্ন কলকারখানায় একটা বড় রকমের কর্মিসম্প্রদায় দেখা দিয়েছে যারা মদ্যুত মানসিক

পরিশ্রমের কাজ করে। বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব শিক্ষিত সংস্কৃতিবান কর্মীর চাহিদা গড়ে তোলে। তাছাড়া নিজের অধিকার অর্জনের জন্য শ্রমিক শ্রেণী যে সংগ্রাম করে তার ফলে কর্ম-দিবস হ্রাস পায় এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির পরিস্থিতি উদ্ভূত হয়। আধুনিক পরিস্থিতিতে শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যবর্তী সীমারেখা মদুখ্যত মানসিক ও মদুখ্যত কায়িক শ্রমে মানবকে ভাগ করার সঙ্গে মেলে না।

পূর্জিতন্ত্রে বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের পরিস্থিতিতে নগর ও পল্লীগামের মধ্যে বৈষম্যও বৃদ্ধি পায়। গ্রামাঞ্চলে শ্রমের অন্তর্বস্তুতে গভীর পরিবর্তন ঘটে। ‘সবুজ বিপ্লবের’ ফলে কৃষি শ্রমের সংগঠনে, তার প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতিতে আমূল পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রের শ্রম ক্রমেই বেশি পরিমাণে শিল্পায়িত শ্রম হয়ে উঠছে। শ্রমের উপকরণ হিশেবে উচ্চ উৎপাদনশীল যন্ত্রপাতি (ট্র্যাক্টর, কম্বাইন যন্ত্র ইত্যাদি), মিশ্র পশুখাদ্য, খনিজ সার ও উদ্ভিদ রক্ষার জন্য রাসায়নিক উপায় অবলম্বন করা হচ্ছে। বিজ্ঞানের ভূমিকা (অণুজীববিজ্ঞান ও প্রজননবিজ্ঞান) বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভূমি উন্নয়ন ব্যবস্থার বিকাশ ঘটছে। এর ফলে কৃষিতে শ্রম-প্রক্রিয়ায় জ্ঞানের ভূমিকা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রাম এখন আর শুধু কৃষি শ্রমনিয়োগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। গ্রামে কৃষি-যন্ত্রপাতি মেরামতের কারখানা গড়ে উঠছে, খাদ্যবস্তু প্রক্রিয়ার ও মিশ্র পশুখাদ্য ইত্যাদির কারখানা তৈরি হচ্ছে, গ্রামবাসীদের নানাবিধ দৈনন্দিন

ও সাংস্কৃতিক চাহিদা মেটানোর জন্য রাস্তাঘাট ও প্রতিষ্ঠানগুলি গড়া হচ্ছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও নাগরিকীকরণের মাত্রা আগের মতোই বেশি আছে, পল্লীবাসীদের শহরে অভিপ্রয়াণ অব্যাহত গতিতে চলছে। পল্লীর উপর নগরের শোষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, নগরবাসী ও পল্লীবাসীদের জীবনমান ও মানসিক স্তরের মধ্যে ফাঁক বেড়ে যাচ্ছে। শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সেবাব্যবস্থার বিকাশ এবং জীবনযাত্রার স্তর ও আদর্শের ক্ষেত্রে শহর সব সময় গ্রামের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকছে।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের পরিস্থিতিতে নগর ও পল্লীগ্রামের বৈষম্য শিল্পোন্নত কেন্দ্রাঞ্চল ও পশ্চাৎপদ প্রত্যন্ত প্রদেশের এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের বিরোধের মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে, কৃষির কাঁচামাল ও প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যের দামের মধ্যে পার্থক্য বাড়িয়ে তোলার একটা স্থির প্রবণতাও লক্ষ করা যায়।

উন্নয়নশীল দেশগুলির একটা বৈশিষ্ট্য হল রপ্তানিযোগ্য কোনো কোনো কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনে বিশেষীকরণের এক তরফা ঝোঁক, যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষতিকারকও বটে। বহু দেশে তা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে এবং তার ফলে কৃষি উৎপাদনে এক-ফসলী ব্যবস্থা দেখা দিয়েছে। তথাকথিত ‘কফি প্রজাতন্ত্রগুলিতে’ রপ্তানিজনিত আয়ের অর্ধেকের বেশি আসে কফি থেকে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে নগর ও পল্লীগ্রামের বৈষম্য জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার প্রাক-

পূর্জিতান্ত্রিক রূপকে সুদৃঢ় করে তোলে, প্রাকৃতিক ও অর্ধ-প্রাকৃতিক এক ধরনের অর্থনীতির প্রাধান্য সূচনা করে, যেখানে শ্রম সামাজিকীকৃত হয় না আর উৎপন্নদ্রব্যও বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত না হয়ে প্রস্তুত হয় মালিকের ব্যক্তিগত চাহিদা মেটানোর জন্য। সমস্তের দশকের মাঝামাঝি আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রায় ২০-২৫ শতাংশ ছিল প্রাকৃতিক অর্থনীতিজাত উৎপন্নদ্রব্য।

আফ্রিকার বহু দেশের গ্রামাঞ্চলে এখনও জমির যৌথ মালিকানা ও গোষ্ঠী সম্পর্কের আধিপত্য লক্ষ করা যায়। ওই সমস্ত জায়গায় জমির ব্যক্তিগত মালিকানা নেই। রাষ্ট্রই জমির সর্বোচ্চ মালিক। সম্পত্তিগত বৈষম্য ও পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের বিকাশের ভিত্তিতে জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে কৃষককুলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্ট হয়।

লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে ‘লাতিফুন্দিজম’ অর্থাৎ বৃহৎ ব্যক্তিগত জমিমালিকানার আধিপত্য দেখা যায়। ভূসম্পত্তির মোট যে হিসাব পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যায় তার প্রায় শতকরা ৫০ ভাগই ১-৫ শতাংশ মালিকের হাতে, যাদের জমির পরিমাণ ৬ হাজার হেক্টরেরও বেশি; ৩-৮ শতাংশ ভূস্বামী ৬০-৮০ শতাংশ জমির মালিক; ৭৫-৮০ শতাংশ মালিকের ভাগে পড়ছে ৫ থেকে ১০ শতাংশ কষণযোগ্য জমি। লাতিন আমেরিকার দেশগুলির শতকরা ৮৮ ভাগ কর্মক্ষম গ্রামবাসীর আদৌ কোনো জমি নেই, অথবা

থাকলেও আছে এত ছোট জমির টুকরো যা থেকে পরিবারের ভরণপোষণ করা সম্ভব নয়।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ঔপনিবেশিক পর্বের জের হিশেবে কৃষিভিত্তিক জনসমাজের একটা বিরাট অংশ অতিরিক্ত হয়ে যায়। এরা হল বিধবস্তপ্রায় বিপুল সংখ্যক কৃষকসম্প্রদায় যাদের এখনও জমির সঙ্গে সম্পর্ক আছে, যারা কাজের খোঁজে এখনও শহরে উঠে যায় নি। এই কারণে গ্রামীণ জনসাধারণের অর্ধ বেকার অবস্থা তো বজায় আছেই, এমন কি কোনো কোনো দেশে তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, জমির উপর তার ভরসা কমে যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের বাস ছেড়ে শহরে উঠে যাওয়ার সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু শিল্প সেই পরিমাণে বাড়ছে না বলে শ্রমের বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে না।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে পল্লীবাসীদের উপর শোষণ বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় আরও একটা ব্যাপারে — উৎপাদনের ঐতিহ্যগত রূপে — কুটিরশিল্পে। এমন কি অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশ ভারতেও শিল্পক্ষেত্রে নিযুক্ত শতকরা ৭০ জন উৎপাদনের এই রূপের অন্তর্ভুক্ত। ওই সব উদ্যোগের বেশির ভাগই গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। কুটিরশিল্পীকে সচরাচর কাঁচামালের যোগানদার, মহাজন ও দালালদের কবলে থাকতে হয়। কুটিরশিল্পীর মজুরি অনেক সময় অদক্ষ শ্রমিকের মজুরির চেয়েও কম হয়।

বহু কাঠামোবদ্ধ অর্থনীতির ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কৃষিভিত্তিক পুঞ্জীভবনের বিকাশ গ্রাম ও শহরের বিভেদ তীব্র ও গভীর করে তোলে। তাই

নিয়োগের মদ্যচলেকা দেওয়া শর্তের উচ্ছেদ ও কৃষি সংস্কার উন্নয়নশীল দেশগুলির জাতীয় ও সামাজিক মদ্যস্তির জন্য সংগ্রামের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব শিশু ও নারী শ্রমের নিয়োগ সংক্রান্ত সকল সমস্যা সমাধান করতে পারে না।

যন্ত্রচালিত উৎপাদনের যুগে যন্ত্রপ্রচলনের ফলে পেশীশক্তি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ায় ব্যাপক হারে শিশু ও নারী শ্রম কাজে লাগানো শুরু হয়। বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের পরিস্থিতিতে নারী শ্রমের ব্যাপক প্রয়োগের প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনে স্বয়ংক্রিয় ও ইলেকট্রনিক যন্ত্র, কম্পিউটার আর সাইবারনেটিক্স ব্যবস্থা প্রচলনের ফলে যে-সমস্ত বৃত্তি আগে কায়িক শ্রম বলে গণ্য হত, কিন্তু এখন দ্রুত ও নিখুঁত কাজ এবং উচ্চ যোগ্যতা দাবি করে, সে রকম বহু নতুন নতুন পেশায় নারীকর্মীদের প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত হচ্ছে।

পুঁজিতান্ত্রিক দেশগুলিতে মজুরি শ্রমিকদের বাহিনীতে নারীর ভাগ প্রায় ৪০ শতাংশের কাছাকাছি হয়ে আসছে, এই সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে তাদের দুই-তৃতীয়াংশই আছে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে।

নারী শ্রম কাজে লাগানোর বিশেষ ক্ষেত্র হল কৃষি ও বাণিজ্য। এছাড়া নতুন নতুন প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়ার ফলে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কলকারখানায় বিপুল সংখ্যক সস্তার অদক্ষ নারী শ্রমের ব্যবহার সম্ভব হয়ে ওঠে। যেমন মরোক্কোতে কম্পিউটার, টেলিভিশন

ও রেডিও-সেট জোড়ার কাজে বিভিন্ন উদ্যোগে নিযুক্ত কর্মীদের মধ্যে শতকরা ৮০ থেকে ৯০ ভাগই হল ২৪ বছরের অনূর্ধ্ব স্ত্রীলোক। সচরাচর ৩০ বছরের উর্ধ্ব স্ত্রীলোকদের বরখাস্ত করে সে জায়গায় অল্পবয়স্কাদের নেওয়া হয়।

জাতি-অতিগ কর্পোরেশনের শাখাগুলির ম্যানেজাররা একথা গোপন করে না যে নারী শ্রম কাজে লাগানোর ফলে তাদের আর্থিক লাভ কম হয় না: স্ত্রীলোকেরা বেশ নিরীহ প্রকৃতির, সহিষ্ণু, ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার দিকে তাদের তেমন ঝোঁক দেখা যায় না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, স্ত্রীলোকদের শিক্ষার স্তর কম হওয়ায় আধুনিক কলকারখানায় ব্যাপক হারে তাদের নিয়োগ ঘটছে না। ইউনেস্কোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ১৯৮০ সালে নিরক্ষরদের সংখ্যা ছিল ৮১ কোটি ৪০ লক্ষেরও বেশি, তাদের মধ্যে ৫০ কোটিই নারী। উন্নয়নশীল দেশসমূহে একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে বৃত্তিশিক্ষা অর্জন তো দূরের কথা, প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করাই কঠিন।

উল্লিখিত নেতিবাচক পরিস্থিতির ফলে নারী শ্রমের একটা বড় অংশ ক্ষুদ্র শিল্পে ও হস্তশিল্পে নিযুক্ত। ১৯৭৮-১৯৭৯ সালে ইউনেস্কো যে পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিল তাতে দেখা যাচ্ছে বাঙলাদেশের মতো দেশে শিল্পক্ষেত্রে স্ত্রীলোকদের নিয়োগের সবচেয়ে বড় জায়গা হল পাট প্রক্রিয়াকরণ এবং পাটজাত

দ্রব্য উৎপাদন — দেশের প্রায় ১ লক্ষ স্ত্রীলোক এই কাজে নিযুক্ত।

ঐতিহ্যগত শিল্পক্ষেত্রগুলিতে নারীরা যে দক্ষতা অর্জন করে থাকে, কলকারখানায় তার প্রয়োগ বিশেষ উপযোগী হয় না। ফলে শিল্পে নিযুক্ত নারীদের পেশাগত শ্রেণী বিভাগের নিম্ন স্তরে থেকে যেতে হয়। মরোক্কোয় পরিচালিত এক নিরীক্ষা অনুযায়ী সূতীবস্ত্র, কাগজ তৈরি, ঔষধ প্রস্তুত শিল্পে যথাক্রমে ৫০, ৫৫ ও ৮০ শতাংশ অদক্ষ শ্রমিক হল নারী। তাঞ্জানিয়ায় ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে যত স্ত্রীলোক কাজ করে তাদের মধ্যে শতকরা মাত্র ৪ জন উচ্চ যোগ্যতামূলক শ্রমে নিযুক্ত। এমন কি যেখানে তুলনামূলকভাবে নারীদের শিক্ষাগ্রহণের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা হয়েছে, সেই ভারতেও তারা অনেক সময় অদক্ষ কর্মী হিসেবে কাজ করে।

নারী শ্রম কাজে লাগানোর ফলে মজুরির হারে বিভেদ ঘটিয়ে পুঁজিপতিদের পক্ষে অতিরিক্ত মূল্য লোটা সম্ভব হয়ে থাকে। পুরুষেরা যে কাজ করে আয়তনে ও দক্ষতায় সেই একই কাজ করে পুঁজিতান্ত্রিক দেশে নারীরা পুরুষের মজুরির ৫০ থেকে ৮০ শতাংশের সমান পারিশ্রমিক পায়। সূতীবস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত একজন স্ত্রীলোকের ঘণ্টা পিছু মজুরি পুরুষের ওই একই সমান কাজের মজুরির তুলনায় মরোক্কোয় ও সিঙ্গাপুরে যথাক্রমে ১৪ ও ২২ শতাংশ কম। বাঙলাদেশে শহরের কারখানা-বহির্ভূত শিল্পে একই ধরনের কাজের জন্য স্ত্রীলোকদের মজুরি

পুরুষদের মজুরির শতকরা ৪০-৫০ ভাগ কম। তাঞ্জানিয়ায় ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে ১৯৮০ সালে একজন পুরুষের গড় মাসিক মজুরি ছিল ৩৭৯ শিলিং, একজন স্ত্রীলোকের ছিল ২৭৬, সিরিয়ার ছিল যথাক্রমে ১১৫ ও ৭৯ পাউন্ড। দক্ষিণ কোরিয়ায় নারীদের গড় মাসিক মজুরি পুরুষদের গড় মাসিক মজুরির ৪৪.৫ শতাংশের সমান।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শ্রদ্ধা নারী শ্রম কেন, শিশু শ্রম নিয়োগের হারও উন্নত পুঞ্জিতান্ত্রিক দেশগুলির তুলনায় বেশি। ইউনেস্কোর পরিসংখ্যানমতে ১০ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত বয়ঃসীমার অন্তর্ভুক্ত শিশুদের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শতকরা ৩১ ভাগ এবং উন্নত দেশগুলিতে শতকরা ৫ ভাগ জীবিকা উপার্জন করে। সামগ্রিক ভাগে পুঞ্জিতান্ত্রিক দুনিয়ায় ১৯৭৯ সালে ১৫ অনুর্ধ্ব বয়সের অন্তত ৫ কোটি ২০ লক্ষ শিশু কাজ করেছে। ঐতিহ্য, কোনো প্রতিষ্ঠানের আয়তন এবং তা শিশুর কোনো আত্মীয়ের মালিকানাধীন কিনা — এ সবের উপর নির্ভর করে শিশুর কাজ শুরু করার বয়স।

যে-সমস্ত কারণে শিশুরা কাজ করতে বাধ্য হয় উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে তা এক নয়। উন্নত দেশগুলিতে শিশুরা অনেক সময় কাজ করে নিজেদের ব্যক্তিগত চাহিদা মেটানোর জন্য অতিরিক্ত অর্থ রোজগারের উদ্দেশ্যে। মা-বাবারা সচরাচর তাদের ছেলেমেয়েদের ঠেলে কাজে পাঠান না।

কিন্তু উন্নয়নশীল দেশসমূহে অধিকাংশ শিশুরই

কাজ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না, যেহেতু তাদের রোজগার অনেক সময় পরিবারের আয়ের একমাত্র উৎস হয়ে দেখা দেয়। খুব ছোটবেলা থেকে রুজি রোজগার করা একান্ত দরকার হয়ে পড়ায় অনেক সময় শিশু স্কুলের পড়াশুনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মেক্সিকোয় ১৯৭৮ সালে ১৫ লক্ষ শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সদ্ব্যয় থেকে বঞ্চিত হয়। ১৯৭০-১৯৭১ সালে যত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছিল তাদের মাত্র ৪০ শতাংশ ১৯৭৫-১৯৭৬ সালে স্কুল শেষ করে। আর্জেন্টিনায় প্রাথমিক শিক্ষা অর্ধসমাপ্ত রেখে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ শিশু স্কুল ছেড়ে দেয়।

উন্নয়নশীল দেশসমূহে কৃষি সেবাব্যবস্থার ক্ষেত্রে এবং অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে কলকারখানা-বহির্ভূত শিল্পশাখায় শিশু শ্রমের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। সম্প্রতি নাগরিকীকরণের সঙ্গে সঙ্গে শহরেও কর্মরত শিশুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোনো শিশু স্বেচ্ছায় গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসার পর যাতে অনাহারে মারা যেতে না হয় সেজন্য হাতের কাছে যে কাজ পায় তা-ই করতে রাজী।

কখনও কখনও আফ্রিকা, এশিয়া, লাতিন আমেরিকা ও দক্ষিণ ইউরোপের দেশগুলিতে মা-বাবারা তাদের ৮-৯ বছরের শিশুদের ভাড়া খাটাতে পাঠিয়ে দেন। অনেক সময় শিশুদের মতামতের কোনো অপেক্ষা না রেখে তাঁরা রাখাল বা ক্ষেতমজুরের কাজে ভাড়া খাটাতে শিশুদের পাঠিয়ে দেন, পরিবর্তে নিয়োগকর্তাদের কাছ থেকে অর্থ কিংবা খাদ্যদ্রব্য পান।

দক্ষিণ এশিয়ায় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এমন ঘটনাও জানা আছে যখন নিয়োগকর্তারা জোর খাটিয়ে, নিষ্ঠুর অত্যাচার চালিয়ে শিশুদের কাছ থেকে কাজ (ঘাড়ি তৈরি, কাঠের জিনিস, গালিচা প্রস্তুত ইত্যাদি) আদায় করে থাকে। আইনে কর্ম-দিবসের যে সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য বেঁধে দেওয়া হয়েছে শিশুদের কাজের ক্ষেত্রে তার মাত্রা বেড়ে যায়। শিশুরা বয়স্কদের সমান পরিশ্রম করে। রেজিস্ট্রি না করা ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিশু শ্রমের প্রয়োগ আরও নিষ্ঠুর আকার ধারণ করে; তার কারণ সেখানে মালিক তার সর্বাধিক মতো কাজের শর্ত উপস্থিত করে। ছোট ছোট চায়ের দোকানগুলিতে শিশুরা দিনে দশ ঘণ্টা কাজ করে।

শিশু শ্রমের এই ধরনের অপব্যবহার নবীন প্রজন্মের দৈহিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যের উপর মন্দ প্রভাব ফেলে। উক্ত অঞ্চলের বাগিচাগুলিতে কর্মরত শিশুদের মধ্যে পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে তাদের মধ্যে শতকরা ২৫.৬ জন দারুণভাবে ভিটামিনের অভাবে ভুগছে। তামাকশিল্পে নিযুক্ত শিশুরা রক্তাল্পতা ও গ্রনিক ব্লুকাইটিসে ভোগে।

বয়স্কদের সমান কাজ করেও শিশুরা তাদের তুলনায় অনেক কম মজুরি পায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইন্দোনেশিয়ায় বয়স্কদের সমানই কাজ করে একজন শিশু বয়স্কদের মজুরির ৭০-৮০ শতাংশ পায়।

নানা রকম বিধিনিষেধ আরোপিত হওয়া সত্ত্বেও নারী শ্রম ও শিশু শ্রমের নিয়োগ বর্তমান পুঞ্জিতন্ত্রের অন্যতম তীব্র সামাজিক সমস্যা হয়ে আছে।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলে উল্লম্বগতিতে পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশ ঘটছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও তেজী পর্বের পর আসছে অবনতি ও মন্দার পর্ব। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে স্থায়ী পুঁজি অর্থাৎ যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম ইত্যাদির ঘন ঘন দ্রুত নবীকরণ ঘটতে থাকে। যাদের যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি যত ভালো, শ্রমশক্তির পেছনে যাদের খরচ যত কম, কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে একমাত্র তারাই বেঁচে থাকে। এসবের ফলে পুঁজিপতিরা আরও বেশি করে পুঁজির একটা বড় অংশ যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের উন্নতির পেছনে খরচ করতে বাধ্য হয়। ফলে জীবন্ত মানব-শ্রমের উপর অতীতের শ্রমের প্রভুত্ব বৃদ্ধি পায়।

পুঁজিতন্ত্রে শ্রম-প্রক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিষ্পন্ন হয়, তা ব্যক্তিগত উদ্যোগের স্বার্থের বশবর্তী। সামাজিক চাহিদা মেটানোর সঙ্গে সেই স্বার্থের যত না যোগ তার চেয়ে বেশি যোগ মুনাকা লোটার সঙ্গে। সামাজিক চাহিদা মেটানোর সঙ্গে শ্রম-প্রক্রিয়ার সংযোগ সাধন করে বাজার। এই বাজারই ব্যক্তিগত ও সামাজিক শ্রমের মধ্যবর্তী বিরোধের সমাধান ঘটাতে পারে প্রত্যাশা করা হয়। কোনো পণ্যদ্রব্য যখন বাজারে বিক্রি হয় একমাত্র তখনই ব্যক্তিগত শ্রম সামাজিক শ্রমে পরিণত হয়।

সুতরাং পুঁজিপতি যদি তার উৎপন্নদ্রব্য পুরোটা বাজারে বেচেতে না পারে তাহলে দ্রব্য উৎপাদনের পেছনে যতটা শ্রম খরচ হয়েছে তার একটা অংশমাত্র প্রত্যক্ষ সামাজিক শ্রমের রূপ পাবে। বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি

বিপ্লবের পরিস্থিতিতে ব্যক্তিগত ও সামাজিক -- এই দুই ভাগে শ্রম-বিভাজন পুঞ্জীভবনের মূল বিরোধের অবসান অসম্ভব করে তোলে। বাজারের মারফত ব্যক্তিগত ও সামাজিক শ্রমের সামাজিক সম্পর্ক অর্থনৈতিক ও গঠনকাঠামোগত সংকটের কানাগলি থেকে বেরোনোর রাস্তা বন্ধ করে দেয়।

অর্থনৈতিক সংকটের পর্বে উৎপাদনের নিদারুণ মন্দা লক্ষ করা যায়, উৎপাদনের উপায় ও শ্রমশক্তির চাহিদা হ্রাস পায়। এর সঙ্গে ভোগ্যদ্রব্যের দামবৃদ্ধি, মজদুরির তহাবল সংকোচ এবং সামাজিক প্রয়োজনের পেছনে ব্যয়ের সংকোচ দেখা যায়। সংকটের ফলে শ্রমের ব্যবহারের ক্ষেত্র আরও সীমিত হয়ে আসে; কেবল অদক্ষ শ্রমশক্তির নয়, দক্ষ শ্রমশক্তিরও চাহিদা হ্রাস পায়। সংকটের গুরুভার আরও বেশি করে অনুভব করে বহিরাগত শ্রমিকরা। প্রথমেই ছাঁটাই করা হয় তাদের, কারখানার গেটের বাইরে তাদের দূর করে দেওয়া হয়। যারা বর্ণবৈষম্যের শিকার হয়েছে, সংকটের সময় সেই শ্রেণীর শ্রমজীবীদের কাজ পাওয়া বস্তুতপক্ষে অসম্ভব। অতি উৎপাদনজনিত অর্থনৈতিক সংকটের কালে উৎপাদনক্ষমতার সদ্যবহার হয় না, দ্রব্যের উচ্চ মূল্য বজায় রাখার খাতিরে মানুষের শ্রমে তৈরি বিপুল পরিমাণ বৈষয়িক সম্পদ ধ্বংস করা হয়। বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের পরিস্থিতিতে গঠন-কাঠামোগত সংকটের দ্বারা অর্থনৈতিক সংকটের ধ্বংসাত্মক শক্তি তীব্র হয়ে ওঠে।

গঠনকাঠামোগত সংকটের প্রকাশস্বরূপ দেখা যায়

বৃদ্ধির হারের দীর্ঘকালীন হ্রাস, ঐতিহ্যমূলক শিল্পের বেশ কিছু শাখায় — লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, তৈল রসায়ন, মোটরগাড়ি নির্মাণ, ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে উৎপাদনের বন্ধাবস্থা বা সংকোচন। এই একই সঙ্গে আবার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি ত্বরান্বিত হওয়ার ফলে নতুন নতুন ষে-সমস্ত শিল্পশাখা দেখা দিয়েছে — যেনন রোবট নির্মাণ, ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি, পলিমার উৎপাদন, মহাকাশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদিতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

গঠনকাঠামোগত সংকট অতি উৎপাদনজনিত অর্থনৈতিক সংকটের মতো নয় — তা অবিরাম গতিতে চলতে থাকে। পুর্জিতন্ত্রে মানুষের শ্রমের উপর এর বিশেষ প্রভাব পড়ে, এর ফলে শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও বৃত্তি সংক্রান্ত প্রস্তুতির ভূমিকা বৃদ্ধি পায়। পুরনো শিল্পশাখাগুলিতে শ্রমিক ছিল বড় বেশি পরিমাণে একই ধরনের শ্রম-বিভাজন বাঁধা। তার শ্রম নিয়োগের জন্য তালিম ও প্রস্তুতির পেছনে অপেক্ষাকৃত কম সময় ব্যয় হত। নতুন শিল্পশাখাগুলিতে কাজ পেতে গেলে মজুরি শ্রমিকদের আরও বেশি দক্ষতার দরকার হয়, আরও বেশি পরিমাণে শিক্ষিত হতে হয় তাদের। এর জন্য দরকার হয় অর্থ ও সময়, যা তাদের মোটেই নেই। ঠিক এই কারণেই গঠনকাঠামোগত সংকট শ্রম ও পুর্জির মধ্যে বিরোধ তীব্র করে তোলে। এর ফলে শ্রেণী সংগ্রাম বৃদ্ধি পায়।

অর্থনীতি, রাজনীতি, ভাবাদর্শ — সমাজজীবনের

মূল ক্ষেত্রে শ্রেণী সংগ্রামের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। মজদুরি বৃদ্ধি, কর্ম-দিবসের হ্রাস, শ্রম পরিস্থিতির উন্নতি ইত্যাদির জন্য প্রলোভিত হয়ে অর্থনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা করে। ধর্মঘট, হরতাল, পিকিটিং ইত্যাদি হল অর্থনৈতিক সংগ্রামের উপায় ও কৌশল। সংগ্রামের রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত রূপগুলি আরও জটিল। সেই সংগ্রাম আমূল রাজনৈতিক পরিবর্তনের সংগ্রাম। অর্থনৈতিক সংগ্রামের অন্যতম ফল যদি হয় ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, তাহলে রাজনৈতিক সংগ্রামের ফল হল প্রলোভিত হয়ে উচ্চ পর্যায়ের শ্রেণী সংগঠন অর্থাৎ রাজনৈতিক পার্টি গড়ে তোলা।

অতএব বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের পরিস্থিতিতে একচেটিয়া পুঁজি শ্রম ও উৎপাদনের সামাজিকীকরণকে বিপুল আকার দিয়ে থাকে। সামাজিক সম্পদ ও শ্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ায় ধনকুবেরতন্ত্রের সংখ্যাল্পদল। এই পরিস্থিতিতে শ্রম ও পুঁজির বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে।

শ্রমের পুঁজিতান্ত্রিক রূপ সমাজের প্রধান উৎপাদিকা শক্তিরূপে মানুষের বিকাশের সঙ্গে আপসহীন বিরোধ হয়ে প্রকাশ পায়।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব মানুষের মানসিক ও শারীরিক দক্ষতা বিকাশের সুযোগ সন্তাবনা প্রশস্ত করে তোলে। কিন্তু শ্রমসংগঠনের পুঁজিতান্ত্রিক রূপ শ্রমে মানুষের আত্মপ্রকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

সমাজের উৎপাদিকা শক্তি বিকাশে মানুষের ভূমিকা বৃদ্ধির যে অবশ্যকতা আছে পুঁজির নিগড়ে বাঁধা শ্রমের

সঙ্গে তার সংঘর্ষ বাধে। যে সমাজ মানুষের বিকাশের
পরম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিস্বরূপ শ্রমের পথের এই বাধা
দূর করতে পারে না সে সমাজের অধঃপতন অনিবার্য।

শ্রমের পুঞ্জিতান্ত্রিক রূপের উচ্ছেদ যে কত দূর
আবশ্যক এ সব তারই সাক্ষ্য বহন করে। শ্রমের
পুঞ্জিতান্ত্রিক রূপের স্থান অধিকার করে শ্রমের শোষণ
মুক্ত সমাজতান্ত্রিক রূপ, যা মানুষের সর্বাঙ্গীণ
বিকাশের ভিত্তিস্বরূপ হয়ে আসছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সমাজতন্ত্রে শ্রম

১। সমাজতন্ত্রে শ্রমের চরিত্র

সমাজতন্ত্রে শ্রমের প্রধান রূপটি হল শ্রমের সামাজিক রূপ। তার সারগত বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ। এই শ্রম সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত। শ্রমিকবৃন্দ ও সমগ্র সমাজ উভয়কেই তা উপকৃত করে, এবং এর ভিত্তি হল সংঘাতমুক্ত, সাথীসুলভ পারস্পরিক সহায়তা ও সহযোগিতার নীতি। সমাজতন্ত্রে শ্রম হল সামাজিকীকৃত — এক পরিকল্পিত ধরনে, সমগ্র সমাজের পরিসরে উৎপাদনের ধারায়। শ্রমের সমাজতান্ত্রিক চরিত্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদ হল উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে উৎপাদনের উপায়ের সামাজিকীকরণ তৎক্ষণাৎ শ্রমের সর্বপ্রকার

পরকীরণ দূর করে না। প্রারম্ভিক পর্যায়ে, এই ধরনের সামাজিকীকরণই শ্রমের অন্তর্বস্তুতে আমূল পরিবর্তন ঘটায় না, কেননা এই পর্যায়ে, এই ধরনের সামাজিক শ্রম-বিভাজনের সঙ্গে তখনও জড়িত শ্রমিক সারগতভাবেই একজন আংশিক শ্রমিক। এই কারণটা রয়েছে এক দিকে উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশের স্তর ও অন্য দিকে, এই শক্তিগুণের সংগঠনের নতুন, প্রগতিশীল সামাজিক রূপ, এই দুয়ের মধ্যকার বিরোধের মধ্যে। একটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একজন আংশিক শ্রমিক হিসেবে ও উৎপাদনের উপায়ের একজন সহ-মালিক হিসেবে একই ব্যক্তির ভূমিকাগুলির মধ্যে বিরোধকে তৎক্ষণাৎ বিদূরিত করে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে এই বিরোধের নিষ্পত্তি হতে দীর্ঘ সময় লাগে।

গোড়ার পর্যায়গুলিতে, সমাজতন্ত্র নির্মাণের সঙ্গে জড়িত থাকে পুঁজিবাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির ব্যবহার। শ্রমের সামাজিক রূপের বিকাশ ঘটতে থাকার মধ্য দিয়েই শ্রমের অন্তর্বস্তু রূপান্তরিত হয় এবং সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি সৃষ্টি হয়।

সার্বজনিক সমাজতান্ত্রিক মালিকানা থেকে শ্রমজীবী মানুষের পরকীরণ হয় তখনই, যখন সমাজের তরফ থেকে এই মালিকানা বৃদ্ধির উপর, উৎপাদনের ফলাফল উপভোগনের উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে যায়, অর্থাৎ যখন সংকীর্ণ স্বার্থ,

আঞ্চলিকতা, সমানীকরণ, মদুখাপেক্ষা, দূর্নীতিতে তা
 ক্ষয়িত হয়। শ্রমসংগঠনে নেতিবাচক ঘটনা বিলুপ্ত
 হওয়ার এবং শ্রমের উৎপাদে শ্রমিকদের স্বার্থ বর্ধিত
 হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই পরকীকরণ দূরীভূত হয়।
 যত সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র, উন্মুক্ততা
 বাস্তবায়িত হয়, জাতীয় অর্থনীতির পরিচালনায় সব
 মেহনতিকে যত ব্যাপকভাবে টেনে আনা হয়, উৎপাদনের
 উপায়ের উপর সার্বজনিক সমাজতান্ত্রিক মালিকানা
 যত বেশি পরিমাণে পরিপক্ব হয় তত বেশি এই
 পরকীকরণ দূরীভূত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে
 উৎপাদনের উপায়ের উপরে সামাজিক মালিকানা দেখা
 দেয় দুটি প্রধানরূপে: রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি-মালিকানা
 (সার্বজনিক) ও সমবায়িক (ঘোঁথখামার) সম্পত্তি-
 মালিকানা।

সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি
 নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ,
 সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পে স্থায়ী উৎপাদন
 পরিসম্পদের ৯০ শতাংশ ও কৃষিতে স্থায়ী উৎপাদন
 পরিসম্পদের ৬০ শতাংশ হল রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি। অন্যান্য
 সমাজতান্ত্রিক দেশেও রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি মূল ভূমিকা
 পালন করে।

উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল উভয় ক্ষেত্রেই
 প্রধান প্রধান সমস্ত বন্দোবস্তই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি।

রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির (যার মালিক সমস্ত জনগণ) কথা
 বলার সময়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের দিকে

অঙ্গদলিনির্দেশ করা দরকার। প্রথম, রাষ্ট্র হল সমগ্র দেশের পরিসরে উৎপাদনের মূল গুরুত্বপূর্ণ উপায়সমূহের মালিক। দ্বিতীয়, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হল সমগ্র সমাজতান্ত্রিক সমাজেরই সম্পত্তি। তা হল সেই সমস্ত উৎপাদকের সম্পত্তি বারা মিলিত হয়েছে সমগ্র সমাজের পরিসরে এবং সংঘাতবাদের, পারস্পরিক সহায়তা ও সহযোগিতার নীতির ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে নিযুক্ত রয়েছে পরিকল্পিত উৎপাদনকর্মে।

সমবায়িক (যোথখামার) সম্পত্তি দেখা দিয়েছিল কৃষকরা তাদের জোতজমি স্বতঃপ্রণোদিতভাবে একত্র করার ফলে। বর্তমানে কৃষকদের যোথ সম্পত্তি অন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেও শক্তিশালী অবস্থান অর্জন করেছে। সমবায়ভুক্ত কৃষকদের বহু বছরের শ্রমের মধ্য দিয়ে যে-সমস্ত অ-বণ্টনযোগ্য পরিসম্পদ সৃষ্টি হয়েছে, কৃষকদের যোথ সম্পত্তির মেরুদণ্ড তাই দিয়েই গঠিত।

১৯৮৩ সালে, কৃষিতে সামগ্রিক পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যোথখামারগুলির অবদানের পরিমাণ ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে স্থায়ী কৃষি উৎপাদন পরিসম্পদের ৩২.৫ শতাংশ। সেই বছরে, যোথখামারগুলি উৎপন্ন করেছিল মোট কৃষি উৎপাদনের ৪৮ শতাংশ ও কৃষি পণ্য উৎপাদের ৩৯ শতাংশ। যোথখামারগুলি ফসলচাষের এলাকার ৪৬ শতাংশ চাষ করে এবং কর্মে নিযুক্ত করে ১,২৯,০০,০০০ লোককে, অর্থাৎ কৃষিতে নিযুক্ত লোকসংখ্যার ৫২ শতাংশকে।

সম্পত্তি-মালিকানার দুটি রূপের যে-সমস্ত অভিন্ন

বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য আছে, সমাজতন্ত্রে শ্রমের চরিত্রের মধ্যে সেই দুটিরই প্রতিফলন ঘটে। অভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে আছে অপরের শ্রম শোষণ না করা এবং এই ঘটনাটা যে শ্রমের ভিত্তি হল সংঘাত্তিয়াবাদ, সাথীসদৃশ সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তা। পার্থক্যগুলি প্রকাশ পায় শ্রমের ও শ্রমের উৎপাদটির প্রণালীবদ্ধ সামাজিকীকরণের মাত্রার মধ্যে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন উদ্যোগগুলিতে খোদ সমাজই শ্রমিকদের শ্রমের তত্ত্বাবধান করে, এবং তাই আবশ্যকীয় ও উদ্ভূত উৎপাদগুলি সমগ্র জনগণের সম্পত্তি। যৌথখামারগুলিতে, শ্রমের একটা অংশ ব্যয়িত হয় যৌথখামারিদের নিজস্ব সহায়ক জমিতে। যৌথ শ্রমের উৎপাদটি এক একটি যৌথখামারের অথবা যৌথখামারগুলির গোষ্ঠীর সম্পত্তি। আবশ্যকীয় ও উদ্ভূত উৎপাদগুলি সমগ্র সমাজের নয় বরং সেই কর্মসংঘটির সম্পত্তি।

উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমাজতান্ত্রিক সামাজিক মালিকানার দুটি রূপ শ্রেণীগুলির মধ্যকার প্রভেদকে প্রতিফলিত করে। সামাজিক শ্রম-প্রক্রিয়ায় শ্রমিকরা যেখানে রাষ্ট্রীয় (সার্বজনিক) মালিকানাধীন উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, সেখানে যৌথখামারীরা যে উৎপাদনের উপায় ব্যবহার করে, সেগুলির মালিক হল যৌথখামারগুলি। সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় দুটি শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা এবং তাদের আয়ের পরিমাণ ও রূপে পার্থক্য এখান থেকেই আসে।

গত কয়েক বছরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে সমবায়-যৌথখামারী মালিকানা ও গ্রামাঞ্চলে মানুষের ক্রিয়াকলাপে তার ভূমিকার গুরুত্ব বেড়ে ওঠার সঙ্গে সম্পর্কিত গভীর পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। এর একটিমাত্র উদ্দেশ্য: যৌথখামারী মালিকানার সহ-মালিক হিসেবে চাষীদের কর্মিদলগদলিতে তাদের মিলিত শ্রমের ফলাফলের প্রতি আগ্রহ উন্নত করা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য শুদ্ধ উৎপাদিকা শক্তিতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটানো নয়, গ্রামাঞ্চলে উৎপাদন সম্পর্কের উৎকর্ষসাধন করাও প্রয়োজন।

পের্ট-বুর্জোয়া মনস্তত্ত্ববিশিষ্ট সাম্প্রতিক ব্যক্তিগত কৃষকের জীবনযাত্রা পুনর্সংগঠনের বিরাট কাজে ব্যক্তিগত মালিকানার সামাজিকীকরণের ভিত্তিতে মিলিত শ্রমের উপযুক্ত রূপগদলি খোঁজ করা দরকার। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, যে কোনো তাড়াহুড়ো ও অতিরিক্ত এগিয়ে যাওয়া এবং এই সব সমস্যার ইচ্ছামূলক, আমলাতান্ত্রিক সমাধান করার ফলে সেই সব কৃষকের কৃত্রিম অর্থনৈতিক সিম্বলন দেখা দেয়, যাদের যৌথখামারী-সমবায়ী মালিকানা বাস্তবায়নে কোনোই স্বার্থ নেই।

সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমসংগঠনের যৌথ রূপগদলির উৎকর্ষসাধন করার কাজে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে: দলগত ও পরিবারগত চুক্তি অনুযায়ী কাজ করা এবং লাভ-লোকসানের সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক হিসাব ও আত্মব্যয়পূরণ ব্যবস্থায় যৌথখামারগদলির উত্তরণ

চালানো হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে সম্মিলিত শ্রমের রূপগুলির পুনর্সংগঠন চালানো হচ্ছে, বিলুপ্ত করা হচ্ছে শ্রমের পরকীকরণ সৃষ্টিকারী বাধাগুলি, দৃষ্টান্তস্বরূপ, জমি, ফসল ও উৎপন্ন করা কাজের প্রতি যত্নের অভাব। যৌথখামারী-সমবায়ী মালিকানার সহ-মালিক হিশেবে কৃষকের স্বার্থের সঙ্গে গ্রামের সমাজতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত।

ভোক্তা সমবায়গুলির সম্পত্তি হল যৌথখামার-সমবায় সম্পত্তির এক বিশেষ রূপ। যৌথখামারগুলির বিপরীতে, ভোক্তা সমবায়গুলি কাজ করে গ্রামীণ ও নাগরিক উভয় এলাকাতেই, তারা তাদের সেবা ও কৃত্যক শৃঙ্খল যৌথখামারীদেরই নয় সমাজতান্ত্রিক সমাজের অন্যান্য সদস্যকেও নিবেদন করে।

বাণিজ্য, সার্বজনিক আহার্য পরিবেশন, জনসমষ্টি ও শিল্পের জন্য কৃষি উৎপাদ সংগ্রহ, প্রভৃতিতে ভোক্তা সমবায় একটি বড় ভূমিকা পালন করে। ভোক্তা সমবায়গুলি বহু-শাখায়িত কাজকর্ম গ্রামাঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপকে সম্প্রসারিত করে। সামাজিক ভূমিকার দিক দিয়ে, ভোক্তা সমবায়গুলির সদস্যরা যৌথখামারীদের তুলনায় শিল্প শ্রমিক ও অফিস কর্মীদের বেশি কাছাকাছি।

ভোক্তা সমবায়গুলির তহবিল গ্রামাঞ্চলে সামাজিক বিকাশের জন্য বরাদ্দ করা হয়। এই সমস্ত পরিসম্পদ ব্যবহৃত হয় গ্রামাঞ্চলে জনসম্প্রদায়গত, সাংস্কৃতিক ও চিকিৎসাগত কৃত্যকের উন্নয়নে অর্থ যোগানোর জন্য, কমবয়সী ছেলেমেয়েদের উচ্চতর ও বিশেষীকৃত

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পাঠানোর জন্য, প্রাক-
 স্কুল শিশু-পরিচর্যা কেন্দ্র, পাইওনীর শিবির,
 স্যানাটোরিয়াম, অবকাশ ভবন ও বাসগৃহ নির্মাণের
 জন্য।

সম্পত্তি-মালিকানার দুটি রূপের — রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি
 ও যৌথখামার-সমবায়িক সম্পত্তির ঐক্য শ্রম-
 বিভাজনের সামাজিক-শ্রেণীগত বনিয়াদে বৈরভাবগুলি
 দূর করে — পুঞ্জিবাদে যে বৈরভাবগুলির অস্তিত্ব
 ছিল। সমাজতন্ত্রে শ্রম-বিভাজন বিবেচনা করা যাক।

উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমাজতান্ত্রিক
 মালিকানা শ্রম-বিভাজনের ভিত্তি হিশেবে শোষণকে
 নিশ্চিহ্ন করে। শ্রম-বিভাজন ধারণ করে শোষণমুক্ত
 জনগণের মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তার
 রূপ। সমাজতন্ত্রে, শ্রম-বিভাজন থাকে গোটা সমাজ
 জুড়ে এবং একক উদ্যোগগুলির অভ্যন্তরে। সামাজিক
 শ্রম-বিভাজন বলতে যা বোঝায় তা হল জাতীয়
 অর্থনীতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে (দৃষ্টান্তস্বরূপ,
 মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের
 মধ্যে) এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শ্রম-বিভাজন।
 উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা
 প্রত্যেক অঞ্চলে শ্রমের সর্বাঙ্গিক বিকাশের অবস্থা সৃষ্টি
 করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিসমূহ তাদের
 অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে যে-সমস্ত
 সাফল্য অর্জন করেছে, তার দ্বারাই এটা প্রতিপন্ন হয়।
 এক সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক কালপর্বের মধ্যে আগেকার
 পশ্চাৎপদ প্রত্যন্ত জেলাগুলিতে নিরক্ষরতার অবসান

ঘটিয়ে অবৈতনিক জনশিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছিল। শিল্পায়ন শিল্প ও কৃষির মধ্যে শ্রম বণ্টনের ক্ষেত্রে গভীর পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। দেখা দিয়েছিল অর্থনীতির এমন সব নতুন শাখা, যেখানে কর্মে নিযুক্ত হয় অত্যন্ত দক্ষ উৎপাদন শ্রমিক, ইঞ্জিনিয়ার, কৃৎকুশলী ও অন্যান্য কর্মচারী।

সমাজতন্ত্রে শ্রম-বিভাজন সংসাধিত হয় পরিকল্পিত ভিত্তিতে। তাতে প্রকান্ড সুফল দেখা দেয় এবং পুঁজি বিনিয়োগ আর সমাজের বৈষয়িক, জনশক্তি ও আর্থিক সম্পদের যুক্তিসহ ব্যবহারের অবস্থা সৃষ্টি হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে, শ্রম-বিভাজন হয় পাঁচসাল্য এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ পরিকল্পনার ভিত্তিতে। অর্থনীতিতে গঠনকাঠামোগত পরিবর্তনকে একটা প্রণালীবদ্ধ, পরিকল্পিত চরিত্র দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, পুরনো শিল্পগড়ুলিতে কাজের সংখ্যা কমানো হয় এবং নতুন শিল্পগড়ুলিতে (যেখানে পরিশীলিত যন্ত্রপাতি আর অগ্রসর প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়) বাড়ানো হয়। বিশাল বিশাল অঞ্চলের বিকাশ ঘটানো হয় পরিকল্পিতভাবে।

শ্রমের সামাজিক রূপ শিল্পোদ্যোগগুলির অভ্যন্তরে শ্রম-বিভাজনে পরিবর্তন ঘটায় এবং বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশার লোকেদের মধ্যে শ্রম-বিভাজনেও পরিবর্তন ঘটায়।

শ্রম-বিভাজন জনগণের বিকাশের সহায়ক হয়, তাদের জ্ঞান বাড়ায় এবং তাদের কর্মদক্ষতা উন্নত করে। সেই

সঙ্গে লোকে যদি একই ধরনের সামাজিক শ্রম-বিভাজনে সংলগ্ন থাকে, তাহলে তাদের সামর্থ্যের বিকাশ প্রতিহত হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। এক ধরনের শ্রমে শ্রমিকদের সংলগ্নতা দূরীভূত হলে তাদের শ্রম ক্রিয়াকলাপের এলাকা প্রসারিত হয় এবং তাদের কাজ হয়ে ওঠে আরও বিচিত্রমুখী, উপভোগ্য ও প্রীতিকর।

সমাজতন্ত্রে সকলেরই নিজেদের জ্ঞান বাড়ানোর, কর্মদক্ষতা উন্নত করার ও শিক্ষা বাড়ানোর সুযোগ আছে। গত ২৫ বছরে সোভিয়েত ইউনিয়নে এক্ষেত্রে গভীর পরিবর্তন ঘটেছে: গত ১৯৬০ সালে যেখানে জাতীয় অর্থনীতিতে নিযুক্ত সমস্ত কর্মীদের শূন্য ২০ শতাংশ মানুষ স্থায়ী বৃত্তি-প্রশিক্ষণ স্কুলে কিংবা উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষালয়ে পেশাগত প্রশিক্ষণ লাভ করেছে, সেখানে ১৯৮৫ সালে অনুরূপ কর্মীদের সংখ্যা ৫০ শতাংশের কাছাকাছি হয়েছে। বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের পরিস্থিতিতে সুদক্ষ শ্রমের ভূমিকা বৃদ্ধি পাবে, এ কথা মনে রেখে পেশাগত প্রস্তুতির মান বাড়ানোর জন্য ক্রমবর্ধমান মনোযোগ দেওয়া হয়।

সমাজতন্ত্রের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে নতুন এক ধরনের শ্রমিক যে একই ধরনের সামাজিক শ্রম-বিভাজনের সঙ্গে একটা স্থায়ী সংলগ্নতা থেকে মুক্ত। শ্রমিক আর একটি আংশিক শ্রমিক থাকবে না। শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে, মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে সামাজিক-

অর্থনৈতিক প্রভেদ কাটিয়ে ওঠার জন্য তা সৃষ্টি করবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদবশর্ত।

সমাজতন্ত্রে এই প্রভেদগুলি কাটিয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটা বিবেচনা করা যাক।

উৎপাদনের উপায়ের সামাজিকীকরণ সম্পর্কে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে বৈপরীত্য বিদ্যুত করে। কিন্তু, সমাজতন্ত্রে শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যে শ্রম-বিভাজনে সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভেদগুলি তখনও টিকে থাকে।

এই সমস্ত প্রভেদ দেখা দেয় শিল্প ও কৃষি শ্রমের মধ্যে সারগত পার্থক্য থেকে। কৃষিতে শ্রমের ফলাফল অনেকাংশে প্রভাবিত হয় জলবায়ু ও অন্যান্য বিষয় দিয়ে। কৃষি শ্রমের তুলনায় শিল্প শ্রমে যন্ত্রপাতি প্রয়োগের পরিধির ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এপর্যন্ত কৃষি ক্ষেত্রে কায়িক শ্রমের প্রাধান্য দেখা যায়। গ্রামে লোকে একই ধরনের শ্রম-বিভাজনে সংलग्न থাকে শহরের লোকেদের চেয়ে বেশি পরিমাণে। তাদের শ্রমের প্রয়োগ কৃষির বিভিন্ন শাখার মধ্যে সীমিত।

সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক যখন গড়ে ওঠার অবস্থায় ছিল তখন এই সমস্ত সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভেদ কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টা জড়িত ছিল উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে।

শহর ও গ্রামের মধ্যে সামাজিক শ্রম-বিভাজনের পুরনো রূপগুলি দূরীকরণের এবং কৃষির শিল্পায়নের পদবশর্তগুলি সৃষ্টি করলেও পুঁজিবাদ যে অর্থনৈতিক

বিষয়টি নগরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যকার বৈপরীত্যকে স্থায়ী করে রাখে, সেই উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা কে বিদূরিত করে না। শহর ও গ্রামের মধ্যকার যে-সমস্ত তাৎপর্যপূর্ণ প্রভেদ জের হিশেবে চলে আসে সমাজতন্ত্রের মধ্যেও, সেগুলি দূর করা হয় শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে আগেকার শ্রম-বিভাজনের রেশ কাটিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমিক ও যোঁথখামারীদের মধ্যে শ্রেণীগত প্রভেদ কাটিয়ে ওঠা, এবং গ্রামীণ ও নাগরিক জনসমষ্টির সাংস্কৃতিক বিকাশের স্তর ও জীবনযাপন শৈলীর মধ্যকার ব্যবধান কাটিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে।

সমাজতন্ত্র যখন নির্মিত হয়, তখন শ্রমিকদের শ্রম আর যোঁথখামারীদের শ্রমের মধ্যকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভেদগুলি উৎপাদনের উপায়ের সমাজতান্ত্রিক সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়কে প্রতিবিম্বিত করে। শ্রমিকদের ব্যবহৃত উৎপাদনের উপায়ের মালিক হল রাষ্ট্র (অর্থাৎ সমস্ত জনগণ), পক্ষান্তরে যোঁথখামারীরা যে উৎপাদনের উপায় ব্যবহার করে সেগুলি হল তাদের যোঁথ সম্পত্তির অংশ। তা হলেও, শহর ও গ্রামবাসীদের শ্রমের মধ্যে অনেক মিল আছে, কেননা তার ভিত্তি হল সংঘর্ষবাদ, সাথীসূলভ সহায়তা ও সহযোগিতা।

উৎপাদনের উপায় সামাজিকীকরণের সমাজতান্ত্রিক ধরনটি মানসিক ও কার্যিক শ্রমের মধ্যে বিরোধিতা দূর করে।

অতীতের সমাজে, মানুষের সমস্ত কর্মশক্তি ও

উদ্ভাবনী দক্ষতা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে প্রযুক্ত হইয়াছিল
মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য সমস্ত সাংস্কৃতিক ও
প্রযুক্তিগত সুফলগুলি দখল করে ব্যাপক জনসাধারণকে
শিক্ষা ও বিকাশের সুযোগের মতো বুনিয়াদি প্রয়োজন
থেকে বঞ্চিত করে রাখার জন্য। সমাজতন্ত্র সংস্কৃতি
ও প্রযুক্তির অর্জনগুলিকে সমস্ত জনগণের কাছে
লভ্য করে তুলেছে।

মানসিক শ্রমে যারা নিযুক্ত এবং যারা কার্যিক শ্রম
করে এই দুয়ের মধ্যকার সামাজিক-অর্থনৈতিক
প্রভেদগুলি সমাজতন্ত্র তৎক্ষণাৎ দূর করে না।
মস্তিস্কের কাজ করা কর্মী আর হাতে কাজ করা
শ্রমিকের মধ্যকার প্রভেদটা আসে তারা সামাজিক
উৎপাদনের ব্যবস্থায় যে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া সম্পন্ন করে
এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থান অধিকার করে, সেখান থেকে।
শিল্প শ্রমিক ও ঘোঁষামারের কৃষকরা প্রধানত কর্মে
নিযুক্ত বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্রে এবং তারা কার্যিক
শ্রমে ব্যাপ্ত। তাদেরটা হল 'কাজ করিয়ার' কাজ।
বুদ্ধিজীবীরা নিযুক্ত আছে মানসিক শ্রমে। বিজ্ঞান,
কলা, সাহিত্য, প্রভৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা কাজ করে।
তারা যে সাংগঠনিক ও সৃষ্টিশীল ক্রিয়া সম্পন্ন করে
তাই দিয়েই নির্ধারিত হয় তাদের শ্রমের অন্তর্বস্তু।

প্রধানত মানসিক শ্রমে নিযুক্ত শ্রমিক আর প্রধানত
কার্যিক শ্রমে জড়িত শ্রমিকদের মধ্যে প্রভেদগুলি
তাদের শ্রমের অন্তর্বস্তুর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে এবং মানসিক ও কার্যিক
শ্রমের মধ্যে পার্থক্যগুলি দূরীকরণ শ্রমের সামাজিক

রূপে নতুন নতুন প্রলক্ষণ ক্রমবিকাশিত হওয়ার পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে। উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা নিজের জন্য শ্রম আর সমাজের জন্য শ্রম — এই দুই ধরনের শ্রম-বিভাজনের অবস্থা সৃষ্টি করে।

নিজের জন্য শ্রম হল বৈষয়িক সম্পদ ও কৃত্যক উৎপন্ন করার জন্য ব্যয়িত সামাজিক শ্রমের অংশ, কর্ম-প্রক্রিয়ার প্রত্যেকের নিজস্ব অবদানের অনুপাতে পরে সেগগুলি শ্রমিকদের মধ্যে বন্টিত হয়। ভাষান্তরে, শ্রমিকদের মজুরি দিয়ে যা ক্রয় করা যায়, সে সবার মধ্যেই মদূর্তরূপ লাভ করে নিজের জন্য শ্রম।

সমাজের উপকারের জন্য শ্রম সামগ্রিকভাবে সমাজের চাহিদা পূরণের জন্য ব্যবহৃত সূক্ষ্মগুলি সৃষ্টি করে। তার ফলগুলিকে তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথমটি গঠন করে সামাজিক ভোগ তহবিল, শ্রমিকরা যা ব্যবহার করে হয় বিনামূল্যে, না হয় অগ্রাধিকারমূলক শর্তে (স্কুল, পলিক্লিনিক, হাসপাতাল, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদি)। দ্বিতীয় অংশটি উৎপাদন সম্প্রসারিত করার কাজে লাগে, অর্থাৎ নতুন নতুন কারখানা বা রাস্তা নির্মাণ, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ ইত্যাদি। তৃতীয় অংশটি গঠন করে সমাজের সংরক্ষিত তহবিল, যার মধ্যে থাকে উৎপাদনের উপায় ও ভোগের সামগ্রী, যেগুলি ব্যবহৃত হয় শুধু জরুরি অবস্থায় (প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য অদৃষ্টপূর্ব পরিস্থিতিতে)।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, সমস্ত শ্রম সমাজের সদস্যদের উপকার করে বলে, নিজের জন্য শ্রম আর সমাজের জন্য

শ্রমের মধ্যে কোনো বৈরমূলক বিরোধ থাকে না। নিজস্ব, যৌথ ও সমগ্র জনগণের স্বার্থ একটি অপরিচিত বিরোধী নয়।

অর্থনৈতিক স্বার্থগুলির সামগ্রিকতায়, প্রাধান্যশালী ভূমিকা পালন করে সেই সমস্ত স্বার্থ যেগুলি উদ্ভূত হয় উৎপাদনের উপায়ের উপরে সার্বজনিক মালিকানা থেকে। সমাজ, রাষ্ট্র হিশেবে কাজ করে, উৎপাদন সংগঠিত করে। সুতরাং যেটা সর্বজনীন স্বার্থানুগ, সেটা সমগ্র জনগণের ও সমগ্রভাবে রাষ্ট্রেরও স্বার্থানুগ। তা হল সমাজতান্ত্রিক সমাজের সমস্ত সামাজিক গোষ্ঠী, স্তর, শ্রেণীর ও প্রত্যেক মানুষের স্বার্থ। অন্য সমস্ত স্বার্থ রূপ পরিগ্রহ করে সমগ্র জনগণের স্বার্থের নির্ণায়ক প্রভাবে।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে ও স্বতই এই সমস্ত স্বার্থের মিলন ঘটানোর জন্য যে সব অবস্থা প্রয়োজন, উৎপাদনের উপায় সামাজিকীকরণের সমাজতান্ত্রিক ধরনটি তৎক্ষণাৎই সেগুলি সৃষ্টি করে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজতন্ত্র নির্মাণের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে এর জন্য দরকার এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক কালপর্ব এবং সমাজের পরিপক্বতার প্রতিটি ধাপের সঙ্গে মানানসই এক প্রস্তুত উপায়-পদ্ধতির প্রয়োগ। স্বার্থের আনুষ্ঠানিক মিলনের প্রকৃত মিলে রূপান্তরিত হওয়াটা এক জটিল প্রক্রিয়া, তা এক মূখ্য মৌল চাহিদা হিশেবে শ্রমের প্রতি কমিউনিস্টসুলভ মনোভাবের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে

যুক্ত, এবং প্রশাসনিক ও শ্রম নিয়মানুবর্তিতা কঠোরভাবে মেনে চলা ও রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনাগুলি পূরণ করার সঙ্গে যুক্ত।

সমাজের অর্থনৈতিক স্বার্থ আর তার সমস্ত সদস্যের অর্থনৈতিক স্বার্থের ঐক্য বলতে এটা বোঝা উচিত নয় যে সমাজতন্ত্রে স্থান আছে শুধু সমগ্র দেশের স্বার্থেরই, যা ন্যাকি য়োথ (সমষ্টিগত) স্বার্থ বা নিজস্ব স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ বা প্রতিহত করে।

যোথ স্বার্থ বলতে যা বোঝায় তা হল সর্বোপরি কর্ম-সংঘগুলির স্বার্থ। যোথ স্বার্থ উদ্ভূত হয় বিভিন্ন উদ্যোগ বা উৎপাদন পরিমেলের আপেক্ষিক অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতা থেকে। এই বিচ্ছিন্নতার কারণ এই যে উৎপাদনের উপায়ের মালিক সমগ্র জনগণ হলেও, সেগুলির বিলিবন্দেশ করে এক একটি আলাদা উদ্যোগ।

নিজস্ব স্বার্থ উদ্ভূত হয় ভোগের সামগ্রী ও উৎপাদনের কিছু উপায়ের উপরে নিজস্ব মালিকানা থেকে, এবং ব্যক্তিমানুষটির সন্নিবিষ্ট চাহিদা থেকে। নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বার্থ আর জীবনযাপন প্রণালীর মধ্যে এক অচ্ছেদ্য যোগসূত্র থাকে। তাই, নিজস্ব স্বার্থের সমস্যাটাকে বৈষয়িক সম্পদ বণ্টনের সমস্যায় পর্যবসিত করা কখনোই উচিত নয়। সমাজতন্ত্রে শ্রম যে বিশেষ ভূমিকা পালন করে তাই থেকে, অর্থাৎ কাজ-অভিমুখী সমাজতান্ত্রিক জীবনযাত্রা প্রণালী থেকে নিজস্ব স্বার্থ উদ্ভূত হয়। সমাজতান্ত্রিক বণ্টন ব্যবস্থা, জীবনের অবস্থা, বিশ্রাম ও অবসরবিনোদনের সুযোগ,

প্রভৃতির সঙ্গে সেই সমস্ত স্বার্থ যুক্ত। সমাজতন্ত্র নিজস্ব স্বার্থকে শ্রমশক্তির পুনরুৎপাদনের গন্ডির বাইরে প্রসারিত করে, এবং তাকে কেন্দ্রীভূত করে ব্যক্তিমানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের অবস্থা সৃষ্টির দিকে।

কর্ম-সংঘগুণিলর সদস্যদের স্বার্থ ও সামগ্রিকভাবে সমাজের স্বার্থের সাযুজ্য অনেকাংশে নির্ধারিত হয় সমাজের সদস্যদের মধ্যকার সেই সমস্ত সম্পর্ক দিয়ে, যেগুলি আবশ্যকীয় শ্রম ও উদ্বৃত্ত শ্রমে শ্রমের বিভাজন থেকে উদ্ভূত হয়। সমাজতন্ত্র এই বিভাজনকে বিদূরিত করে না বটে, কিন্তু আবশ্যকীয় শ্রম ও উদ্বৃত্ত শ্রম উভয়কেই একটা নতুন অর্থ দেয়। সমাজতন্ত্রে আবশ্যকীয় শ্রম ও উদ্বৃত্ত শ্রমের নতুন অন্তর্বস্তু বিবেচনা করা যাক।

পুঞ্জিবাদে আবশ্যকীয় শ্রম ও উদ্বৃত্ত শ্রমে শ্রমের বিভাজন মজদুরি শ্রম শোষণের সঙ্গে এবং শ্রমশক্তি দ্রুত ও বিক্রয়ের সঙ্গে যুক্ত।

প্রতিতুলনায়, সমাজতন্ত্রে আবশ্যকীয় শ্রম ও উদ্বৃত্ত শ্রমের মধ্যে (অর্থাৎ নিজের জন্য শ্রম ও সমাজের জন্য শ্রমের মধ্যে) কোনো বৈরভাব নেই, যদিও শ্রমের এই দুটি রূপ মানুষের বিকাশের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে। শ্রমজীবী জনগণ মজদুরির মধ্য দিয়ে আবশ্যকীয় উৎপাদের বৃহত্তর অংশটা পায়। বাকিটা তারা পায় সামাজিক ভোগ তহবিল থেকে বিভিন্ন প্রাপ্তি ও অন্যান্য উপকারের রূপে (বিনা ব্যয়ে শিক্ষা ও চিকিৎসা, ছাত্র-অনুদান, শিশু-পরিচর্যা

কেন্দ্রগুলিতে শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের ভরতুকি প্রাপ্ত ব্যবস্থা ইত্যাদি)।

উদ্বৃত্ত শ্রম হল সেই শ্রম যা সৃষ্টি করে উদ্বৃত্ত উৎপাদ, সেটাই হল সমাজের জন্য উদ্দিষ্ট উৎপাদের বেশ বড় একটা অংশ (তা ব্যবহৃত হয় সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের নিরন্তর বৃদ্ধি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য, সংরক্ষিত পরিসম্পদ পরিপূরণ করার জন্য, দেশের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য, প্রশাসনিক সংস্থাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য)। উদ্বৃত্ত উৎপাদ ব্যবহৃত হয় সমাজের সকল সদস্যের স্বার্থে।

সমাজতন্ত্রে আবশ্যিকীয় শ্রম ও উদ্বৃত্ত শ্রম ঘনিষ্ঠভাবে আন্তঃসম্পর্কিত। উদ্বৃত্ত শ্রম সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের বিকাশকে নিশ্চিত করে এবং তাই আবশ্যিকীয় উৎপাদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা যোগায় এবং ফলত, বৃহত্তর পরিসরে জনগণের চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা যোগায়। আবার আবশ্যিকীয় শ্রম, তার দিক দিয়ে উদ্বৃত্ত উৎপাদের সম্প্রসারণের একটি পূর্বশর্ত। শ্রমের অন্তর্নিহিত উপাদান — শিক্ষা, দক্ষতা ও সৃষ্টিশীল উদ্যোগ বেড়ে যাওয়ার ফলে শ্রমিকরা সময়ের একক পিছু আরও বেশি পরিমাণ উদ্বৃত্ত উৎপাদ সৃষ্টি করে।

সমাজতন্ত্রে আবশ্যিকীয় উৎপাদ ও উদ্বৃত্ত উৎপাদের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্কের ফলে উৎপাদনশীল ও ব্যক্তিগত ভোগের মধ্যে বৈরমূলক বিরোধ দূরীভূত হয়।

পুঁজিবাদে ব্যক্তিগত ভোগকে দেখা হয় পুঁজি কর্তৃক শ্রমশক্তির উৎপাদনশীল ভোগের একটি শর্ত হিসেবে — শুধু ততদূর পর্যন্তই যাতে শ্রমিক তার ব্যক্তিগত ভোগের মধ্য দিয়ে নিজেকে ভরণপোষণ করতে পারে ও শ্রমশক্তি হিসেবে নিজেকে পুনরুৎপন্ন করতে পারে। এই সমস্যাটা পুঁজিপতি শ্রমিকদের হাতেই ছেড়ে দেয়। তার একমাত্র ভাবনা হল শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ভোগকে শ্রমশক্তির অব্যাহত পুনরুৎপাদনের জন্য বা অত্যাवश्यक, যথাসম্ভব ততখানি সীমিত করে রাখা। প্রতিতুলনায়, সমাজতান্ত্রিক সমাজে, শ্রমজীবী মানুষ যেখানে মুক্ত, সেখানে উৎপাদনশীল ভোগ হল নিজস্ব ভোগ বাড়ানোর একটি উপায়।

সমাজতন্ত্রে শ্রম-সময় নির্ধারিত হয় আবশ্যিকীয় ও উদ্ধৃত শ্রমের সামাজিক রূপ দিয়ে। সমাজতন্ত্রে শ্রম-সময়ের সমস্যা এবং যে বিষয়গুলি সমাজতান্ত্রিক সমাজে কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্যকে প্রভাবিত করে, সেগুলি বিবেচনা করা যাক।

সমাজতন্ত্রে শ্রম তখন পর্যন্ত জনগণের মুখ্য, মৌল চাহিদার পরিণত হয় না। সেই জন্যই জনগণের কাজ করার অধিকার কাজ করার সর্বজনীন বাধ্যবাধকতার সঙ্গে মেলানো। পুঁজিবাদে, কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য স্থির হয় শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের মধ্যে একটি শ্রেণী সংগ্রামের প্রক্রিয়ায়। প্রতিতুলনায়, সমাজতন্ত্রে কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য কর্ম-সংঘগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণে রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত আইনবলে স্থিরীকৃত হয়। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নে, কর্ম-সংঘসমূহ

বিষয়ক আইন অনুযায়ী, ব্যবস্থাপক কর্তৃপক্ষ ও ট্রেড ইউনিয়ন কমিটি কর্ম-সংঘর্ষগুলির বিবেচনার জন্য আভ্যন্তরীণ কাজের যে-সমস্ত নিয়মকানুন পেশ করে, কর্ম-সংঘর্ষগুলি তা অনুমোদন করে। কর্ম-সংঘর্ষগুলি এই সমস্ত নিয়মকানুন যাতে পালন করা হয় সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং নিয়মানুযায়িতা সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা নেয়।

অনুরূপভাবে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্ম-সপ্তাহের দৈর্ঘ্য ও ছুটির মেয়াদ স্থির করে। সমস্ত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ও দেশের সমস্ত অঞ্চলে রাষ্ট্রীয় শ্রম-নীতির প্রয়োগ তাই নিশ্চিত হয়। এই সমস্ত নীতির কোনোরূপ লঙ্ঘন এমন কি যদি শ্রমিকরা ও ব্যবস্থাপক কর্তৃপক্ষ একমত হয়ে তা স্থির করে থাকে তাহলেও, অমার্জনীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ওভারটাইমের অনুমতি দেওয়া হয় শ্রম বিষয়ক বিধানে যার সংস্থান আছে এমন ব্যতিক্রমমূলক ক্ষেত্রেই।

ব্যবস্থাপক কর্তৃপক্ষ কর্ম-দিবসের কাঠামোর ভিতর শ্রম-সময় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, অর্থাৎ, কর্ম-দিবসের শুরুর ও শেষ, দ্বিপ্রাহারিক ভোজনের অবসর ও শিফটগুলির সময় ও মেয়াদ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। ব্যবস্থাপক কর্তৃপক্ষ এই সমস্ত বিষয় সম্পর্কেই সিদ্ধান্ত নেয় ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা করে।

বৈশিষ্ট্য ভাগ সমাজতান্ত্রিক দেশেই কর্ম-দিবস হল আট ঘণ্টার এবং কর্ম-সপ্তাহ পাঁচ দিনের (সোভিয়েত ইউনিয়নে কর্ম-সপ্তাহ হল ৪১ ঘণ্টার)।

কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য স্থির করার সময়ে কাজের অবস্থাকে গণ্য করা হয়। ক্ষতিকর ও কঠোর শ্রমসাধ্য কাজের ক্ষেত্রে কর্ম-দিবস হ্রস্বতর হয়।

সমাজতন্ত্রে আবশ্যকীয় ও উদ্ভূত সময়ে কর্ম-দিবসের বিভাজন বজায় রাখা হয়। সমাজের উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশের স্তর নিজস্ব চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যয়িত শ্রম আর সামাজিক চাহিদা মেটানোর জন্য ব্যয়িত শ্রমের মধ্যে শ্রম-বিভাজনকে পূর্বাধিনির্ধারিত করে। নিজস্ব চাহিদা বলতে প্রত্যেক শ্রমিকের জীবনধারণের উপায়ের জন্য যেটা চাহিদা, তাকে বোঝায়। সামাজিক চাহিদা হল সমাজের একজন সদস্য হিসেবে শ্রমিকের চাহিদাগুলি (উৎপাদনী ও অ-উৎপাদনী ইমারত-ব্যবস্থাদি নির্মাণ করা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি চালু করা, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, প্রভৃতির প্রয়োজন)। আবশ্যকীয় ও উদ্ভূত শ্রম-সময়ে কর্ম-দিবসের বিভাজনে কোনো আপসহীন বিরোধ দেখা দেয় না, কারণ গোটা কর্ম-দিবস জুড়ে লোকে কাজ করে নিজেদের জন্য তথা তারা যে সমাজে বাস করে তার কল্যাণের জন্যও।

শ্রম-সময়ের যুক্তিসহ ব্যবহার করা এবং এক দিকে কাজের মেয়াদ, উৎপাদনশীলতা ও নিবিড়তা ও অন্য দিকে কাজের জন্য পারিশ্রমিক এই দুইয়ের মধ্যে একটা উপযুক্ত পরস্পরসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার সামগ্রিকভাবে সমাজ ও প্রত্যেক একক শ্রমিকেরই স্বার্থ থাকে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রম নিয়মানুবর্তিতা সুদৃঢ় করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

শ্রম-সময়ের যুক্তিসহ ব্যবহার অনেকখানি নিশ্চিত করা হয় শ্রম-সময়ের ক্ষতি কমিয়ে এবং প্রত্যেক শিফটে কাজের গতিছন্দ উন্নত করে। শ্রমের বিজ্ঞানসম্মত সংগঠন, কঠোর প্রযুক্তিগত নিয়মানুবর্তিতা ও প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সরঞ্জামাদির অব্যাহত যোগান শ্রম-সময়ের যুক্তিসহ ব্যবহার নিশ্চিত করার এক কার্যকর উপায়।

কাজের সময় আর কাজের সময় নয় এই দুইয়ের মধ্যে পরস্পরসম্পর্ক ব্যক্তিত্বের বিকাশকে প্রভাবিত করে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ কঠোর শ্রমসাধ্য কাজের সংখ্যা হ্রাস করে এবং ব্যক্তিমানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের অবস্থা সৃষ্টি করে বলে, কাজের সময়ের চেয়ে কাজ না করার সময়ের দীর্ঘতা কর্ম-দিবসের দৈর্ঘ্য স্থির করার ক্ষেত্রে গ্রন্থবর্ধমান গুরুত্ব অর্জন করে।

কাজের বাইরের সময়টা বিভক্ত হয় প্রাকৃতিক, শারীরবৃত্তীয় চাহিদাগুলি মেটানোর জন্য দরকারি সময়ে, গৃহস্থালি চালানোর ও সন্তান পালনের জন্য দরকারি সময়ে এবং অবসর সময়ে। অবসর সময় হল সেই সময়টা, লোকে যেটা ব্যবহার করে শুধু শ্রমিক হিশেবেই নয় ব্যক্তিত্ব হিশেবে নিজেদের যোগ্যতা-সামর্থ্য বিকশিত করার জন্য। সুতরাং অবসর সময় হল সমাজতান্ত্রিক সমাজে সার্বজনিক সম্পদের সর্বোচ্চ পরিমাপ।

সমাজতন্ত্রে অবসর সময়ের যুক্তিসহ ব্যবহার, সমাজের প্রধান উৎপাদিকা শক্তি হিশেবে মানুষের গ্রন্থবর্ধমান গুরুত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে, একটা জরুরি

সমস্যা। অবসর সময়ের যুক্তিসহ ব্যবহার সম্পর্কে সমাজের স্বার্থ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সংবিধানে নিশ্চিত করা হয়েছে। জনগণের যথোপযুক্ত বিশ্রাম ও অবসরবিনোদনের সুযোগের মতোই, শ্রমজীবী জনগণের আত্মিক ও শারীরিক বিকাশকে সমাজ নিশ্চিত করে এক নির্দিষ্ট মেয়াদের কর্ম-সপ্তাহ স্থির করে, নির্দিষ্ট কোনো কোনো কাজে ও শিল্পে নিযুক্ত লোকেদের জন্য কর্ম-দিবস সংক্ষিপ্ত করে (যেমন, রাসায়নিক শিল্পে শ্রম-সময় খাদ্য প্রক্রিয়ণ শিল্পের চেয়ে গুস্তবতর), বার্ষিক সবেতন ছুটি দিয়ে, সাংস্কৃতিক-শিক্ষামূলক ও স্বাস্থ্যানয়ন ব্যবস্থাদির জাল বিস্তার বাড়িয়ে, ব্যাপক খেলাধুলো, শরীরচর্চা ও পর্যটনের বিকাশ ঘটিয়ে এবং অবসর সময়ের যুক্তিসহ ব্যবহারের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমজীবী জনগণ তাদের অবসর সময়ের বড় একটা অংশ নিয়োজিত করে অধ্যয়নে ও নিজেদের দক্ষতা উন্নত করার জন্য। কাজের ও কাজের বাইরের সময় অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হয়, কেননা তাতে শ্রম-প্রক্রিয়ায় মানুষের নিয়মানুগ কাজ এবং তার জীবনের শক্তির পুনর্স্থাপন ও সামর্থ্যের বিকাশ ঘটে।

সমাজতন্ত্রে কর্ম-দিবস সংক্ষিপ্ত করা ও আরও বেশি অবসর সময় নিশ্চিত করার ব্যাপারে সমাজের আগ্রহ থাকে। কিন্তু সেটা করা সম্ভব শুধু তখনই যখন সংক্ষিপ্ত কর্ম-দিবসে উৎপাদনকে সমাজ সম্প্রসারিত

করতে পারে এবং জনগণের জীবনমান উন্নত করতে পারে।

কর্ম-দিবস (সামাজিক শ্রম মান) সংক্ষিপ্ত করা ও শ্রমজীবী জনগণের জন্য আরও বেশি অবসর সময় নিশ্চিত করাই সমাজতন্ত্রে সামাজিক শ্রমের উৎকর্ষ-নির্দেশক।

শ্রমের সামাজিক রূপের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল শ্রমে শ্রমের বিভাজন। অর্থনৈতিকভাবে বলতে গেলে, সমাজতন্ত্রে উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল শ্রমের সারমর্ম কী?

উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল শ্রমের মধ্যে প্রভেদের ভিত্তি হল শ্রমসংগঠনের সামাজিক রূপ ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের চরম লক্ষ্য — শ্রমজীবী জনগণের জীবনমান উন্নত করা।

সমাজতন্ত্রে শ্রমের সামাজিক রূপের দরুন, ঐক্যবদ্ধ শ্রম সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের ক্রমবর্ধমান সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশের একটা ভিত্তি যোগায়। সুতরাং সমাজতন্ত্রে যে শ্রম এই সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জনের অবস্থা — বৈষয়িক সম্পদ ও কৃত্যকসমূহ — সৃষ্টি করে, সেই শ্রম উৎপাদনশীল। অনুৎপাদনশীল শ্রম হল সেই শ্রম, যার উৎপাদের কোনো সামাজিক ব্যবহার-মূল্য নেই এবং কোনো চাহিদা নেই।

শ্রমের সামাজিক রূপের দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রত্যক্ষ সামাজিক শ্রম (অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ও সমবায়িক উদ্যোগগুলিতে কাজ) উৎপাদনশীল।

বৈশিষ্ট্যের বিষয়, প্রত্যক্ষ সামাজিক শ্রম এক পরিকল্পিত ভিত্তিতে সামাজিক শ্রমের মধ্যে অঙ্গীভূত হয়। তার উদ্দেশ্য থাকে সামাজিক চাহিদাগুলি মেটানো। শ্রমের প্রক্রিয়া শূন্য হওয়ার আগে, পরিকল্পনা-কর্তৃপক্ষ উৎপাদিতব্য সামগ্রীগুলির পরিধি ও বৈচিত্র্য স্থির করে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং তা উদ্যোগটির নজরে আনে। উদ্যোগটিকে সেই পরিকল্পনা অবশ্যই পূরোপূরি রূপায়িত করতে হয়। উদ্যোগটি যদি তা করে, এবং ফ্রেতারা যে সব সামগ্রীর জন্য অর্ডার দিয়েছিল সেগুলি যদি তারা যথাসময়ে পায় এবং সামগ্রীগুলির গুণগত উৎকর্ষ ও বৈচিত্র্যের ব্যাপারে তাদের চাহিদা পূরণ হয়, তাহলে সেই সামগ্রীগুলি উৎপাদনের জন্য ব্যয়িত প্রত্যক্ষ সামাজিক শ্রম উৎপাদনশীল। সরবরাহকারক যদি পরিকল্পনা পূরণ করতে ব্যর্থ হয় কিংবা সামগ্রীগুলির যথোপযুক্ত গুণগত উৎকর্ষ নিশ্চিত করতে না পারে, তাহলে ব্যয়িত শ্রমকে বলা হয় অনুৎপাদনশীল।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে, শ্রমের একটা অংশ প্রত্যক্ষ সামাজিক শ্রম নয়। কৃষকরা যখন নিজস্ব সহায়ক জমিতে কাজ করে সেই শ্রম এবং সমবায়ের সদস্য নয় এমন কারুশিল্পীদের শ্রম হল ব্যক্তিগত শ্রম।

নিজস্ব সহায়ক জমিতে ব্যয়িত শ্রম সম্পূর্ণরূপে সামাজিকীকৃত নয়। সেই জন্য এই ধরনের জমিতে ব্যয়িত সমস্ত শ্রমই যে উৎপাদনশীল তা নয়।

নিজস্ব সহায়ক জমিতে বারা কাজ করে সেই খামারিরা জমির চাষ-আবাদ, গবাদি পশু সংগ্রহ, পশু-

খাদ্য ও গোচারণ ভূমি পাওয়ার ব্যাপারে যৌথখামার, রাষ্ট্রীয় খামার ও অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত্ব উদ্যোগের সাহায্য পায়। কৃষিবিদ ও পশু-বিশেষজ্ঞদের সাহায্যও তারা পায়। নিজস্ব সহায়ক জমিতে যারা চাষ করে সেই খামারিরা গবাদি পশু পদুর্ঘটকরণ বা হাঁসমুরগি পালন সম্পর্কে যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির সঙ্গে চুক্তিভিত্তিক বন্দোবস্তও করতে পারে।

যৌথখামার, রাষ্ট্রীয় খামার, ভোক্তা সমবায় আর নিজস্ব সহায়ক জমিতে কাজ-করা খামারিদের মধ্যে এই চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক সম্প্রসারণের ফলে, এই ধরনের জমিগুলি ক্রমেই তার বিচ্ছিন্নতা হারায়, কেননা সেগুলিতে করা কাজ ও সেখানকার উৎপাদ, দৃষ্টোই ক্রমেই বেশি করে পরিকল্পিত নিয়মনাধীন হয়ে ওঠে।

প্রত্যক্ষ সামাজিক শ্রম হিশেবে উৎপাদনশীল শ্রমের লক্ষ্য হল জনগণের পূর্ণ সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও উচ্চ জীবনমান নিশ্চিত করা এবং ব্যক্তিত্বের সুসমঞ্জস বিকাশ নিশ্চিত করা।

সমাজতন্ত্রে প্রত্যক্ষ সামাজিক শ্রমের নতুন অন্তর্বাহু প্রকাশ পায় এইখানে: উদ্বৃত্ত উৎপাদ ব্যবহৃত হয় সমাজের সকল সদস্যের স্বার্থে; নিজের জন্য শ্রম আর সমাজের উপকারের জন্য শ্রমের মধ্যে একটা শ্রমের বিভাজনে; সাথিসম্মিলিত সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তাভিত্তিক সম্পর্কে; সমস্ত সমাজের পরিসরে ও সমাজের সকল সদস্যের স্বার্থে পরিকল্পিত শ্রমসংগঠনে; এবং শ্রম একটা প্রত্যক্ষ সামাজিক চরিত্র অর্জন করে উৎপাদনের প্রক্রিয়াতেই, বাজারে নয়।

সমাজের উপকারের জন্য শ্রম সামগ্রিকভাবে জাতীয় অর্থনীতির সংবন্ধ বিকাশের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ।

সমাজতন্ত্রে, উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় যে-সমস্ত অর্থনৈতিক সম্পর্ক জড়িত থাকে সেগুলি ক্রমেই বেশি জটিল হয়ে যায় এবং বিন্যাস ভিন্ন শাখায় উৎপাদন-প্রক্রিয়া একক উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়, যার জন্য প্রয়োজন হয় সমস্ত সমাজের পরিসরে যৌথ প্রচেষ্টা। নতুন নতুন অণুগত-উৎপাদন সমাহার গড়ে ওঠায়, পরিকল্পিত উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত অর্থনৈতিক যোগসূত্রগুলি দৃঢ়তর হয়ে ওঠে। অণুগত-উৎপাদন সমাহার বলতে বোঝায় সেই সমস্ত উদ্যোগ (উৎপাদন পরিমেল) ও সংগঠনের সাকল্য, যেগুলি অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের অভ্যন্তরে কাজ করে, একই এলাকায় অবস্থিত এবং অভিন্ন প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদের দ্বারা আন্তঃসংযুক্ত।

অণুগত-উৎপাদন সমাহারগুলি সাধারণত গঠিত হয় বিদ্যমান প্রশাসনিক-অণুগত এককগুলির চৌহদ্দির ভিতরে। কখনও কখনও সেগুলি গঠন করা হয় কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণের কর্মসূচি কার্যকর করার জন্য। সেই ক্ষেত্রে, সেগুলির কাজ হয় অর্থনীতির পক্ষে অত্যাবশ্যক বড় বড় সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যার সর্বাত্মক সমাধান নিশ্চিত করা।

সমাজের আলাদা এক একটি অর্থনৈতিক এককের স্তরে শ্রমের পরিকল্পন ও সংগঠনের ভিত্তি হল

পরিকল্পনায় নির্দেশিত ভৌত ও মূল্য সূচকগুলি।

প্রত্যেকটি উদ্যোগের নজরে যে-সমস্ত সূচক আনা হয় তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে ভৌত সূচকগুলি, অর্থাৎ, সামাজিক চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পরিধি ও বৈচিত্র্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোভিয়েত শিল্প ২ কোটি ৪০ লক্ষ ধরনের সামগ্রী উৎপন্ন করে। প্রতিটি উৎপাদ এক জাতিব্যাপী পরিসরে শ্রমের সহযোগিতা নিশ্চিত করে। আলাদা আলাদা প্রতিটি উদ্যোগ, তাদের কাজের ক্ষেত্রে নিভঁর করে কয়েক ডজন এমন কি কয়েক শত অর্থনৈতিক যোগসূত্রের উপরে।

প্রতিটি উদ্যোগ একাধারে উৎপাদক ও ভোক্তা। অন্যান্য উদ্যোগকে কী পরিমাণ সামগ্রী সরবরাহ করতে হবে, পরিকল্পনায় তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়; সেই পরিকল্পনা সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে প্রতিটি উদ্যোগ, উৎপাদক হিশেবে, সেই অবস্থা সৃষ্টি করে যাতে ভোক্তা হিশেবে অন্যান্য উদ্যোগ তাদের কাজ চালাতে পারে। অন্য দিকে, ভোক্তা হিশেবে সেটি আবার যুক্ত উৎপাদক হিশেবে অন্যান্য উদ্যোগের সঙ্গে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উৎপাদক হিশেবে একটি মোটরগাড়ি কারখানা মোটরগাড়ি তৈরি করে; ভোক্তা হিশেবে সেটি ব্যবহার করে অন্যান্য উদ্যোগের তৈরি যন্ত্রাংশ (ইঞ্জিন, প্রভৃতি)।

সমাজতন্ত্রে পণ্য-অর্থ সম্পর্ক যতদিন বজায় থাকে, ততদিন প্রতিটি উদ্যোগের পরিকল্পনায় এক প্রস্ত মূল্য সূচক নির্দিষ্ট করা হয় (মূল্য বা উৎপাদন-

ব্যয় হ্রাস, বিক্রীত উৎপাদগুলির মূল্য ইত্যাদি)। সমাজতন্ত্রে, ভৌত সূচক ও মূল্য সূচক উভয়ের উপরে নির্ভরতা ব্যয়-হিসাবরক্ষণাভিত্তিক উদ্যোগগুলির স্বার্থ আর সমাজের স্বার্থের মধ্যে একটা বিরোধ ঘটাতে পারে (একটি সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত হল এমন একটি উদ্যোগ যেটি মুনাকার দিক দিয়ে পরিকল্পনা পূরণ করছে, অথচ উৎপন্ন সামগ্রীর বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে পরিকল্পনা পূরণ করছে না)।

এটা উৎপাদক উদ্যোগ ও ভোক্তার মধ্যকার সম্পর্কের স্থিতিশীলতা নষ্ট করে, কেননা উদ্যোগটির স্বার্থকে সমাজের স্বার্থের উর্ধ্ব স্থান দেওয়া হয়। এই ধরনের বিরোধের কারণ রয়েছে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, সমাজতন্ত্রে শ্রমের দ্বিবিধ চরিত্র টিকে থাকার মধ্যে।

পরিকল্পনার গুরুত্ব আর শ্রম-প্রতিনিয়তার জন্য বাজার সংক্রান্ত বিষয়গুলির প্রাসঙ্গিকতা, এই দুইয়ের মধ্যে পরিবর্তমান পরস্পরসম্পর্ক শ্রমের দ্বিবিধ চরিত্রকে এক নতুন অন্তর্বস্তু দান করে। সংবদ্ধ, অখণ্ড অর্থনৈতিক সমাহারে একটি উপাদান হিসেবে প্রতিটি উদ্যোগের কাজের পক্ষে পরিকল্পনা অত্যাবশ্যিক। বাজার একটা সহায়ক অনুপূরক ভূমিকা পালন করে। বাজার উদ্যোগগুলির পক্ষে উদ্যম দেখানো এবং তাদের উৎপন্ন ভোগ্যপণ্য ও অন্যান্য সামগ্রীর পরিধি বাড়ানো সম্ভব করে তোলে।

অন্যান্য মূল্য সূচক (যেমন, উৎপাদন-ব্যয়, দাম, মুনাক্কা, মুনাক্কাদায়কতা) শ্রমের ব্যক্তিক ও সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় ব্যয় তুলনা করার ক্ষেত্রে এবং মূল্য শ্রমের

বিভিন্ন রূপের কার্যকরতা পরিমাপের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। এই সূচকগুলি শ্রমের চরিত্রে নির্ধারক ভূমিকা পালন করে, এমন কথা বলা চলে না। একটি উদ্যোগে শ্রম ব্যয়িত হয় মুনীফা অর্জনের পরিবর্তে বরং সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে।

সমাজতন্ত্রে, সামগ্রিকভাবে সমাজে ও আলাদা আলাদা উদ্যোগে পরিকল্পনা অনুযায়ী শ্রমের সংগঠন পূর্ণ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার এক গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত।

২। সর্বজনীন কর্মসংস্থান।

কাজ করার অধিকার ও নিজের
বৃত্তি বা পেশা বেছে নেওয়ার অধিকার

সমাজতন্ত্র শ্রমকে স্থাপন করে এক নতুন সামাজিক ভিত্তির উপরে। পুঞ্জিবাদের অভিশাপ, বেকারি হয়ে দাঁড়ায় অতীতের জিনিস। সমাজতান্ত্রিক সমাজ সমগ্র সক্ষমদেহ জনসমষ্টির পূর্ণ কর্মসংস্থানের অবস্থা নিশ্চিত করে। পুঞ্জিবাদের চেয়ে সমাজতন্ত্রের তর্কাতীত সুফলগুলির এটি একটি বহিঃপ্রকাশ। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থেকে মানুষকে বা মুক্ত করে সেই নিশ্চিতিপ্রদত্ত কর্মসংস্থান সামাজিক আশাবাদের এক উৎস। সমাজতন্ত্রে কোনো মানুষ কাজ না করে পারে না। সমাজতন্ত্রে আয়ের অন্য কোনো উৎস নেই, কোনো ব্যক্তিগত কারখানা বা দোকান নেই। কোনো ব্যক্তিগত

জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি নেই বলে কেউই ডিভিডেন্ড বা লভ্যাংশ পেয়ে জীবনযাপন করতে পারে না।

সেই সঙ্গে, শ্রমজীবী জনগণই উৎপাদনের মূল গুরুত্বপূর্ণ উপায়গুলির সহ-মালিক। সমাজতন্ত্রে উৎপাদনের উপায়ের মালিক অর্থনৈতিক এককগুলি বা ব্যক্তিমানুষরা নয়। একটি কর্ম-সংঘের সদস্য, মেহনতি মানুষই উৎপাদনের উপায়ের যুক্ত মালিক। উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে সম্পর্কিতরূপে, সমাজের সকল সদস্যই সমান; এটা সমাজের প্রত্যেক সদস্যের কর্মসংস্থান সন্নিশ্চিত করে।

সমাজতন্ত্রে শ্রমের সর্বজনীনতা প্রকাশ পায় এই ঘটনায় যে সমাজ তার সকল সদস্যের জন্য কাজের সুযোগ নিশ্চিত করে (সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে কাজ করার অধিকার সেখানকার সংবিধানে নিশ্চিতপ্রদত্ত)। সমাজের সমস্ত সক্ষমদেহ সদস্য নিজেদের জন্য ও সমাজের উপকারের জন্য কাজ করতে বাধ্য।

সমাজতন্ত্রে, অর্থনীতির প্রত্যেক শাখায় ও প্রত্যেক অঞ্চলে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হয় পরিকল্পনা অনুযায়ী। প্রতিটি শিল্প ও অঞ্চলে শ্রমের চাহিদা বিবেচনা করে এবং স্থানীয় জনসমষ্টি সংক্রান্ত পরিস্থিতি অনুযায়ী নতুন নতুন কাজের জায়গা চালু করার বিষয়টি সমাজ পরিকল্পনা করে। রাষ্ট্র উদ্যোগগুলির মধ্যকার সম্পর্ক, তথা কাজের বিধিব্যবস্থা, মান ও অবস্থা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করে। বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি বাবদ শ্রমের ব্যয়ও সমাজের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের সদস্যরা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব উদ্যোগে, যৌথখামারে বা সমবায়িক উদ্যোগে, তাদের নিজেদের বাড়িতে অথবা নিজস্ব সহায়ক জমিতে কাজ করতে পারে।

তাছাড়া, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আইনসঙ্গতভাবে সমাজের অবকাঠামোর সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শ্রমমূলক কার্যকলাপের অনুমতি দেওয়া হয় যেখানে সেবা-কৃত্যকের পরিমাণ বাসিন্দাদের চাহিদা মেটায়ে না। তাই ব্যক্তিগত শ্রমমূলক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সেবা-কৃত্যক অন্তর্ভুক্ত: ট্যাক্সি, সেলুন, পোশাক ও জুতো সেলাই কল, ভিন্ন ধরনের মেরামতশালা, সেবাব্যবস্থা, মোটরগাড়ি সার্ভিস, ব্যক্তিগত চিকিৎসাকর্ম, শিক্ষাদান ইত্যাদি। ব্যক্তিগত শ্রমমূলক কার্যকলাপ সম্বন্ধে আইন অনুযায়ী সোভিয়েত ইউনিয়নে মজদুর শ্রম নিষিদ্ধ; কোনো কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশে সীমিত পরিমাণে মজদুর শ্রম ব্যবহার করা সম্ভব: যেমন, হাঙ্গেরিতে ৩ জন মানুষের শ্রম, পোল্যান্ডে — ১৫ জন, যুগোস্লাভিয়ায় — ৫ জন মানুষের শ্রম।

আইনটি রাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নাগরিকদের মধ্যে আর্থিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে: ব্যক্তিগত শ্রমমূলক কার্যকলাপে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পেটেন্ট কেনা দরকার, তার মূল্য সেবা-কৃত্যকের রূপ ও অনুমেয় আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে কিংবা আয়-কর নেওয়া হয়, যা সমাজতান্ত্রিক সামাজিক ন্যায়পরতার নীতি অনুযায়ী নির্ধারিত হয়: ২৫০

রুবল পর্যন্ত মাসিক আয়ে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক ও কর্মীদের মজদুরির আয়-করের মতন; ৫০০ ও ততোধিক রুবল আয়ে অর্ধেক মজদুরি কর হিশেবে নেওয়া হয়। আইন অনুযায়ী ব্যক্তিগত শ্রমমূলক কার্যকলাপে নিযুক্ত পেনশনপ্রাপ্ত ও সুদূর উত্তরাণুলের স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্য বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত শ্রমমূলক কার্যকলাপের কল্যাণে প্রত্যেক মানুষের পেশাগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আরও বেশি ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করা যায়, সমাজের অন্য লাভজনক ফ্রিয়ারকলাপে নতুন শ্রম-সম্পদ টেনে আনা যায়।

শ্রমের সর্বজনীনতা তার সৃষ্টিশীল চরিত্র বাড়িয়ে তোলায় সহায়ক হয়, সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমকে এক সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ায় পরিণত করার সমস্ত সুযোগই রয়েছে। যে কোনো ধরনের গঠনমূলক কাজের মধ্যেই সৃষ্টিশীলতার উপাদান থাকে। কিন্তু শ্রম সত্যিই সৃষ্টিশীল হয় একমাত্র উৎপাদনের উপায়ের উপরে সার্বজনিক মালিকানার অবস্থাতেই অর্থাৎ উৎপাদনের উপায়ের মালিক যেখানে শ্রমিকরা।

সুবিবেকী কাজ ও তার ফলই সমাজতান্ত্রিক সমাজে একজন ব্যক্তির স্থান-মর্যাদা নির্ধারণ করে। শ্রমজীবী জনগণের প্রতি সার্বিক মনোভাবটা হল গভীর মর্যাদার মনোভাব। শোষণমুক্ত ও আরও বেশি সৃষ্টিশীল হয়ে-ওঠা শ্রমের সর্বজনীনতাই এই ঘটনার মূলে যে কাজই সমাজতন্ত্রে জীবনধারা নির্ধারণক মূল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাজ করার অধিকার এবং নিজের

পেশা বা বৃত্তি বেছে নেওয়ার অধিকার সমাজতান্ত্রিক জীবনযাপন প্রণালীতে একটা কাজ-অভিমুখী চরিত্র দান করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে, প্রত্যেক সক্ষমদেহ ব্যক্তিকে কাজ পাওয়ার এবং কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী কৃত কাজের জন্য পারিশ্রমিক পাওয়ার সুযোগের নিশ্চিতি দেওয়া হয়, সেই পারিশ্রমিক রাষ্ট্র-নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির স্তরের চেয়ে কখনও কম হয় না। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যেমন করা হয়, সেইভাবে কাজ করার অধিকার শুদ্ধ সংবিধানে ঘোষিতই হয় না, তা প্রকৃতপক্ষে নিশ্চিত করা হয় 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্বারা, উৎপাদিকা শক্তিসমূহের ধীরনিশ্চিত বৃদ্ধি, অবৈতনিক বৃত্তিগত ও পেশাগত প্রশিক্ষণ, দক্ষতার উন্নতিবিধান, নতুন নতুন কাজে ও পেশায় প্রশিক্ষণের দ্বারা' (সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের ৪০ নং ধারা)।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের সদস্যরা সমগ্র সমাজের মালিকানাধীন উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে সম্পর্কিতরূপে সমান অধিকার ভোগ করে বলে, সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে এবং এই সমস্ত উৎপাদনের উপায় ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে সৃষ্ট উৎপাদের একটা অংশ তাদের করা কাজের গুণ ও পরিমাণ অনুযায়ী পাওয়ার ব্যাপারে সমান অধিকার প্রয়োগ করে। সমাজতন্ত্রে শ্রমজীবী জনগণের সামাজিক-অর্থনৈতিক সমানতা বলতে এটাই বোঝায়। কাজ করার অধিকার হল

উৎপাদনের উপায়ের উপরে সার্বজনিক মালিকানার অন্যতম অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ ফল।

সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রক্রিয়ায় বেকারি দূরীভূত হয়, নিশ্চিত হয় সম্পূর্ণ কর্মসংস্থান। সম্পূর্ণ কর্মসংস্থানের অর্থ এই যে সামাজিক উৎপাদনের এলাকায় কাজের জন্য সক্ষমদেহ নাগরিকদের চাহিদা সর্বাধিক মাত্রায় পূরণ করা হয়। এটা অবশ্য বিবরণতভাবে অবশ্যস্বাবী যে, সক্ষমদেহ জনসমষ্টির একটা অংশ সংসার চালানোর কাজে (এরা অধিকাংশ নারী), নিজস্ব সহায়ক জমিতে কাজে অথবা পড়াশোনায় নিযুক্ত থাকে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে, সমস্ত সক্ষমদেহ জনগণকে কাজ যোগানো, সামাজিক উৎপাদনের পরিকল্পিত বিকাশপ্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে, কর্মসংস্থান একাধারে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে। অর্থনৈতিক ক্রিয়া প্রকাশ পায় এই ঘটনায় যে প্রত্যেক সক্ষমদেহ ব্যক্তি, উৎপাদনের উপায়ের সহ-মালিক বলে, নিজের জন্য তথা সমাজের উপকারের জন্য জীবিকার উপায় সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে কাজ করতে বাধ্য। কর্মসংস্থানের সামাজিক ক্রিয়া উদ্ভূত হয় কাজ করাটা সমাজের জীবনে জনগণের অংশগ্রহণের প্রধান রূপ হয় বলে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে কর্মসংস্থান নীতির দায়িত্ব হল সম্পূর্ণ, যুক্তিসহ কার্যকর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা। শেষোক্তটির নিহিতার্থ হল জনশক্তি

সম্পদের সর্বাপেক্ষা উপযোগী ও উৎপাদনশীল প্রয়োগ, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মধ্যে তার যুক্তিসহ বণ্টন, এবং কর্মে নিযুক্ত জনসমষ্টির দক্ষতা ও সামর্থ্যের পূর্ণ ব্যবহার।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের সদস্যদের কাজ করার অধিকার তাদের কাজ করার বাধ্যবাধকতার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। শোষণ নিশ্চিহ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে, পরগাছার মতো বেঁচে থাকার, অর্থাৎ অন্যদের কাজের বিনিময়ে বেঁচে থাকার সুযোগও দূর হয়। ‘যে কাজ করে না, সে খেতেও পাবে না’ — এই হল সমাজতন্ত্রের একটি নীতি। সমাজতন্ত্রে ও পুঁজিবাদে শ্রমজীবী জনগণের অবস্থায় বদলিয়ারি পার্থক্যের কারণটা কাজ করার আবশ্যিকতার অনুপস্থিতি নয়, বরং কাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থায় পার্থক্য। মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যে, কৃষি ও শ্রমশিল্প কর্মের মধ্যে, ব্যবস্থাপকদের কাজ আর তাদের নির্দেশ যারা পালন করে সেই লোকদের কাজের মধ্যে বৈপরীত্যকে সমাজতন্ত্র দূর করে যদিও শ্রমের এই রূপগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য টিকে থাকে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে, কাজ করার বাধ্যবাধকতা শুধু সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রহণই বোঝায় না, সুবিবেকী ও দক্ষতাপূর্ণ কাজও বোঝায়। প্রত্যেক শ্রমিকের নিজের পেশাগত দক্ষতা উন্নত করার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে, নিজের কাজে আরও ফললাভের প্রয়াসের সঙ্গে এবং উৎপাদনী সহায়-সম্পদ ও শ্রম-সময় যাতে যুক্তিসহভাবে ও মিতব্যয়িতার সঙ্গে ব্যবহৃত

হয় তা নিশ্চিত করার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লবের কৃতিত্বগুলির উপরে নির্ভরতা, বিভিন্ন শিল্প ও উৎপাদন ক্ষেত্রের মধ্যে গ্রমবর্ধমান পরস্পরনির্ভরশীলতা, তথা জাতীয় অর্থনীতির বিপুল পরিসর শ্রমজীবী জনগণের উন্নততর সংগঠন, উন্নত নিয়মানুবর্তিতা ও কাজের উচ্চতর গুণগত উৎকর্ষ দাবি করে।

সুবিবেকী কাজ দৈনন্দিন একটা রীতিতে পরিণত হয় বলে, সমাজতান্ত্রিক সমাজে অলসতা ও পরগাছাবৃত্তির কোনো স্থান থাকতে পারে না। তা হলেও, এখনও এমন কিছু লোক আছে যারা শ্রম নিয়মানুবর্তিতা লঙ্ঘন করে কিংবা কাজ এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে, লঙ্ঘন করে সামাজিক মানগুলি। লোকে যাতে কাজ করতে বাধ্য বলে অনুভব করে, সেটা নিশ্চিত করা হয় বৈষয়িক ও নৈতিক প্রণোদনার সাহায্যে ও আইনের মধ্য দিয়ে।

কাজ করার মতো বয়ঃপ্রাপ্ত হলে, অর্থাৎ ১৬ বছর বয়স হলে, সমাজের সকল সদস্য কাজ করতে বাধ্য (১৬ থেকে ১৮ বছর বয়ঃগোষ্ঠীতে সংক্ষিপ্ততর কর্ম-দিবসে)। সমাজতন্ত্রে শিশু শ্রম নিষিদ্ধ। মাধ্যমিক ও বৃত্তি-প্রশিক্ষণ স্কুলগুলিতে শ্রমমূলক গ্রিয়াকলাপে উদীয়মান প্রজন্মকে জড়িত করা এবং তার দ্বারা বিভিন্ন শ্রম দক্ষতায় কমবয়সী ছেলেমেয়েদের তালিম দেওয়া কাজের প্রতি মর্যাদাবোধ ও ভালোবাসা গড়ে তোলার একটা গুরুত্বপূর্ণ উপায়।

পূর্ণ কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে গিয়ে

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বহুবিধ পদ্ধতি ব্যবহার করে। প্রথম, হুস্বমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা সমেত সমস্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ পরিকল্পনায় পুঁজি বিনিয়োগের এমন সমস্ত পরিমাণ ও এলাকার সংস্থান রাখা হয় যাতে নতুন কাজ সৃষ্টি হয়; জনশক্তি সম্পদের বৃদ্ধির বিষয়টা বিবেচনায় রাখা হয়। এটাই পূর্ণ কর্মসংস্থান সূনিশ্চিত করে। দ্বিতীয়, যারা কাজ করতে ইচ্ছুক, অথচ গৃহস্থালি চালানো, সন্তানপালন, নিজস্ব সহায়ক জমিতে কাজ, প্রভৃতির দরুন কাজ করতে অপারগ, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তাদের জন্যও কর্মসংস্থানের সূযোগ সৃষ্টি করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করে।

নিজস্ব সহায়ক জমিতে কর্মরত লোকদের সামাজিক উৎপাদনে জড়িত করার সূযোগ সর্বপ্রথম নিভর করে কৃষি-শিল্প সমাহারের বিকাশের উপরে এবং নিজস্ব সহায়ক জমিগুলির অধিকারীদের কাছ থেকে রাষ্ট্র ও সমবায়গুলির পণ্য ক্রয়ের সম্প্রসারণের উপরে।

সামাজিক উৎপাদনে সর্বজনীন, নিশ্চিতপ্রদত্ত কর্মসংস্থান সমাজের সকল সদস্যের মধ্যে কাজ করার এক বাসনা গড়ে তোলে এবং তাদের জীবিকার্জনের উপায়ের নিশ্চিতি দেয়। এটা এমন একটা সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক আবহাওয়া সৃষ্টি করে, পুঁজিবাদে যা কখনোই দেখা দিতে পারত না। পুঁজিবাদের শ্রেণী-বৈর ও বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক সমাজে প্রতিস্থাপিত হয় সামাজিক আশাবাদ আর পারস্পরিক সহায়তা, সহযোগিতা ও সংঘাতক্রিয়াবাদভিত্তিক সম্পর্ক দিয়ে।

সমাজতন্ত্রে পূর্ণ কর্মসংস্থান, কাজ করার অধিকার ও কাজ করার বাধ্যবাধকতার ধারণাকে বুদ্ধিজীবীরা অর্থনীতিবিদরা বিকৃত ব্যাখ্যা করে থাকেন। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে কর্মসংস্থানকে তারা চিত্রিত করেন হয় রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার দ্বারা বিকৃত শ্রম-বাজারের স্বতঃস্ফূর্ত প্রিয়ার ফল হিসেবে,* না হয় যে রাষ্ট্র সর্বজনীন বাধ্যতামূলক শ্রম চালু করে তার জবরদস্তি কর্মনীতির পরিণাম হিসেবে।** দুটি ভাষ্যই ভিত্তিহীন এবং সমাজতান্ত্রিক কর্মপ্রয়োগের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষকে ‘কর্মহীন করা’ এবং তাদের বিশাল বেকার-বাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য করা — পুঁজিবাদ এইভাবেই তার শোষণমূলক চরিত্র প্রকাশ করে। সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রম হল প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অবাধ, সর্বাঙ্গীণ বিকাশের এক নিয়ামক পূর্বশর্ত। সেই জন্যই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে ‘আপেক্ষিকভাবে মদুস্ত এক শ্রম-বাজার’ (অর্থাৎ বেকারি), বা বাধ্যতামূলক কর্মসংস্থান কোনোটারই স্থান নেই। এটা প্রতিপন্ন হয় ? অন্যান্য জিনিস ছাড়াও — এই ঘটনা দিয়ে যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমজীবী জনগণের বৃত্তি বা পেশা বেছে নেওয়ার অধিকার আছে।

* দৃষ্টান্তস্বরূপ, দ্রষ্টব্য: *The Soviet Economy: Continuity and Change*. Ed. by M. Borstein. Boulder, Colo., 1981, p. 97.

** দৃষ্টান্তস্বরূপ, দ্রষ্টব্য: *Employment: Outlook and Insights*. Ed. by D. Freedman, J.L.O., Geneva, 1979, pp. 111-115.

সমাজের প্রয়োজনকে যথাযথভাবে গণ্য করে, নিজেদের ঝোঁক, সামর্থ্য, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা অনুযায়ী বৃত্তি বা পেশা, কাজের ধরন বেছে নেওয়ার জন্য সোভিয়েত নাগরিকদের অধিকার দেওয়া হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে। আরও অধিক সংখ্যক মানুষ তাদের প্রবণতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী সামাজিক উৎপাদনে জড়িত। নিজের সকল সামর্থ্যের পূর্ণ সদ্যবহার করার সুযোগ হল সমাজতন্ত্রে শ্রমের চারিত্র্য-নির্ণায়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সেই জন্যই, শ্রমিকরা যাতে তাদের কাজের পারিশ্রমিকের আয়তনেই শূদ্ধ নয় তাদের শ্রমের অন্তর্বস্তুতেও সন্তুষ্ট হয়, যাতে তারা তাদের সৃষ্টিশীল নিহিত ক্ষমতা বিকশিত করার, এবং অন্যান্য মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার, কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের পূর্ণ করার সুযোগ পায়, সমাজতান্ত্রিক সমাজ সে বিষয়ে যত্নবান হয়।

একটি কাজের আকর্ষণীয়তার মাত্রা নির্ধারিত হয় অনেকগুলি বিষয় দিয়ে; সেগুলির মধ্যে আছে বৈষয়িক ও নৈতিক প্রণোদনা, কাজের নিবিড়তা ও কষ্টসাধ্যতা, কাজের অবস্থা, কাজের অন্তর্বস্তু এবং তা শ্রমিকদের মেজাজ, কায়িক ও মানসিক সামর্থ্য, দক্ষতা, ঐতিহাসিক ও জাতীয় ঐতিহ্য, বয়স, স্ত্রী-পুরুষ ভেদ, বিবাহিত বা অবিবাহিত অবস্থা, প্রভৃতির সঙ্গে মানানসই কিনা।

একটি পেশা বেছে নেওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা হয় অবৈতনিক শিক্ষা এবং গ্রামাঞ্চলে ও নব-বিকশিত এলাকাগুলিতে শ্রম প্রয়োগের সুযোগগুলি সম্প্রসারিত

করার মধ্য দিয়ে। শ্রমকে সহজতর ও সুরক্ষিত করার, কাজের অবস্থা উন্নত করার প্রচেষ্টা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বা অতি কষ্টসাধ্য কাজের অবস্থা যেখানে জড়িত সেই ধরনের বৃত্তি ও পেশা আজ অতীতের জিনিস (যেমন, একজন কামারের কাজ)।

নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অবাধে পেশা নির্বাচন নিশ্চিত করার প্রচেষ্টায় নানা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, সেই অসুবিধাগুলি উদ্ভূত হয় উৎপাদিকা শক্তিগুলির বর্তমান বিকাশের স্তর থেকে। কর্মসংস্থানের বিদ্যমান কাঠামোর মধ্যেই একজন লোক একটা পেশা বা কাজ বেছে নিতে পারে। যেগুলির প্রয়োগ নিয়ত বেড়ে চলেছে সেই ধরনের যন্ত্রীকৃত ও দক্ষ শ্রমের পাশাপাশি এখনও রয়েছে কার্যিক, কম দক্ষতার ও অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদার কাজ। বাড়তি বৈষয়িক প্রণোদনা এবং অন্তর্বস্তু নির্বিশেষে যে কোনো ধরনের কাজের প্রতি মর্যাদাবোধ গড়ে তোলার চেষ্টা, লোককে এই ধরনের কাজ করতে উৎসাহিত করার জন্য অত্যাৱশ্যক।

লোকে যাতে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করার অধিকার প্রয়োগ করতে পারে তা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বৃত্তিগত পথ-নির্দেশনার গুরুত্ব ক্রমবর্ধমান। রাষ্ট্র, আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ ও উদ্যোগগুলি লোকেদের প্রবণতা, মনস্তত্ত্ব শারীরবৃত্ত ও সামাজিক স্বার্থ গণ্য করে তাদের কাজ করার সামর্থ্য সনাক্ত ও বিকশিত করার জন্য উদ্দেশ্যপূর্ণ প্রচেষ্টা চালায়। বৃত্তিগত পথ-নির্দেশনার মধ্যে পড়ে খবরাখবর ও পরামর্শমূলক সেবা

যোগানো তথা কাজ নির্বাচন। বৃত্তিগত পথ-নির্দেশনা প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ে একটি কাজ বা পেশার অন্তর্বস্তু সাধারণভাবে বর্ণিত হয়; দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও বিশদ তথ্যাদি জানানো হয়; এবং তৃতীয় পর্যায়ে একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সেই বিশেষ পেশা বা কাজের উপযুক্ত কিনা তা স্থির করা হয়। বৃত্তিগত পথ-নির্দেশনার সঙ্গে জড়িত থাকে উদীয়মান প্রজন্মকে বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ ও সাধারণ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, স্কুল ও উদ্যোগগুলিতে বৃত্তিগত পথনির্দেশনা কেন্দ্র তৈরি করা, এবং নির্দিষ্ট পেশা বা কাজের জন্য উপযুক্ত লোকেদের সঙ্গে পরামর্শ করা ও তাদের বেছে নেওয়ার কাজে অংশগ্রহণের জন্য সমাজতত্ত্ববিদ ও অন্য বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ করা।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের প্রেক্ষিতে বৃত্তিগত পথ-নির্দেশনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, কেননা একটি বিশেষ কাজ পেতে আগ্রহী শ্রমিকের শিক্ষা, দক্ষতা ও মনস্তাত্ত্বিক-শারীরবৃত্তীয় প্রলক্ষণের উপরে দাবিটা বেড়ে যায় এবং কর্মনিযুক্তির কাঠামো বিস্তৃত ও জটিলতর হয়ে ওঠে।

কর্মনিযুক্তির কাঠামোটি গড়ে ওঠে সামাজিক শ্রম-বিভাজনে দু'টি দিকের প্রভাবে — উৎপাদন-প্রযুক্তিগত ও সামাজিক-অর্থনৈতিক দিকের প্রভাবে। উৎপাদন-প্রযুক্তিগত দিকটি উৎপাদনের উপায় উন্নত করার প্রচেষ্টার সঙ্গে, যোগদান প্রয়োগের পদ্ধতির সঙ্গে ও শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নত করার সঙ্গে যুক্ত। সামাজিক-অর্থনৈতিক দিকটি যুক্ত সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনকে সমাজের সকল সদস্যের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সর্বাঙ্গীণ

বিকাশের দিকে অভিমুখী করার সঙ্গে। এক্ষেত্রে, অন্যান্য জিনিস ছাড়াও, পূর্বানুমিত থাকে সামাজিক উৎপাদনে সক্ষমদেহ জনসমষ্টির সমস্ত অংশের স্বতঃপ্রণোদিত অংশগ্রহণের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি, তথা শ্রম-প্রক্রিয়ার জনশক্তির যুক্তিসহ ব্যবহার।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলে কর্মনিযুক্তির কাঠামোতে পরিমাণগত ও গুণগত পরিবর্তন ঘটে। পরিমাণগত পরিবর্তনগুলি ঘটে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য: বিদ্যমান উদ্যোগগুলির আধুনিকীকরণ বা নতুন নতুন উদ্যোগ নির্মাণের দরুন নতুন নতুন কাজের উদ্ভব; সেকেলে সাজসরঞ্জামের পর্যায়ক্রমিক বিলুপ্তির দরুন বিদ্যমান কাজের সংখ্যা হ্রাস; এবং যন্ত্রের শ্রম-সময়ের গুণাঙ্ক বৃদ্ধি। গুণগত পরিবর্তনগুলি সংঘটিত হয় নতুন নতুন সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি প্রবর্তনভিত্তিক উৎপাদনকর্মের নবোদ্ভাবনগুলির দ্বারা (অর্থাৎ, নমনীয় উৎপাদন ব্যবস্থাসমূহের বিকাশ, তৈরি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের উচ্চতর কৃৎকৌশলগত স্তর ও উন্নততর গুণগত উৎকর্ষ, উপকরণাদির বিলি-বন্দোবস্ত করা ও গুদামজাত করার কাজের যন্ত্রীকরণ এবং মাইক্রোপ্রসেসর ও রোবটের ব্যাপকতর ব্যবহারের দরুন)। সোভিয়েত ইউনিয়নে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, কয়লাবাহী ধাপগুলিতে কয়লার উৎপাদন ও পরিবহণ, যথা বহন ও লোডিংয়ের কাজগুলি সম্পূর্ণরূপে যন্ত্রীকৃত হয়েছে। ভূগর্ভ খনিকর্মে আকরিক ধাতু ও পাথর অপসারণ এবং কাঠ কাটা ও পরিবহণের কাজ প্রায় পুরোপুরি যন্ত্রীকৃত

হয়েছে। সমস্ত গবাদি পশুর ৫০ শতাংশ, শূকরের ৬৬ শতাংশ, হাঁসমুরগির ৭৮ শতাংশ পালিত হয় যন্ত্রীকৃত খামারগৃহালিতে।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব পরিবর্তন ঘটায় কাজের কাঠামোর এই ধরনের সামগ্রিক অনুপাতগৃহালিতে, যেমন — সার্বজনিক ক্ষেত্রে কর্মনিযুক্তি ও ব্যক্তিগত শ্রমমূলক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে অনুপাত, বৈষয়িক উৎপাদনে ও অ-উৎপাদনী ক্ষেত্রে কর্মনিযুক্তির অনুপাত, কোনো না কোনো ক্ষেত্রগৃহালির অভ্যন্তরে কর্মনিযুক্তির মধ্যে অনুপাত, শিল্পে ও কৃষিতে কর্মনিযুক্তির মধ্যে অনুপাত, পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের সংখ্যার মধ্যে অনুপাত এবং প্রধানত মানসিক ও প্রধানত কার্যিক শ্রমের মধ্যে অনুপাত। শ্রম-প্রক্রিয়াগৃহালি নান্দনিকভাবে বেশি আকর্ষক হয়ে ওঠে; এবং এক্ষেত্রে, অদক্ষ ও কার্যিক কাজের অস্তিত্ব লোপ পায়।

কিন্তু, বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের একটা 'উল্টো দিক' আছে। এমন সব বিষয় দেখা দেয়, যেগৃহালি মানবদেহের উপরে প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে। এগৃহালির মধ্যে আছে — উৎপাদন-প্রক্রিয়াসমূহের উচ্চতর দ্রুতি, নতুন নতুন দাহ্য পদার্থের ব্যবহার, তেজস্ক্রিয় পদার্থ ও লেসারের ব্যাপকতর প্রয়োগ। সেই জন্যই, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতি ঘরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ আরও বেশি মনোযোগ দেয় প্রবর্তিতব্য প্রযুক্তি ও উৎপাদন-প্রক্রিয়াসমূহের শূদ্ধ প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক মডেল সৃষ্টি করার

দিকেই নয়, সেগুণের সামাজিক মডেল সৃষ্টি করার দিকে। শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিত্বের উপরে এই সমস্ত প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য প্রভাবকেও সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিবেচনা করে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে, বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব কর্মসংস্থানের কাঠামোতে প্রগতিশীল পরিবর্তন ঘটায়। অর্থনীতির সার্বজনিক ক্ষেত্রে, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে, বিজ্ঞান-নিবিড় ক্ষেত্রগুলিতে ও খোদ বিজ্ঞানে, এবং অ-উৎপাদনী ক্ষেত্রে ও খুচরো বাণিজ্যে কর্মসংস্থানের হার বৃদ্ধি পায়। অন্য দিকে, কৃষিতে ও শ্রম-নিবিড় শিল্পগুলিতে সেই সব লোকের সংখ্যা কমতে থাকে যারা অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদার কাজ, একঘেয়ে কাজ করে। শ্রমিকের পেশাগত দক্ষতার পরিধি সম্প্রসারিত হচ্ছে। শ্রমিকরা প্রত্যেকে একাধিক সংশ্লিষ্ট দক্ষতা আয়ত্ত্ব করায়, একসঙ্গে অনেকগুলি মেশিন-টুল নিয়ে কাজ করতে শেখায় এবং তাদের দ্রুততা ও কর্তব্যের পরিধি প্রসারিত হওয়ায়, দেখা দেয় বহুবিধ দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকদের এক নতুন বর্গ। একাধিক সংশ্লিষ্ট কাজ যারা করে তাদের বাড়তি ভাতা দিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এই প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে।

বিকাশের গোড়ার পর্যায়ে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সাধারণত অ-উৎপাদনী ক্ষেত্রের স্বার্থের বিনিময়ে উৎপাদনী ক্ষেত্রটির সম্প্রসারণ ঘটে। এটা হয় সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তার দরুন। পরের পর্যায়গুলিতে,

প্রযুক্তির উন্নতি ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফলে আরও বেশি সহায়-সম্পদকে অ-উৎপাদনী ক্ষেত্রটিতে চালিত করা সম্ভব হয়। এই প্রক্রিয়ায় জোর দেওয়া হয় অ-উৎপাদনী ক্ষেত্রের সেই সমস্ত শাখার উপরে, যেগুলি সামগ্রিকভাবে অর্থনীতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। গত কয়েক দশকে স্বাস্থ্য কৃত্যক, শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞানে ও বিজ্ঞান কৃত্যকে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা বৈশ্বিক উৎপাদনে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যার চেয়ে দ্রুততর হারে বাড়ছে। ১৯৫০ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, বুলগেরিয়ায় শিল্প শ্রমিকদের সংখ্যা বেড়েছিল ৩.৭ গুণ, স্বাস্থ্য কৃত্যক ও সামাজিক নিরাপত্তায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা বেড়েছিল ৮.৫ গুণ, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিতে ৫.২ গুণ। সেই পর্যায়ে পোল্যান্ডে শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা বেড়েছিল ২.২ গুণ; পোর কৃত্যক, অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা ও উপভোক্তা কৃত্যকে ৫.৬ গুণ, স্বাস্থ্য কৃত্যক ও সামাজিক নিরাপত্তায় ৫ গুণ এবং শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিতে ৩.৯ গুণ।

শ্রমিকদের শিক্ষা ও দক্ষতার স্তরও তদনুসঙ্গীভাবে বাড়ছে। ১৯৭০ থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে, বুলগেরিয়ায় সম্পূর্ণ উচ্চতর বা মাধ্যমিক বিশেষীকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের শতাংশ মোট কর্মনিযুক্ত লোকসংখ্যার ১৯ থেকে ২২ শতাংশ বেড়েছিল; জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে বেড়েছিল ১২ থেকে ২০ শতাংশ; পোল্যান্ডে ১৮ থেকে ২৯ শতাংশ; এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯ থেকে ২৭ শতাংশ। শ্রমজীবী

জনগণকে শিক্ষাদান করা হয় বিনামূল্যে। কাজ করতে-করতে যারা পড়াশোনা করে তাদের নানা ধরনের সুবিধা দেওয়া হয়। ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারিক কাজ করার জন্য, পরীক্ষা দেওয়া এবং স্নাতক হওয়ার প্রকল্পগুলি প্রস্তুত করার জন্য তারা বাড়তি সবেতন ছুটি পেতে পারে। তারা একটা অননুকূল কাজের নিষ্পত্তি পাওয়ার অধিকারী। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোভিয়েত ইউনিয়নে, নৈশ স্কুলের ছাত্ররা, পড়াশোনার তৃতীয় বছর থেকে শুরুর করে, প্রত্যেক সপ্তাহে একটা বাড়তি দিন অবসর পেতে পারে তাদের নিয়মিত মজুরির ৫০ শতাংশে। হার্জেরিতে নৈশ স্কুলের ছাত্ররা তাদের পড়াশোনার জন্য প্রতি বছর ৪০ দিন অবসর পেতে পারে, তাদের গড় মজুরি তাদের জন্য সংরক্ষিত থাকে।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব এক একটি উদ্যোগের পরস্পরের মধ্যে, শিল্পগুলির অভ্যন্তরে ও পরস্পরের মধ্যে এবং উদ্যোগগুলির অভ্যন্তরে শ্রমিকদের নিবিড় পুনর্বণ্টন ঘটায়। তার ফলে জনসমষ্টির অভিপ্রাণও ঘটে এবং শ্রমজীবী জনগণের পেশাগত ও সামাজিক গতিময়তা বৃদ্ধি পায়। শ্রম-বাহিনীর পুনর্বণ্টন সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের বিশিষ্ট লক্ষণসূচক। সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগগুলির অভ্যন্তরে ও পরস্পরের মধ্যে শ্রমের গতিময়তা কার্যকর করা হয় পরিকল্পিত ভিত্তিতে; শ্রমিকদের ইচ্ছা ও পছন্দ তাতে গণ্য করা হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোভিয়েত ইউনিয়নে, শ্রম-বাহিনীর পুনর্বণ্টন এই ধরনের সব সাংগঠনিক রূপ ধারণ করতে

পারে, যেমন — ঐচ্ছিক সংগঠনগুলি মারফৎ কাজে ভর্তি করা, সংগঠিত লোক-সংগ্রহ, এক গ্রামাঞ্চল থেকে অন্য গ্রামাঞ্চলে পরিবারদের স্থানান্তরণ, এক কাজ থেকে আরেক কাজে শ্রমিকদের বদলি, বা সংগঠিতভাবে কাজের স্থান নির্দিষ্ট করে দেওয়া। শ্রমিকরা নিজেদের উদ্যোগেও তাদের কর্মস্থল বদলাতে পারে, অথবা পুরোপুরি তাদের কাজ বা পেশাও বদলাতে পারে।

এই রূপগুলির প্রত্যেকটি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যানুগ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অধিকতর জাতীয়-অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন নির্মাণ প্রকল্পগুলিতে শ্রমিকদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে শ্রম-বাহিনীর আঞ্চলিক পুনর্বণ্টনের সঙ্গে জড়িত থাকে স্বেচ্ছারতী সংগঠনগুলির (যুব কমিউনিস্ট লীগ ও অন্যান্য) পক্ষ থেকে জনসমষ্টির উদ্দেশ্যে বিশেষ আহ্বান। যাকে সংগঠিত লোক-সংগ্রহ বলা হয়েছে, সেটা এমন সব এলাকায় অবস্থিত অধিকতর শ্রম-নিবিড় ও মরশুমি শিল্পে শ্রম-বাহিনী পুনর্বণ্টনের উদ্দেশ্য পূরণ করে, যে এলাকাগুলি দূরধিগম্য অথবা যেখানে শ্রমশক্তির অভাব আছে। শ্রম-বাহিনীর গ্রামীণ পুনর্বণ্টনের লক্ষ্য হল সেই সমস্ত যৌথখামার ও রাষ্ট্রীয় খামারে শ্রমশক্তির যোগান দেওয়া, যেগুলির হাতে বিরাট বিরাট এলাকার জমি থাকলেও, লোকবল নেই। এক উদ্যোগ থেকে আরেক উদ্যোগে শ্রমিকদের স্থানান্তরণ লোকবলের শিল্প-অভ্যন্তরস্থ পুনর্বণ্টন সংগঠিত করার উদ্দেশ্য পূরণ করে এবং চালু হতে চলেছে এমন সব বড় শিল্পব্যবস্থাগুলিতে শ্রম যোগানোর উদ্দেশ্য পূরণ

করে। আধুনিকীকরণের দরুন উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে ছাড়া পাওয়া শ্রমিকদের কাজের স্থান নির্দিষ্টকরণেও এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

শহর ও আঞ্চলিক স্তরে সংগঠিতভাবে কাজের স্থান নির্দিষ্টকরণ প্রয়োগ করা হয় শ্রম সম্পদের শিল্প-অভ্যন্তরস্থ ও আন্তঃ-শিল্পাভিত্তিক পুনর্বণ্টন কার্যকর করার জন্য। কাজে ভর্তি হওয়ার একক ব্যক্তিগত রূপ ব্যক্তিগত কারণে পুনর্বণ্টনের সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এই রূপটি সমাজের স্বার্থ ও ব্যক্তিগত স্বার্থের সামঞ্জস্যবিধান সম্ভব করে তোলে, এবং শ্রমিকদের একটা কাজ বা পেশা অবাধে বেছে নেওয়ার অধিকারকে তথা উদ্যোগগুলির নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মী নিয়োগের অধিকারকে নিশ্চিত করা সম্ভব করে তোলে। সোভিয়েত ইউনিয়নে কাজের স্থান নির্দিষ্টকরণের সংগঠিত ও একক, ব্যক্তিগত রূপের মধ্যে অনুপাতটা হল ১:৪।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অর্থনীতি পরিকল্পিত ভিত্তিতে বিকশিত হতে থাকায়, সেই রাষ্ট্র জনশক্তির জন্য 'আকর্ষণ' ও 'বিকর্ষণ' এলাকা গঠন করে ও তার দ্বারা এক পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে সক্ষমদেহ জনসমষ্টির ব্যক্তিগত অভিপ্রাণের আয়তন ও গতিমুখের উপরে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোভিয়েত ইউনিয়নে, সাইবেরিয়া ও দূর প্রাচ্যের বিকাশসাধনের প্রচেষ্টা জনসমষ্টির আঞ্চলিক গতিময়তা গড়ে তোলে। বিকাশাধীন অঞ্চলগুলিতে জনসমষ্টিকে আকৃষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত প্রধান প্রণোদনা হল আঞ্চলিক ভাতা ও

বোনাস। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্দোবস্তগুলির বিপুল পরিসর নির্মাণকর্ম ও এই সমস্ত অঞ্চলে উচ্চ মানের সামগ্রীর অগ্রাধিকারমূলক যোগানও গুরুত্বপূর্ণ। এ সবই অর্জিত হয় সাইবেরিয়া ও দূর প্রাচ্যের উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ ও বণ্টনের এক কর্মসূচির ভিত্তিতে।

কৃষি শ্রমিকদের এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে পুনরায় বসতিস্থাপনকে উৎসাহ যোগানোর জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলির মধ্যে আছে গৃহ ও উপগৃহ নির্মাণেচ্ছ, গবাদি পশু ও স্থায়ী পণ্য ক্রেতেচ্ছ, শ্রমিকদের একটা থোক অপরিশোধ্য ভাতা প্রদান ও সুবিধাজনক ঋণদান।

সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রম-বাহিনীর পরিকল্পিত পুনর্বণ্টনে উৎসাহ যোগান গুরুত্বপূর্ণ, কারণ রুশ ফেডারেশনের সমস্ত অঞ্চলে ও দেশের ইউরোপীয় অংশে অবস্থিত প্রজাতন্ত্রগুলিতে শ্রম সম্পদ বাড়ী কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে, পক্ষান্তরে মধ্য এশিয়ায় অবস্থিত প্রজাতন্ত্রগুলিতে, তথা কাজাখস্তান, আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার সক্ষমদেহ জনসমষ্টির বৃদ্ধিহার উৎপাদনের প্রয়োজনকে অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছে। যে সব অঞ্চলে শ্রম সম্পদের অভাব আছে আর যে সব অঞ্চলে তার প্রাচুর্য আছে, এই দুইয়ের নাটকীয় পার্থক্য রয়েছে প্রাকৃতিক অবস্থা ও নৃজাতিগত গঠনবিন্যাস উভয় দিক দিয়েই। এতে জনসমষ্টির প্রবাহ ব্যাহত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে, যে-সমস্ত অঞ্চলে জনশক্তির আধিক্য আছে সেখানে বাড়তি কাজ সৃষ্টি করা উৎপাদনের প্রয়োজনের

সঙ্গে শ্রম সম্পদকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য অত্যাৱশ্যক। সমাজতন্ত্রে কর্মসংস্থানের কাঠামোয় কিছু কিছু পরিবর্তনের কারণ হল অর্থনীতিতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

সমাজতন্ত্র নারীদের ক্ষেত্রে কাজের বৈষম্য দূর করে এবং সমাজে তাদের পূর্ণ সমানাধিকার নিশ্চিত করার অবস্থা সৃষ্টি করে। সামাজিক উৎপাদনে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণের সহায়ক হয় সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমের চরিত্র — শ্রম হল শোষণমুক্ত এবং শ্রমজীবী জনগণের প্রমবৰ্ধমান সুখস্বাচ্ছন্দ্যের একমাত্র উৎস। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সংবিধানে পুরুষদের সঙ্গে নারীর সমানাধিকার শৃঙ্খল দেওয়াই হয় না, নারীদের এই সমস্ত অধিকার প্রকৃতই প্রয়োগ করার সুযোগেরও নিশ্চিতি দেওয়া হয়।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সামাজিক উৎপাদনে নারীদের অংশগ্রহণের উচ্চহার দেখা যায়। পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদের সদস্যদেশগুলিতে ১৯৮০-এর দশকে নারীরা হল কারখানা শ্রমিক ও অফিস কর্মীদের মধ্যে ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ। জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নে সমস্ত শ্রমিক ও কর্মচারীর অর্ধেকের বেশি হল নারী। বুলগেরিয়ায় ও জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে কাজ করার মতো বয়সের সমস্ত নারীর ৮০ শতাংশের বেশি, এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে ৯০ শতাংশের বেশি হয় অর্থনীতিতে নিযুক্ত, না হয় পূর্ণ সময় পড়াশোনা করে।

১৯৮২ সালে, অর্থনীতির সার্বজনিক ও সমবায়িক ক্ষেত্রগুলিতে নিযুক্ত নারীদের অনুপাত ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে ৫১.১ শতাংশ, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ৫০.৩, বুলগেরিয়ায় ৪৯.২, মঙ্গোলিয়ায় ৪৮, চেকোস্লোভাকিয়ায় ৪৬.৬, হাঙ্গেরিতে ৪৪.৯, পোল্যান্ডে ৪৩.৩, রুমানিয়ায় ৩৮.২, ও কিউবায় ৩৫.৯ শতাংশ।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সামাজিক উৎপাদনে নারীদের উপযুক্ত ভূমিকা নিশ্চিতপ্রদত্ত। বৈশিষ্ট্যের বিষয়, ক্রমবর্ধমান সংখ্যক নারী নিযুক্ত রয়েছে সবচেয়ে ভালো সরঞ্জামযুক্ত শিল্পগুলিতে, যেমন মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতু কর্মে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, হাঙ্গেরিতে শিল্পে নিযুক্ত কারখানা শ্রমিক ও অফিস কর্মীদের প্রায় ৪৫ শতাংশ হল নারী; বুলগেরিয়া ও মঙ্গোলিয়ায় তারা যথাক্রমে প্রায় ৪৯ শতাংশ ও ৫৫ শতাংশের বেশি।

ক্রমবর্ধমান সংখ্যক নারী গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনাগত পদে অধিষ্ঠিত (শিফ্ট পরিচালিকা, দলনেত্রী, কর্মশালার অধীক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার, অর্থনীতিবিদ, কৃষি-অর্থনীতিবিদ, প্রতিষ্ঠান ও উদ্যোগগুলির প্রধান)।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব কৃষিতে নিযুক্ত নারীদের শ্রমে গভীর গুণগত পরিবর্তন ঘটায়। কৃষক নারীর কাজ ক্রমেই বেশি করে হয়ে ওঠে শিল্প শ্রমের অনুরূপ। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে ট্রাক্টর ড্রাইভার, কম্বাইন অপারেটর, কৃষি-অর্থনীতিবিদ, গবাদি পশু বিশেষজ্ঞ ও খামারের ম্যানেজারদের মধ্যে অনেকেই নারী।

বিজ্ঞান, জনস্বাস্থ্য কৃত্যক, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কলার
বিকাশে নারীদের অবদান অমূল্য।

পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদভুক্ত
দেশগুলিতে জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তায় নিযুক্ত
প্রত্যেক পাঁচজন কর্মীর মধ্যে চারজন হল নারী। জার্মান
গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড
ও চেকোস্লোভাকিয়ার জনস্বাস্থ্য কৃত্যকে নারীদেরই
সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সমস্ত
সংস্কৃতিকর্মী ও শিক্ষাব্রতীর ৬০ থেকে ৭৫ শতাংশ
হল নারী। বুলগেরিয়া ও জার্মান গণতান্ত্রিক
প্রজাতন্ত্রে সমস্ত বিজ্ঞানকর্মীর ৫০ শতাংশের বেশি হল
নারী।

শিক্ষার দ্বারান্বিত বিকাশ ও নারীদের পেশাগত
দক্ষতার দ্রুতগত উন্নতি সামাজিক উৎপাদনে তাদের
ব্যাপক অংশগ্রহণে অনেকখানি সাহায্য করেছে।
সমাজতান্ত্রিক সমাজ নারীদের ক্ষেত্রে মজদুরির বৈষম্য
বিলুপ্ত করেছে। শিক্ষা, বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা
উন্নত করার সুযোগের ব্যাপারে নারীরা পুরুষদের
মতোই সমান অধিকার ভোগ করে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯৮০ সালে
জাতীয় অর্থনীতিতে নিযুক্ত নারীদের ২৯.৫ শতাংশ
ছিল উচ্চতর বা মাধ্যমিক বিশেষীকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত।
১৯৪০ সালে সমস্ত শ্রমজীবী নারীর মধ্যে মাত্র ৬.৫
শতাংশের ছিল এই ধরনের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাগত
যোগ্যতা।

নারীরা হল সমস্ত মানসিক শ্রমিকদের ৬০ শতাংশ,

উচ্চতর ও মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের ৫৯ শতাংশ এবং সমস্ত বিজ্ঞানী ও গবেষণা কর্মীদের ৪০ শতাংশ।

নারী কার্যিক শ্রমিকদের দক্ষতার স্তর অনেকখানি বেড়েছে। প্রতি বছর সোভিয়েত ইউনিয়নে সমস্ত শ্রমিকের প্রায় ৩০ শতাংশ নিজেদের দক্ষতা উন্নত করে। পুরুষদের ও নারীদের দক্ষতার স্তরের মধ্যে ব্যবধান সংকুচিত হচ্ছে। ১৯২০-এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নে নারী কার্যিক শ্রমিকদের গড় দক্ষতার স্তর যেখানে ছিল পুরুষ শ্রমিকদের গড় দক্ষতার স্তরের চেয়ে ২ বা ৩ বাপ নিচে সেখানে আজকাল সেই ব্যবধানটা কমে গিয়ে ১-১.৫ ধাপে দাঁড়িয়েছে।

অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশেও অনুরূপ প্রক্রিয়াসমূহ পরিলক্ষিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে নারীদের, বিশেষত মারোদের, শ্রম ও স্বাস্থ্য সুদৃক্ষিত করার জন্য বহু ব্যবস্থার সংস্থান রাখা হয়েছে আইনে। মেয়েদের কাজের অধিকার প্রয়োগ করার পক্ষে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চিতি। নারী শ্রম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সংবিদ্যাগুলি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে পুরোপুরি মেনে চলা হয়: ভূগর্ভস্থ, স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক, কঠোর শ্রমসাধ্য বা ক্ষতিকর কাজে মেয়েদের নিষিদ্ধ করা নিষিদ্ধ (প্রাণধানযোগ্য যে, দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়লাখনি শ্রমিকদের মধ্যে একটা অংশ হল নারী)।

নারীদের কাজ করার অধিকারের অর্থনৈতিক নিশ্চিতিগুলির মধ্যে আছে শিশু-পরিচর্যা ব্যবস্থার

বিস্তৃত জালবিস্তার (ফ্রেশ, কিন্ডারগার্টেন, সারা দিনের স্কুল গোষ্ঠী); যোগদান শিশুসন্তানদের লালনপালন করার সঙ্গে সামাজিক উৎপাদনে অংশগ্রহণকে মেলাতে নারীদের সক্ষম করে তোলে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, বুলগেরিয়ায় ৩ থেকে ৭ বছর বয়সের শিশুদের ৭৫.৫ শতাংশ কিন্ডারগার্টেনে যায়। হাঙ্গেরিতে ৩ থেকে ৬ বছর বয়সের সমস্ত শিশুর ৮৫ শতাংশ এবং ৩ বছর বয়সের কম শিশুদের ১৫ শতাংশ কিন্ডারগার্টেনে যায়। ১৯৭৮ সালে, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে তিন বছরের কম বয়সের শিশুদের ৬০ শতাংশকে পরিচর্যা করা হয়েছিল ফ্রেশে, এবং ৩ বছর বয়স ও স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগের বয়সের শিশুদের ৯০ শতাংশ যেত কিন্ডারগার্টেনে এবং প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর স্কুলের ছেলেমেয়েদের ৭৫ শতাংশের বেশির পরিচর্যা করা হত সারা দিনের স্কুল গোষ্ঠী ব্যবস্থায়।

উপভোক্তা কৃত্যকসমূহকে একটা বড়, যন্ত্রীকৃত শিল্পে পরিণত করার মধ্য দিয়ে এবং ঘর-সংসারের কাজ সহজতর করার মতো কৃত্যক ও সামগ্রীর লভ্যতা বিস্তৃত করে উৎপাদনে নারীদের ব্যাপকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ ব্যাপারে অনেক কিছুই ইতিমধ্যে অর্জিত হয়েছে। গৃহস্থালির সরঞ্জামের চাহিদা দ্রুত হারে পূরণ করা হচ্ছে। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নে রেফ্রিজারেটর, কাপড়-কাচার যন্ত্র, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ও অনুরূপ সামগ্রীর চাহিদা আরও ব্যাপকতর পরিসরে পূরণ করা হয়।

১৯৬৫ সালে মাত্র ১১ শতাংশ পরিবারের রেফ্রিজারেটর ছিল সেখানে ১৯৮০ সালে তা ছিল চার-পঞ্চমাংশেরও বেশি পরিবারের। আজকাল ৭০ শতাংশ সোভিয়েত পরিবারের কাপড়-কাচার যন্ত্র আছে। এটা হল ১৯৬৫ সালের তুলনায় চারগুণ বেশি। গৃহস্থালির সামগ্রীর গুণগত মান নিয়ত উন্নত করা হয় এবং সেগুলির পরিধি বিস্তৃত করা হয়।

নারীদের কাজ করার অধিকারের নিশ্চিতি প্রদানের ব্যাপারে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সাফল্য সম্ভব হয়েছে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দরুন, তথা সকল নাগরিকের কাজ করার অধিকার নিশ্চিত করা ও জনগণের বৈষয়িক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত চাহিদা সর্বাধিক মাত্রায় পূরণ করার উদ্দেশ্যে সেখানকার সরকারগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মনীতির দরুন।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে শিশু শ্রম (অর্থাৎ ১৬ বা ১৭ বছর বয়সের কম শিশু ও বালকবালিকাদের কাজ) আইনত নিষিদ্ধ। শিশুরা জড়িত হতে পারে শুল্ক শ্রম-শিক্ষা কর্মসূচিগুলিতে, স্কুলের চৌহদ্দির ভিতরে বিশেষ চাষ-আবাদের জমিতে কাজ করতে পারে, এবং স্কুলে অন্যান্য বৃত্তিশিক্ষামূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে।

উপরে বিবেচিত বিষয়গুলি — শ্রমের সর্বজনীনতা, কাজ করার ও পেশা বা বৃত্তি বেছে নেওয়ার অধিকার, এবং কর্মসংস্থানের কাঠামোয় বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবজনিত পরিবর্তন — পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত মালিকানার তুলনায় উৎপাদনের উপায়ের উপরে

সমাজতান্ত্রিক সার্বজনিক মালিকানার সুফলগুলি প্রকাশ করে। উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমাজতান্ত্রিক সার্বজনিক মালিকানাই প্রধান উৎপাদিকা শক্তি হিশেবে ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কে অংশগ্রাহী হিশেবে মানদ্বয়ের আত্মপ্রকাশে শ্রমের দ্রুতবর্ধমান ভূমিকার হেতু। শ্রম যে সামাজিকভাবে আরও বেশি সুসমঞ্জস হয়ে ওঠে, মানদ্বয়ের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান বিষয়ে পরিণত হয়, এটাই সমাজতন্ত্রের বিতর্কাতীত সুফল।

সমাজতন্ত্রে শ্রম ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের শুদ্ধ একটা উপায়ই নয়, তা আয়ের উৎসও। পরবর্তী পরিচ্ছেদে সমাজতন্ত্রে জনগণের আয়ের গঠনরূপ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

৩। সমাজতন্ত্রে শ্রমজীবী জনগণের আয়

সমাজতন্ত্রে শ্রমজীবী ব্যক্তির আয় দু'টি অংশ দিয়ে গঠিত। তার মূল অংশ আসে কৃত কাজ অনুযায়ী বণ্টন থেকে এবং অপরটি সামাজিক ভোগ তহবিল থেকে। প্রথম অংশটি হল নিজের জন্য করা কাজের ফল এবং দ্বিতীয় অংশটি, সমাজের উপকারের জন্য করা কাজের ফল।

সমাজতন্ত্রে বৈষয়িক সম্পদ ও সাংস্কৃতিক সুফল-গুলি বণ্টনের ভিত্তি হল এই নীতি: 'প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী, প্রত্যেককে তার কাজ অনুযায়ী।' কৃত কাজ অনুযায়ী বণ্টন দরকার কারণ সমাজতন্ত্র তৎক্ষণাৎই বৈষয়িক সম্পদের প্রাচুর্য সৃষ্টি

করে না, এবং শ্রম তৎক্ষণাৎই মৃদু, মৌল চাহিদা হয়ে ওঠে না। প্রাধান্যশালীভাবে মানসিক শ্রম ও প্রাধান্যশালীভাবে কার্যিক শ্রম, কৃষি ও শিল্প শ্রম, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রম, ব্যবস্থাপকদের শ্রম ও তাদের নির্দেশ যারা পালন করে তাদের শ্রম — এগুলি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক দিয়েই এখনও ভিন্ন। সুতরাং সমাজতন্ত্রে শ্রম ভোগের দিক দিয়ে জনগণের সমানতা তৎক্ষণাৎ নিশ্চিত করতে পারে না। কৃত কাজ অনুযায়ী বণ্টন শ্রমের পরিমাপ ও ভোগের পরিমাপের মধ্যে একটা যোগসূত্র স্থাপন করে। জটিলতর, অধিকতর দক্ষতার শ্রমের পারিশ্রমিক দেওয়া হয় বেশি।

কৃত কাজ অনুযায়ী বণ্টন রাষ্ট্রায়ত্ত্ব উদ্যোগগুলিতে কর্মশালার শ্রমিক বা অফিস কর্মীদের মজুরি বা বেতনের রূপ নেয়, এবং সমবায়গুলিতে কাজের পারিশ্রমিকের রূপ নেয়।

মজুরি হল শ্রম-বাহিনীর স্বাভাবিক পুনরুৎপাদনের জন্য অত্যাৱশ্যক জীবনধারণের উপায়ের তহবিল। শ্রমিককে তার কাজের পারিশ্রমিক বাবদ যে অর্থ দেওয়া হয় শ্রমিক তা সরাসরি খরচ করে ভোগের সামগ্রী ও কৃত্যকসমূহের পিছনে।

মজুরির দুটি প্রধান রূপ হল সময় হিসাবে মজুরি ও ফুরন-হারে মজুরি। ফুরন-হারে মজুরির ক্ষেত্রে, শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারিত হয় একটা নির্দিষ্ট উৎপাদের জন্য অথবা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কৃত কাজের জন্য নির্দিষ্ট মূল্য-পরিশোধের হার দিয়ে। ফুরন-হারে মজুরির প্রধান সুবিধা এই যে শ্রমিককে

তা নিজের শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে একটা প্রত্যক্ষ প্রণোদনা যোগায়। কিন্তু পারিশ্রমিকের এই রূপটি শুধু সেই সমস্ত উৎপাদন ক্ষেত্রেই সীমিত, যেখানে প্রত্যেক শ্রমিকের উৎপাদ পরিমাপ করা যায়।

সময় হিসাবে মজদুরির ক্ষেত্রে কাজের ফল আর উপার্জনের পরিমাণের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ যোগসূত্র নেই। মজদুরি নির্ভর করে যে সময়টা ধরে কাজ করা হয়েছে তার দৈর্ঘ্যের উপরে। শ্রমিকের দক্ষতা, তার করা কাজটির গুরুত্ব এবং তার কাজের অবস্থার কথাও গণ্য করা হয়। সময় হিসাবে মজদুরিপ্রদান ব্যবহার করা হয় সেই সব ক্ষেত্রে, যখন একজন একক শ্রমিকের উৎপন্ন উৎপাদ পরিমাপ করা দুরূহ এবং যখন উচ্চ গুণগত মান নিশ্চিত করা বিশেষভাবেই জরুরি।

ক্রমবর্ধমান পরিসরে উৎপাদনের অটোমেশন প্রবর্তিত হতে থাকায়, এবং উৎপাদের গুণগত উৎকর্ষের উপরে বেশি জোর পড়তে থাকায়, সময় হিসাবে মজদুরিই পারিশ্রমিকের অন্য সমস্ত রূপের উপরে অগ্রাধিকার লাভ করে।

কৃত কাজ অনুযায়ী বণ্টনের ভিত্তি হল সামাজিক উৎপাদন চলাকালে শ্রমিকের দ্বারা ব্যয়িত শ্রমের পরিমাণ ও গুণ। শ্রমের পরিমাণ পরিমাপ করা হয় নির্দিষ্ট ধরনের সরঞ্জাম, প্রযুক্তি ও উৎপাদনের সংগঠনের সাহায্যে একটি জিনিস উৎপন্ন করার জন্য বা একটি নির্দিষ্ট উৎপাদনী ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় কাজের সময় দিয়ে।

কৃত কাজের পরিমাণ নির্ধারণ করার পক্ষে নিরামক

গুরুত্বপূর্ণ হল মান নির্ধারণ (কাজের সময়, উৎপাদ, সার্ভিসিং, কর্মি-বাহিনী, প্রভৃতির মান স্থির করা)। শ্রমের মানগুণি স্থির করা হয় বিজ্ঞানসম্মতভাবে, প্রযুক্তিগতভাবে, শারীরবৃত্তীয়ভাবে, অর্থনৈতিকভাবে এবং শ্রমের সামাজিক দিকগুণি যথাযথভাবে গণ্য করে।

সমাজতন্ত্রে মান নির্ধারণের ভিত্তি হল এই যে ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করাই উৎপাদনের চরম লক্ষ্য বলে, শ্রম নিবিড়করণের সামাজিক সীমা আছে। সামনের সারির উদ্যোগগুণির (পরিমেলগুণির) অভিজ্ঞতা গণ্য করে এবং বিদ্যমান ক্ষমতা-সম্ভাবনাকে সমবেত করার লক্ষ্য নিয়ে শ্রমের মানগুণি স্থির করা হয়। সেই সঙ্গে সেই মানগুণি বাস্তবসম্মত, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় দক্ষতার অধিকারী শ্রমিকরা তা পূরণ করতে পারে। শ্রমের মানগুণি আপেক্ষিকভাবে স্থিতিশীল। নতুন যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম বসানো হলে, অগ্রসর প্রযুক্তি প্রবর্তিত হলে, শ্রমসংগঠন উন্নত করা হলে সেগুণি পুনর্বিচার-পরিবর্তন করা হয়।

একটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে, সমাজ দক্ষতার বিভিন্ন স্তর ও কাজের জটিলতার মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করে, এবং তার ভিত্তিতে উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে ও পরিকল্পিত ধরনে মজুরির পার্থক্য স্থির করে।

দক্ষতার স্তরের প্রয়োজন নির্ধারণ করার সময়ে, সমাজ অগ্রসর হয় সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় সেই সময়ের পার্থক্যের পরিমাণ থেকে, আবশ্যকীয় দক্ষতা অর্জনে শ্রমিক যে সময় ব্যয় করে। এই বিষয়টাকে তা

গণ্য করে যে দক্ষতা আয়ত্ত করার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যয় হল বৈষয়িক ব্যয়, যেগুলি এক দিকে ব্যয়িত সময়ের মোটামুটি সমানুপাতিক এবং অন্য দিকে, এই ব্যয়ের অনেকগুলি সমাজই মেটায়, অবৈতনিক শিক্ষা, ছাত্র বৃত্তি ও অন্যান্য সুবিধার ব্যবস্থা করে। প্রশিক্ষণ দিয়ে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকদের তৈরি করার জন্য অর্থনীতির প্রয়োজনটা কত জরুরি, তাও গণ্য করা হয়। এ ব্যাপারে যে সমস্যাটা দেখা দেয় তা হল — মজুরির পার্থক্য শ্রমের জটিলতার (অর্থাৎ, শ্রমিকদের দক্ষতার স্তরের) প্রভেদের সঙ্গে সমরূপ হওয়া উচিত কিনা, কিংবা এই ধরনের প্রভেদের হার (ধাপ) এমন হওয়া উচিত কিনা, যাতে শ্রমিককে দক্ষতা শেখানো বাবদ সমাজের ব্যয় শ্রমিক তার কাজের বছরগুলি ধরে পরিশোধ করতে পারে।

প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা ও বৈষয়িক প্রণোদনা যোগানোর রীতি থেকে দেখা যায়, উৎপাদের গুণগত উৎকর্ষের ভিত্তিতে মজুরির প্রভেদন যদি কার্যকর হতে হয় তাহলে সেই পার্থক্য যাতে প্রয়োজনীয় দক্ষতার স্তর অর্জন নিশ্চিত করার মতো যথেষ্ট হয় — আপেক্ষিক ও অনাপেক্ষিক উভয় দিক দিয়েই — এবং জটিল শ্রম দরকার এমন সমস্ত কর্মখালি (যেগুলি আজ রয়েছে এবং ভবিষ্যতে সৃষ্টি হবে) যাতে উপযুক্ত দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকদের দিয়েই পূর্ণ করা হয়, সেটা জরুরি।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্র নির্মাণের কালপর্বে মজুরির ব্যবস্থাটা গড়ে উঠেছিল কৃত কাজ অনুযায়ী বন্টনের একটি রূপ হিসেবে, সমান কাজের

জন্য সমান পারিশ্রমিক নিশ্চিত করা হয়েছিল। কৃত কাজের পরিমাণ ও গুণগত উৎকর্ষ অনুযায়ী মজুরির প্রভেদন এখানে পূর্বানুমিত, এবং কাজের অবস্থা, শ্রমিকদের দক্ষতা, জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে সেই নির্দিষ্ট শিল্পটির গুরুত্ব ইত্যাদি তাতে যথাযথভাবে গণ্য করা হয়।

সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক নিশ্চিত করার সঙ্গে সঙ্গে মজুরি ব্যবস্থার প্রধান কর্তব্যকর্ম হল শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো ও তার দ্বারা শ্রমজীবী জনগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য উন্নত করা। ১৯৭০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে ১৯৮০-এর দশকের মধ্যভাগ, এই সময়ে সোভিয়েত শিল্প শ্রমিকদের মাসিক উপার্জন ১৬১ রুবল থেকে বেড়ে হয়েছে ২১০ রুবল।

টারিফ প্রথা (মজুরির আনুপাতিক হার বেঁধে দেওয়া) কাজের গুণগত উৎকর্ষ মূল্যায়নের প্রধান পদ্ধতি। মূল পারিশ্রমিক (টারিফ) ও বোনাস, এই দিয়ে মজুরি গঠিত। টারিফই পারিশ্রমিকের বৃহদংশ। তাতে প্রতিফলিত হয় কাজের গুণগত উৎকর্ষ এবং কাজের জটিলতা ও গুরুত্ব। টারিফ প্রথায় প্রতিফলিত হয় শ্রমিকদের দক্ষতা, একটি পেশা পুরোপুরি আয়ত্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় সময়, স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বা বিপজ্জনক কাজের অবস্থা এবং কাজের শ্রমসাধ্যতা।

মূল পারিশ্রমিক ও কাজের চূড়ান্ত ফলাফলের মধ্যে কোনো প্রত্যক্ষ যোগসূত্র নেই। যোগসূত্র স্থাপিত হতে পারে শুধু বোনাসের মধ্য দিয়ে। বোনাস দেওয়া হয় এই সমস্ত বিষয়ের জন্য: নানা ধরনের মিতব্যয়িতা

(সময়, বস্তু, উপকরণ, জ্বালানি, শক্তি, প্রভৃতির মিতব্যয়িতা); উৎপাদের উচ্চতর গুণগত উৎকর্ষ; কৃৎকৌশলগত উন্নয়ন ও নবোদ্ভাবনা; কাজের উন্নততর সংগঠন (কর্মসংখ্যা হ্রাস সমেত)। তাই একক শ্রমিকদের ও গোটা এক একটি কর্ম-সংঘের কৃত কাজের কার্যকরতা বাড়ানোর পক্ষে বোনাস বিরাট গুরুত্বপূর্ণ।

কৃত কাজ অনুযায়ী বণ্টন ব্যবহার করা হয় সার্বজনিক (রাষ্ট্রায়ত্ত) উদ্যোগ ও সংগঠনগুলিতে, এবং যৌথখামারগুলিতে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে, কৃত কাজ অনুযায়ী বণ্টন উৎপাদনের সমবায়িক রূপটির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। যৌথখামারগুলিতে বণ্টনের রূপগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগসমূহে ব্যবহৃত রূপগুলির কাছাকাছি চলে আসছে। একটি সমবায়িক উদ্যোগের প্রতিটি সদস্য উদ্যোগটির মোট আয়ের একটা অংশ পায় তার শ্রমের বিনিময়ে।

রাশিয়ায় ১৯১৭-এর অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লবের অব্যবহিত কালপর্বে, এই দেশে সমবায়গুলি তাদের আয় বণ্টন করত প্রধানত সমানীকরণের নীতিতে। গোড়ার দিকের সমবায়গুলিতে বণ্টনের সবচেয়ে বহুলপ্রচলিত রূপটি ছিল ‘কতজনকে আহার যোগাতে হবে’ সেই সংখ্যা অনুযায়ী, অর্থাৎ তার সদস্যদের সংখ্যা অনুযায়ী বণ্টন। চাষ-আবাদ করা জমির আয়তন ও কর্মীদের সংখ্যার ভিত্তিতে বণ্টনের এক সম্মিলিত ব্যবস্থাও ব্যবহার করা হত।

সোভিয়েত ইউনিয়নে যৌথখামারগুলিতে,

যৌথখামারিদের আয়ের প্রধান উৎস হিশেবে কৃত কাজ অনুযায়ী বণ্টনের আগে বণ্টনের অন্যান্য রূপও ব্যবহৃত হয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯২৮ সালে, সোভিয়েত যৌথখামারগুলির ১১ শতাংশ তাদের আয় বণ্টন করত খামারিদের সদস্য-চাঁদার অনুপাতে; ১৬.৩ শতাংশ বণ্টন করত সামাজিকীকৃত জমির এলাকার অনুপাতে; ৫.৭ শতাংশ বণ্টন করত সামাজিকীকৃত গবাদি পশুর সংখ্যা অনুযায়ী; এবং ২০.৪ শতাংশ বণ্টন করত যৌথখামারগুলির ব্যবহৃত কৃষকদের উৎপাদনের উপায়ের পরিমাণ অনুযায়ী।

জমি দ্রুতবর্ধমান পরিসরে সামাজিকীকৃত হতে থাকায়, এবং যৌথখামারের কাছে হস্তান্তরিত জমির এলাকার অনুপাতে শ্রমের পারিশ্রমিক ক্রমে ক্রমে লুপ্ত করায়, কৃত কাজ অনুযায়ী বণ্টনের নীতি ব্যাপকতর পরিসরে প্রযুক্ত হতে শুরু করেছিল। কর্ম-দিবসের একককে যৌথখামারগুলিতে পারিশ্রমিক দানের একক হিশেবে প্রবর্তন করা হয়েছিল।

কর্ম-দিবসের একক ছিল একটি যৌথখামারে কৃষকদের ব্যয়িত শ্রমের একটি পরিমাপ এবং কৃত কাজ অনুযায়ী বণ্টনের একটি পরিমাপ। শ্রম ও ভোগের পরিমাপ হিশেবে কর্ম-দিবসের একটিতে প্রতিফলিত হয়েছিল সমবায়িক উদ্যোগের বিকাশের এক নির্দিষ্ট পর্যায়ে তার বৈশিষ্ট্যগুলি। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন আরও সামাজিকীকৃত হওয়ায় কর্ম-দিবসের এককে মজুরির বিশিষ্ট লক্ষণসূচক কতকগুলি বৈশিষ্ট্যও দেখা দিতে শুরু করেছিল। গোড়ার দিকে তা প্রকাশ

পেয়েছিল কর্ম-দিবসের এককে নগদ পারিশ্রমিকের শতকরা ভাগ বৃদ্ধির মধ্যে। পরবর্তীকালে গৃহগত পরিবর্তনও ঘটেছিল। যৌথখামারগড়ালিতে কাজ বাবদ পারিশ্রমিকের হার স্থির করার উপরে রাষ্ট্র আরও বেশি প্রভাব বিস্তার করতে শুরুর করেছিল।

নিশ্চিতপ্রদত্ত মাসিক নগদ পারিশ্রমিকদানে উত্তরণ এক দিকে কর্মশালার শ্রমিক ও অফিস কর্মী, এবং অন্য দিকে যৌথখামারিদের মধ্যে সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভেদ হ্রাস করেছিল — অন্তত কৃত কাজ অনুযায়ী বণ্টনের ব্যাপারে। বিভিন্ন যৌথখামারে পারিশ্রমিকের হারের পার্থক্যও তা হ্রাস করেছিল।

কাজের জন্য নিশ্চিতপ্রদত্ত নিয়মিত পারিশ্রমিকদানের নীতি প্রতিষ্ঠার ফলে মজদুরি তহবিল গঠনের এক আমূল নতুন ভিত্তি সৃষ্টি হয়; এই মজদুরি তহবিল বর্তমানে যৌথখামারগড়ালির উৎপাদন-ব্যয়ের একটা অখণ্ড অংশ, ন' দে ও সামগ্রীতে খামারের আয় বণ্টনের পরে পড়ে থাকা অবশিষ্টাংশ নয়।

সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে মজদুরি ও বেতনের চেয়ে যৌথখামারিদের পারিশ্রমিক দ্রুততর হারে বাড়ে বলে, খামারিদের উপার্জন আর কারখানা শ্রমিক ও অফিস কর্মীদের আয়ের মধ্যে ব্যবধান সংকুচিত হচ্ছে।

উৎপাদনের উপায়ের উপরে সার্বজনিক মালিকানার দুটি রূপ কাছাকাছি আসার ফলে, এবং কৃষি শ্রম বিকাশলাভ করে শিল্প শ্রমেরই একটা প্রকারভেদে পরিণত হওয়ার ফলে যৌথখামারিদের পারিশ্রমিক আর রাষ্ট্রায়ত্ত্ব উদ্যোগগড়ালিতে নিযুক্ত কারখানা শ্রমিক ও

অফিস কর্মীদের পারিশ্রমিকের পার্থক্য পুরোপুরি লোপ পাবে। এর জন্য অবশ্য দীর্ঘ সময় লাগবে। কমিউনিজম নির্মাণকর্ম যতদিন পর্যন্ত পুরোপুরি সম্পূর্ণ না হচ্ছে, ততদিন অবাধি কৃত কাজ অনুযায়ী বন্টনই শ্রমজীবী জনগণের আয়ের উৎস হিসেবে প্রাধান্যশালী থাকবে।

কৃত কাজ অনুযায়ী বন্টন জনগণের সামর্থ্য ও ক্ষমতার বিকাশকে প্রভাবিত করে। সৃষ্টিশীল শ্রমে প্রবৃত্ত হওয়া, নিজেদের দক্ষতা বাড়ানো এবং শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক স্তর উন্নত করার জন্য তাদের বাসনাকে তা উদ্দীপিত করে। সমাজতান্ত্রিক জীবনযাত্রা প্রণালীর প্রধান বিশিষ্ট লক্ষণগুলি — সংঘক্রিয়াবাদ, সাথিসদৃলভ সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তা — আরও বেশি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সমাজতন্ত্রে কৃত কাজ অনুযায়ী বন্টনকে সম্পূর্ণত করা হয় সামাজিক ভোগ তহবিলের মধ্য দিয়ে বন্টনের সাহায্যে। এই সামাজিক ভোগ তহবিল সমাজতান্ত্রিক সমাজের সবচেয়ে উল্লেখ্য দিকচিহ্নগুলির অন্যতম।

সামাজিক ভোগ তহবিলের উদ্দেশ্য হল অর্জিত অর্থনৈতিক বিকাশের স্তরের দ্বারা নির্ধারিত সামাজিক-ভাবে প্রয়োজনীয় স্তরে জনসমষ্টির সামাজিকভাবে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি (স্বাস্থ্য কৃত্যক, সংস্কৃতি, শিক্ষা, অক্ষমদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা, প্রভৃতির জন্য) পূরণ করা। উপরে কথিত চাহিদাগুলির বিশেষ সামাজিক-অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে, এবং কৃত কাজ অনুযায়ী অর্জিত জনগণের আয়ের বিনিময়েই সেগুলি

পূরণ করা অসম্ভব কেন, এ থেকে তার ব্যাখ্যা মেলে। তা যদি সম্ভব হত, তাহলে মজদুরি ও বেতনের বিভিন্ন আয়তনের দরদুন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক স্তর, পরিবারের বিভিন্ন আয়তন, প্রভৃতির দরদুন জনগণের ভোগের স্তরে প্রচুর প্রভেদ দেখা দিত। সমাজতন্ত্রে সমগ্র ভোগ তহবিল যদি শুদ্ধই কাজের পারিশ্রমিক হিশেবে বণ্টিত হত, তাহলে জনগণের সামর্থ্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষে যেগুণি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ নাগরিকদের এমন সমস্ত অগ্রাধিকারমূলক ব্যক্তিগত প্রয়োজন সৃষ্টির জন্য সমাজ পারিকল্পিত সংস্থান রাখতে অক্ষম হত এবং তার উপরে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করতেও অপারগ হত।

সেই জন্যই সমাজ বিশেষ সামাজিক ভোগ তহবিল তৈরি করে ভোগ তহবিলের একটা অংশের বিলিবন্দেশ করে। বিনামূল্যে অথবা রেয়াতে জনসমষ্টিতে বিভিন্ন বৈষয়িক সামগ্রী ও কৃত্যক যোগানোর জন্য এবং কাজের পারিশ্রমিক ছাড়াও অন্যান্য নগদ অর্থ-প্রদানের জন্য এই তহবিলগুণি ব্যবহৃত হয়।

এই তহবিলগুণি নিশ্চিত করে শুদ্ধ সেই সমস্ত উপকার যেগুণি ব্যবহৃত হয় নাগরিকদের নিজস্ব চাহিদা মেটানোর জন্য। প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, প্রতিরক্ষা, বিজ্ঞান ও জনসমষ্টির ভোগের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত নয় এমন অন্যান্য উদ্দেশ্যের জন্য ব্যয়িত তহবিল এগুণির অন্তর্ভুক্ত হয় না।

সামাজিক ভোগ তহবিলগুণির ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরসম্পর্কিত দুটি ক্রিয়া আছে: (ক) শ্রমের

সামাজিক সমর্থনিতা গড়ে তোলা (অর্থাৎ, সেই তহবিল ব্যবহৃত হয় অভিন্ন, সামাজিকভাবে প্রাসঙ্গিক চাহিদা মেটানোর জন্য) এবং (খ) পরিবারে সন্তানদের বা বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের বিভিন্ন সংখ্যার দরুন জনগণের জীবনমানে যে সমস্ত পার্থক্য ঘটে সেগুলি কমানো বা দূর করা। সামাজিক ভোগ তহবিলগুলি মারফৎ বন্টন সমস্ত নাগরিককে নিজেদের বৈষয়িক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ানোর সমান সুযোগ যোগায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সামাজিক ভোগ তহবিল থেকে অন্যান্য অর্থ-প্রদান ও উপকার কারখানা শ্রমিক ও অফিস কর্মীদের সামগ্রিক আয়ের একটা বড় অংশ। এর অনুপাত হল কারখানা শ্রমিক ও অফিস কর্মীদের মধ্যে নিম্ন আয় গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রায় ৪০ শতাংশ; গড়পড়তা আয়ের শ্রমিক-কর্মীদের ক্ষেত্রে ১৫ থেকে ৩০ শতাংশ এবং উচ্চ আয় গোষ্ঠীর শ্রমিক-কর্মীদের ক্ষেত্রে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ।

কেন্দ্রীকৃত সামাজিক ভোগ তহবিল (যার মালিক সমগ্র জনগণ) জনসমষ্টিতে বিনামূল্যে সেবা-কৃত্যক যোগানোর ব্যবস্থার বৈষয়িক ভিত্তি যোগায়। সামাজিক ভোগ তহবিলের এই অংশটা বায় হাসপাতাল, ক্লিনিক ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কেন্দ্র, মাধ্যমিক স্কুল, কারিগরি কলেজ, উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য স্কুল, ট্রেন্স ও কিন্ডারগার্টেন এবং বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। ১৯৮৩-১৯৮৪ শিক্ষা-বর্ষে বিশেষীকৃত মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে দিন-বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ৭৫ শতাংশ এবং উচ্চতর শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানগুলিতে দিন-বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ৭৭ শতাংশ অনুদান বা ছাত্র বৃত্তি পেয়েছিল। ক্রেস্টগুলিতে শিশুদের পরিচর্যা খরচের ৮০ শতাংশই রাষ্ট্র মেটায়। প্রত্যেক রোগীর হাসপাতালে থাকা ও চিকিৎসার ব্যয় বাবদ রাষ্ট্র দৈনিক ১০ রুবলের বেশি মেটায়।

কেন্দ্রীকৃত সামাজিক ভোগ তহবিল (যেগুলি সমগ্র জনগণের সম্পত্তি) ছাড়াও রয়েছে বিকেন্দ্রীকৃত সামাজিক ভোগ তহবিল, যেগুলির মালিক হল বিভিন্ন উদ্যোগ, যৌথখামার ও সামাজিক সংগঠন।

রাষ্ট্রায়ত্ত্ব উদ্যোগগুলির ও সংগঠনগুলির হাতের সামাজিক ভোগ তহবিলের বড় অংশটা ব্যবহৃত হয় শ্রমিকদের ছুটি ও স্যানাটোরিয়ামে থাকার ভাউচারের খরচ মেটানোর জন্য, এই সমস্ত উদ্যোগ বা সংগঠনের আবাসন, শিশু-পরিচর্যা কেন্দ্র ও পাইওনিয়র শিবিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, মজুরি তহবিল থেকে পারিশ্রমিকদানের অতিরিক্ত থোক বোনাস শ্রমিকদের দেওয়ার জন্য, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক কাজের জন্য, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা যোগানো, শারীরচর্চা ও খেলাধুলোর বিকাশসাধন, শ্রমিকদের কর্মস্থলে কাফেটেরিয়াগুলিতে হ্রাসকৃত দামে আহাৰ্য যোগানোর জন্য।

বণ্টন ও ভোগের রূপগুলিতে প্রভেদের দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক ভোগ তহবিলগুলিকে ভাগ করা যেতে পারে বিনা ব্যয়ে অথবা সহজ শর্তে বৈষয়িক সামগ্রী ও কৃত্যক যোগানোর জন্য ব্যবহৃত তহবিল ও যেখান থেকে নগদ অর্থ-প্রদান করা হয় সেই তহবিলের মধ্যে।

জনসমষ্টিতে বৈষয়িক সামগ্রী ও কৃত্যকসমূহ যোগায় সামাজিক ভোগ তহবিলের অর্থপদ্বর্ষ জনস্বাস্থ্য কৃত্যক, শিক্ষাগত, সাংস্কৃতিক, শারীরচর্চা ও ক্রীড়াকেন্দ্র ও সংগঠনগর্দলি। এই সমস্ত বৈষয়িক সামগ্রী ও সেবা দেওয়া হয় বিনামূল্যে, এবং তাই যে জন্য উদ্দিষ্ট সেটা ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে সামাজিক তহবিলগর্দলি ব্যবহার করার সম্ভাবনা থাকে না। অধিকতর গর্দরুপপূর্ণ সামাজিক প্রয়োজনগর্দলি মেটানোর সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় স্তর এইভাবে নিশ্চিত হয়।

সামাজিক ভোগ তহবিলগর্দলি থেকে জনসমষ্টিতে নগদে প্রদেয় উপকারগর্দলির মধ্যে আছে বার্থক্য ও পঙ্গুতার জন্য পেনশন, বহু সন্তানবিশিষ্ট পরিবারগর্দলিকে ও অবিবাহিতা মাতাদের প্রদেয় ভাতা, ছাত্রছাত্রীদের অনুদান, সাময়িক অক্ষমতার জন্য প্রাপ্য সর্দবিধা, প্রসর্দিতকালীন ছুটি ইত্যাদি। সামাজিক ভোগ তহবিলগর্দলি থেকে নগদ অর্থ-প্রদান সেগর্দলি যারা পায় তাদের ব্যক্তিগত আয় ও নিজস্ব সম্পত্তির অংশ। উপকার-প্রাপকরা প্রয়োজনমতো সেগর্দলির বিলিব্যবস্থা করতে পারে।

নগদ উপকারের একটা বড় অংশ জনসমষ্টির কাছে গিয়ে পৌঁছয় সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক বর্মার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। সমাজতন্ত্রে সামাজিক নিরাপত্তার নিহিতার্থ হল সমাজ কর্তৃক (অথবা সরাসরি সমাজের খরচে) সেই সমস্ত লোকের ভরণপোষণ, যারা সমাজ যাকে উপবৃত্ত কারণ বলে মনে করে এমন সব কারণে স্থায়ীভাবে অথবা সাময়িকভাবে কাজ করতে অক্ষম।

এই সমস্ত কারণের মধ্যে আছে: অসুস্থতা, পঙ্গুতা, কর্মজীবনের প্রয়োজনীয় দৈর্ঘ্য পেনশনযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্তি, শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ লাভের জন্য কাজে ছেদ, নিয়মমার্যিক ছুটিতে থাকা ইত্যাদি।

৪। সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমের সংগঠন

সমাজতন্ত্রে প্রধান উৎপাদিকা শক্তি ও সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনে অংশগ্রাহী হিশেবে মানুষের আবির্ভাবের ক্ষেত্রে শ্রমের ভূমিকা অনেকখানি নির্ভর করে সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির পরিসরে ও আলাদা এক একটি উৎপাদন-এককের পরিসরে শ্রমের সংগঠনের উপরে।

সমগ্র অর্থনীতির পরিসরে শ্রমের সংগঠনের নিহিতার্থ হল পরিকল্পিত ভিত্তিতে সকল নাগরিকের শ্রমের সহযোগিতা। সমাজতন্ত্রে শ্রমের সামাজিক সংগঠন এটাই নিশ্চিত করে যাতে জনগণ কাজ করে নিজেদের জন্য তথা সমাজের উপকারের জন্য, আর সমাজ এই কাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নেয়। সমাজ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশের পরিকল্পনা ছকে দেয়, প্রধান প্রধান বৈষয়িক সহায়-সম্পদ বণ্টন করে এবং দামের উপরে, শ্রমের পরিমাপ ও ভোগের পরিমাপের উপরে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ উৎপাদন ও কাজের সংগঠনের নতুন নতুন রূপ প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে, জনগণকে শ্রমে জড়িত করার নিজস্ব পদ্ধতি প্রয়োগ করে, নিয়মানুবর্তিতা নিশ্চিত করে এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ায়।

সমাজতন্ত্রে শ্রমের সংগঠন উৎপাদন সম্প্রসারিত করার উপায় হিশেবে তথা মানদুষের উন্নতির বনিয়াদি শর্ত হিশেবে কাজ করে। শ্রমের সংগঠনের উদ্দেশ্য হল যে কোনো একটি উৎপাদন-ক্রিয়ার সঙ্গে শ্রমিকদের আজীবন বন্ধনদশার সম্পূর্ণ অবসান ঘটানো। সমাজতান্ত্রিক কাজের সংগঠন শ্রমের ক্ষেত্রে আংশিক শ্রমিক হিশেবে নয় শ্রমিকদের ক্রিয়াগুদালিকে বিকশিত করে এবং তাদের পরিণত করে এক নতুন ধরনের শ্রমিকে — বহুবিধ দক্ষতাসম্পন্ন, উন্নততর শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং অতীতের নির্দিষ্ট কাজের শ্রমিকদের তুলনায় তাদের কাজের প্রতি সৃষ্টিশীল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে অধিকতর সক্ষম শ্রমিককে। নিজের শ্রমের দিক দিয়ে তথা সামগ্রিকভাবে সমাজের দিক দিয়েও নতুন ধরনের শ্রমিকের ক্রিয়াগুদালি ব্যাপকতর। নতুন ধরনের কাজের সংগঠনের পক্ষে অপরিহার্য প্রয়োজন হল উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় শ্রমজীবী জনগণের অংশগ্রহণ। মেহনতি মানদুষের একজন আংশিক কাজের শ্রমিক হওয়া আর উৎপাদনের উপায়ের সহ-মালিক হওয়া — এই দুইয়ের মধ্যকার দ্বন্দ্ব এটা নিরসন করে।

সমাজতন্ত্র শ্রমসংগঠনের কতকগুলি মূলগতভাবে নতুন রূপের জন্ম দেয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজে, শ্রমের সংগঠন পরিকল্পিত হয় সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির পরিসরে। পরিকল্পনায় জীবিকাজর্জনের উপায়ের উৎস হিশেবে শ্রম আর সামাজিক চাহিদা মেটানোর শ্রম হিশেবে শ্রমের সম্মিলনের সংস্থান রাখা হয়। পরিকল্পনা হল সুষম অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য

ব্যবহৃত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় যে-সমস্ত সামাজিক যোগসূত্র উদ্ভূত হয় সেগুলি আরও বেশি জটিল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, শ্রমের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ত্রিা-নিয়ামক নিয়মগুলি সম্বন্ধে পদুখানুপদুখ জ্ঞানের ভিত্তিতে। সমাজতান্ত্রিক কাজের সংগঠন কখনোই যথেষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তিতে করা উচিত নয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের স্বরণ দেখা দেওয়ার প্রেক্ষিতে ছোট কর্মিদল থেকে, বড় পরিমেল থেকে শুরুর করে এবং পরিচালনার উচ্চতম সংস্থা — সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রীপরিষদ ও তার গঠনকাঠামোগত উপসংস্থা, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটি, অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কমিটি ও মন্ত্রকগুলি পর্যন্ত সব স্তরে শ্রমসংগঠনের পরিবর্তন চালানো হচ্ছে।

শ্রমসংগঠনের পুনর্সংগঠনের উদ্দেশ্য হল অধিকার ও বাধ্যবাধকতার ঐক্য, শ্রমের ফলাফলের জন্য দায়িত্ব বাড়ানো, উৎপাদনের উপায়ের উপর সমাজতান্ত্রিক মালিকানার প্রতি সযত্ন ব্যবহার উন্নত করা। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজের গণতন্ত্রীকরণের, উন্নয়নের ব্যাপক নিয়মিত প্রক্রিয়া চলছে। জাতীয় অর্থনীতি পরিচালনার অর্থনৈতিক পদ্ধতি কর্তৃত্বমূলক, আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিগুলিকে স্থানচ্যুত করে।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যাপক গণতন্ত্র সম্প্রসারিত হচ্ছে, কর্ম-সংঘগুলিতে স্বশাসন প্রবর্তিত হচ্ছে। ১৯৮৭

সালে গৃহীত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ (পরিমেল) সম্বন্ধে আইনের ভিত্তিতে কোনো একটি উদ্যোগের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণ করার কাজে তার কর্ম-সংঘের, প্রত্যেক শ্রমিকের বাস্তব অংশগ্রহণ বাড়াচ্ছে, এবং তার ভিত্তিতে নিহিত কর্ম-সংঘে সমস্ত ব্যাপারের জন্য প্রত্যেকের উচ্চ দায়দায়িত্ব।

অনেক কলকারখানা, এমন কি সারা শিল্পশাখা লাভ-লোকসানের সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক হিসাব, আর্থিক স্বনির্ভরতা, সমস্ত অর্থব্যয়ের স্বয়ংভরতার ভিত্তিতে কাজ করতে শুরু করেছে। এমন ধরনের কলকারখানায় কর্ম-সংঘের সদস্যদের সমস্ত আয় ও প্রণোদনার রূপগড়ালি এবং তাদের সামাজিক চাহিদা মেটানো কাজের চূড়ান্ত ফলের উপর, উৎপাদিত উৎপাদ ও সেবা-কৃত্যকের পরিমাণ ও গুণের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে।

কী ধরনের পরিচালক (কর্মদক্ষ, প্রতিভাশালী কিংবা অপদার্থ, পরিচয় পত্রের মাধ্যমেই পদে বসানো, পদলোলুপ ইত্যাদি) তাদের দল, বিভাগ, কারখানার পরিচালনা করে সে ব্যাপারে লাভ-লোকসানের সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক হিসাবের পরিস্থিতিতে শ্রমিকরা নিরপেক্ষ নয়। এখন পরিচালকের উপর, তার নিপুণতার উপর তাদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ফলাফল, সুতরাং তাদের আসল আয় ও স্বাচ্ছন্দ্যও যথেষ্ট নির্ভর করে। অর্থনৈতিক হিসাবের পরিবেশ কলকারখানার, কর্ম-সংঘের অধিকার বাড়ানো ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকতা বৃদ্ধির দাবি করে এবং গৃহীত আইন

অনুযায়ী নির্বাচনের ভিত্তিতে কলকারখানার পরিচালকবৃন্দকে পদে নিযুক্ত করার প্রক্রিয়ার গণতান্ত্রিকীকরণ প্রবর্তন করা হয়। অনেক উদ্যোগে শ্রমিকরা প্রকাশ্য বা গোপন ভোটে তাদের পরিচালকদের নির্বাচন করে। এর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সারমর্ম প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ শ্রমের মানুষের ক্ষমতা, সামাজিক মালিকানার অধীনস্থ উৎপাদনের উপায়ের সহ-মালিক হিশেবে তার অবস্থা বাস্তবায়নের রূপ, ক্রিয়াকলাপের সব ক্ষেত্রে তার স্বার্থ ও বাস্তব অংশগ্রহণের রূপ প্রকাশিত হয়। শ্রমের সংগঠন নির্ভর করে, এক দিকে, শ্রমিকের শ্রমমূলক ক্রিয়াগুলির বৈষয়িক ভিত্তিতে পরিবর্তন, তার কাজের অবস্থা, তার কর্ম-কেন্দ্রের বিন্যাস ইত্যাদির উপরে, এবং অন্য দিকে, কর্ম-সংঘগুলির সদস্যদের মধ্যে সংঘাতবাদের, সাধিসমূলভ সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তা বিকাশের পক্ষে অত্যাৱশ্যক অবস্থা সৃষ্টির উপরে। সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিত্বের সুসমঞ্জস বিকাশের অবস্থা সামাজিক শ্রমের সংগঠনের উপরে অনেকখানি নির্ভর করে। শ্রমের সংগঠন সংক্রান্ত বিষয়গুলি শুধু সমগ্র জাতীয় অর্থনীতির স্তরেই নয়, বরং আলাদা এক একটি শিল্প, উদ্যোগ, বিভাগ ও কর্ম-কেন্দ্রের স্তরেও বিবেচনা করা উচিত।

শ্রমসংগঠন অনুযায়ী সারা জাতীয় অর্থনীতির পরিসরে, আলাদা আলাদা শিল্পশাখা ও অঞ্চলের পরিসরে কর্মস্থানগুলি পরিকল্পিত হয়। বর্তমান কর্মস্থান ও নতুন কর্মস্থানের সংখ্যা উপযুক্ত কর্মীদের

নিযুক্ত করার সম্ভাবনার সঙ্গে সঠিকভাবে খাপ খাওয়ানো দরকার। অতিরিক্ত কর্মস্থানের উপস্থিতিতে উৎপাদনের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রত্যহ ধাতু কাটার লেদযন্ত্র, ইস্পাত পেটাই ও প্রেসযন্ত্রের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অচল হয়ে থাকে, প্রধানত সেবা কর্মীদের অভাবে প্রায় ৩০ শতাংশ রোবট বসানো হয় না।

সোভিয়েত ইউনিয়নে, আলাদা এক একটি উদ্যোগে শ্রমের সংগঠন ব্যয়-হিসাবরক্ষণের নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। শেষোক্ত নীতিটি পরিকল্পিত ভিত্তিতে একটি উদ্যোগে শ্রমের সংগঠনের প্রেক্ষাপট তৈরি করে। উদ্যোগটির পরিকল্পনা পূরণে বৈষয়িক প্রণোদনার উপরে নির্ভরতা তাতে পূর্বানুদিত। একটি ব্যয়-হিসাবরক্ষণমূলক উদ্যোগের সমগ্র কর্ম-সংঘ তাই ব্যয়িত প্রতিটি রুবলের জন্য উৎপাদ বাড়ানোর সর্বপ্রকার চেষ্টা করে। ব্যয়-হিসাবরক্ষণ ব্যবস্থায় নিজের জন্য করা কাজ আর সমাজের উপকারের জন্য করা কাজের মধ্যকার সংযোগ প্রতিফলিত হয়। কাজের পারিশ্রমিকের আয়তনকে তা যুক্ত করে শ্রমিকের শ্রম নিয়োগের সঙ্গে ও সমাজের ব্যবহারের জন্য উৎপন্ন সামগ্রীর পরিমাণের সঙ্গে।

লাভ-লোকসানের অর্থনৈতিক হিসাব, আর্থিক স্বাবলম্বন ও অর্থব্যয়ের স্বয়ংভরতার পরিস্থিতিতে শ্রমের পারিশ্রমিক ও বৈষয়িক প্রণোদনার উৎসগুণি উদ্যোগের মূনাফার, বিক্রীত উৎপাদের জন্য প্রাপ্ত অর্থের উপর নির্ভর করে, এবং সেই অর্থ বণ্টন বৃহৎ পরিমাণে

কর্ম-সংঘের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ১৯৮৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে গৃহীত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ (পরিমেল) সম্বন্ধে আইন অনুযায়ী কলকারখানার অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের শর্ত ও পদ্ধতি আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, তাদের কাজে পরিকল্পনা-ভিত্তি ও সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক হিসাব, স্বতন্ত্রতা ও দায়িত্বের সম্মিলন হয়েছে, নিজের কর্ম-কেন্দ্রে এবং তার কর্ম-সংঘে আসল মালিক হিসেবে শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও বাধ্যবাধকতা বিস্তারিত হয়েছে।

ব্যয়-হিসাবরক্ষণের ভিত্তিতে কাজ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কাজ থেকে পৃথক। প্রথমোক্তটির সারমর্ম হল সাধিসদৃশ সহযোগিতা ও সৌভাগ্যপূর্ণ পারস্পরিক সহায়তা, আর শেষোক্তটির ভিত্তি হল উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং তা প্রতিযোগিতায় একটা অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আলাদা এক একটি উদ্যোগে শ্রমের সংগঠনের নিহিতার্থ হল উৎপাদনের উপায়ের সর্বাধিক কার্যকর ব্যবহারের উদ্দেশ্য নিয়ে যুক্তিসহভাবে শ্রমিকদের কাজের স্থান-নির্ণয় করা। তা সংস্থান করে এই বিষয়গুলির: উৎপাদনের সুনির্দিষ্ট চরিত্র ও কৃৎকৌশলগত স্তর, এবং জড়িত শ্রমিকদের দক্ষতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট উদ্যোগটির অভ্যন্তরে শ্রম-বিভাজন; কর্ম-কেন্দ্রগুলির যুক্তিসহ বিন্যাস ও সার্ভিসিং; যুক্তিসহ কর্মপদ্ধতি নির্ণয় ও সেগুলি প্রয়োগের অবস্থা সৃষ্টি; কাজের অবস্থা উন্নত করা এবং শ্রম সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা; শ্রম নিয়মানুবর্তিতা

বাড়ানোর ব্যবস্থা; শ্রমিকদের দক্ষতা সংগঠিতভাবে বাড়ানো, ও তাদের সাংস্কৃতিক মানোন্নয়ন; কাজ ও বিশ্রামের সময় ও কাজের নিষ্পত্তি নিয়মন; একক ও যৌথ শ্রম উভয়েরই জন্য বর্ধিত বৈষয়িক ও নৈতিক প্রণোদনা যোগানো; সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা সংগঠিত করা এবং প্রাণসর উৎপাদনী অভিজ্ঞতা প্রচার করা ইত্যাদি।

শ্রমের সংগঠন উদ্যোগগুলিতে গৃহীত ও রূপায়িত সামাজিক বিকাশ পরিকল্পনাগুলির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সহায়ক হয়।

কর্ম-সংঘ উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপে শুদ্ধ একটা নির্ধারক উপাদানই নয়; তা সামাজিক মূল্য ও রীতিরও প্রবক্তা। মানুষের মৌল ক্রিয়াকলাপের সামাজিক-রাজনৈতিক, ভাবাদর্শগত, অবসরবিনোদন সংক্রান্ত, সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক ও যোগাযোগমূলক দিকগুলিকে প্রভাবিত করে, জনগণের জীবনযাপন প্রণালী, তাদের মানসিকতা, বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের উপরে প্রভাব বিস্তার করে। কর্ম-সংঘের অভ্যন্তরেই জনগণের সামাজিক আচরণের মূল ধরনধারণ ও রীতি গড়ে ওঠে ও দৃঢ়মূল হয়, এইখানেই মানুষেরা সামাজিক সম্পর্ক ব্যবস্থায় সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়। উৎপাদনে তার অর্থনৈতিক ক্রিয়াগুলির ভিত্তিতে ও তার সঙ্গে সম্পর্কিতরূপেই কর্ম-সংঘ রূপ পরিগ্রহ করে একটি সামাজিক একক হিসেবে, যা নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে শ্রমের চরিত্র, অন্তর্বস্তু, অবস্থা ও সুরক্ষার ব্যাপারে; উৎপাদনের মান উন্নত করা; কৃত কাজের জন্য

পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা ও সংগঠন উন্নত করা; কর্ম-সংঘের অভ্যন্তরে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক আবহাওয়া ও সম্পর্ক ক্রমাগত উন্নত করা; কর্ম-সংঘের সামাজিক-দক্ষতামূলক কাঠামো উন্নত করা, প্রভৃতির ব্যাপারে।

একটি শিল্পোদ্যোগে সামাজিক অবকাঠামো দেখা দেয় বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্ম-সংঘটির নির্দিষ্ট এক প্রস্তুত চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয়তায় সাড়া দিয়ে। এই চাহিদাগুলির অন্তর্ভুক্ত হল: শ্রমের ক্ষেত্রে — অর্থপূর্ণ, সৃষ্টিশীল কাজের প্রয়োজন, উপযুক্ত কাজের অবস্থা এবং উৎপাদন ও বিশ্রাম-অবসরবিনোদনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন; সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে — জীবনের প্রতি বলিষ্ঠ মনোভাব অনুযায়ী কাজ করার জন্য শ্রমিকদের প্রয়োজন, যা গড়ে ওঠে সামাজিক সম্পর্ক ব্যবস্থার দরুন; বুদ্ধিবৃত্তিগত ক্ষেত্রে — সাধারণ শিক্ষা আর বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ পাওয়া ও উন্নত করার জন্য, নিজেদের সৃষ্টিশীল সামর্থ্যগুলি বিকশিত ও প্রয়োগ করা এবং তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য চাহিদা পূরণ করার জন্য জনগণের প্রয়োজন; দৈনন্দিন জীবনের ক্ষেত্রে — জনগণের বহুবিধ ধরনের চাহিদা ও প্রয়োজন, যেগুলি নির্ধারিত হয় জীবনের গুণগত মান দিয়ে (আবাসন ও তার গুণ, উপযোগমূলক ব্যবস্থা, ভোক্তা কৃত্যক, খুচরো বাণিজ্যের বিপণি ও সার্বজনিক পরিবহণ), কৃত্যকসমূহের গুণগত মান ও বৈচিত্র্য দিয়ে; বিশ্রাম ও অবসরবিনোদনের ক্ষেত্রে — লোকে একক বা যৌথভাবে বিশ্রাম ও অবসরবিনোদনের প্রয়োজন বোধ

করতে পারে, শারীরচর্চা ও খেলাধুলায় লিপ্ত হওয়া, ছুটিতে থাকাকালীন নিজেদের স্বাস্থ্য উন্নত করা, প্রভৃতির প্রয়োজন বোধ করতে পারে।

সমাজতন্ত্রে, সংঘক্রিয়াবাদী সম্পর্ক একটা বড় ভূমিকা পালন করে। সংঘক্রিয়াবাদী সম্পর্ক, অর্থাৎ সাথিসদুলভ পারস্পরিক সহায়তা ও সহযোগিতা-ভিত্তিক সম্পর্ক, কাজের সংগঠনের সব কটি রূপের বৈশিষ্ট্যসূচক। কাজের সংগঠনের রূপগুলির সোপানবৎ বিন্যাসের প্রাথমিক একক হল কর্ম-দল। কর্ম-দল কাজ করে ব্যয়-হিসাবরক্ষণ নীতির ভিত্তিতে; একটিমাত্র কাজের অর্ডারের ভিত্তিতে তা কাজ করে এবং সেই দলের সকল সদস্যের করা কাজের ফল অনুযায়ী পারিশ্রমিক পায়। একটি দলগত চুক্তি বা ঠিকা হল একটি কর্ম-সংঘ ও ব্যবস্থাপক কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি। এই চুক্তি অনুযায়ী, দলটি একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব নেয়, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ পুরো-ঠেঁরি উৎপাদ, প্রযুক্তিগত ইউনিট বা সম্পূর্ণ এক-এক প্রস্তুত সরঞ্জাম উৎপন্ন করে, অথবা একটি কারখানা-বাড়ি বা ইमारত জাতীয় কোনো ব্যবস্থা বা তার একটি অংশ নির্মাণ করে। প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, সাধন, কাঁচামাল ও অন্যান্য জিনিস দলটিকে যোগানো হয়। তার পারিশ্রমিকের হার ও বস্তু-উপকরণ ব্যবহার সাধারণত এক দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে পরিকল্পিত হয়।

দলগত চুক্তির ভিত্তিতে যে-সমস্ত কর্ম-সংঘ কাজ করে, শ্রম ও উৎপাদন সংগঠিত করার কাজে, নিজেদের

পেশাগত গঠনবিন্যাস ও আয়তন স্থির করার ব্যাপারে এবং তাদের সামগ্রিক উপার্জন একক সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করার ব্যাপারে প্রচুর অধিকার দেওয়া হয়। দলটি একটি উৎপাদন কাজের দায়িত্ব পালন করার এবং তার প্রতি ন্যস্ত সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি যুক্তিসহভাবে ব্যবহার করার ভার নেয়। শ্রমসংগঠনের দলগত পদ্ধতি উৎপাদের গুণগত মানের দিক দিয়ে নিজস্ব ও যৌথ স্বার্থের এক সুসমঞ্জস মিলনের উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টি করে এবং শ্রম নিয়মানুবর্তিতা বাড়ায়। শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদের গুণগত মানকে তা উন্নত করে।

শ্রমসংগঠনের দলগত পদ্ধতি, তথা তাতে সহজাত সংঘাতবাদের নীতিগুলি, শহর ও গ্রামাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই বিকশিত করা হয়েছে।

শ্রমসংগঠনের দলগত পদ্ধতি উৎপাদনের ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে শ্রমজীবী জনগণের অধিকারকে বিস্তৃত করে। দলটির অধিকতর স্বাধীনতা ও অধিকতর দায়িত্ব তাতে পূর্বানুমিত। তা পারস্পরিক সাহায্য ও পারস্পরিক সম্বন্ধও গড়ে তোলে, যৌথ কাজের ফলাফলের জন্য প্রত্যেকটি সদস্যের দায়িত্ব বাড়ায়, নিজের করা কাজ আর তার সহকর্মীদের করা কাজের সামনাসামনি প্রত্যেক সদস্যকে আরও বেশি জরুরি মনোভাবাপন্ন করে তোলে, অমনোযোগিতা, উদাসীনতা বা প্রযুক্তিগত ও কাজের শৃঙ্খলাভঙ্গ বরদাস্ত না করার মনোভাব গড়ে তোলে। এ সবই দলটির ভালো ফল নিশ্চিত করতে সাহায্য করে এবং দলের সদস্যদের উপার্জন বাড়ায়।

শ্রমের সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের সুফলগুলি চূড়ান্ত

বিশ্লেষণে প্রকাশ পায় প্রতিটি কর্ম-কেন্দ্র। শ্রমের সংগঠনে কর্ম-কেন্দ্র একটি বিশেষ স্থানের অধিকারী। কর্ম-কেন্দ্র এমন একটি স্থান, যেখানে যন্ত্রপাতি আর শ্রম, প্রযুক্তিবিদ্যা আর মানবিক দক্ষতা প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। একটি কর্ম-কেন্দ্র স্থাপন করার ব্যয় এবং প্রত্যেক শিল্পে ও অঞ্চলে কটি নতুন কর্ম-কেন্দ্র সৃষ্টি করা হবে তার সংখ্যা নির্ধারণ করে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ। জনশক্তির লভ্যতা, আবাসন, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থাদি ও উপযোগমূলক ব্যবস্থাদির বিষয়গুলি পরিকল্পনায় গণ্য করা হয়। নতুন কর্ম-কেন্দ্রগুলি চালু করার আগে তার সঙ্গে জড়িত সামাজিক ব্যয় পরিকল্পনা করা হয়। কর্ম-কেন্দ্র উৎপাদনের মানের পরিচয়বাহী; তার অবস্থা শ্রমের প্রতি শ্রমিকদের মনোভাবকে এবং তাদের কাজের মানকে প্রতিফলিত করে।

সমাজতন্ত্রে, কর্ম-কেন্দ্রগুলি প্রয়োজনমতো পুনর্বিবেচিত, শংসাপত্র-প্রদত্ত ও পুনর্বিন্যস্ত হয়। কাজের অবস্থা উন্নত করতে ও শ্রম সম্পদগুলি আরও ভালোভাবে ব্যবহার করতে তা সাহায্য করে। যে-সমস্ত কর্ম-কেন্দ্র চলতি প্রযুক্তিগত ও সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে পারে না, প্রণালীবদ্ধ পর্যালোচনা সেগুলিকে সনাক্ত করতে সাহায্য করে।

কাজের সংগঠন ও কর্মদক্ষতা উন্নত করার জন্য উদ্দিষ্ট ব্যবস্থাগুলির মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা বা উচ্চদক্ষতা-অর্জনের অভিযান।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা হল একক

উদ্যোগগুলির স্তরে উৎপাদনের ব্যবস্থাপনায় শ্রমজীবী জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের একটি রূপ। এই রূপটি উৎপাদনের ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের সক্রিয়তম অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করে এবং নিজেদের কাজের মধ্য দিয়ে, নিজেদেরই দ্বারা নির্দিষ্ট কতকগুলি উৎপাদনী কৰ্তব্যকৰ্ম — সাধারণত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৰ্তব্যকৰ্মগুলি — সম্পন্ন করার সুযোগ দেয় তাদের। সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা হল জনসাধারণের ব্যবস্থাপনার শিক্ষায়তন, এক নতুন ধরনের শ্রমিককে শিক্ষিত করার এবং তার মধ্যে উৎপাদনের উপায়ের একজন সহ-মালিকের গুণাবলী সঞ্চারিত করার কার্যকর উপায়।

মানুষের কাজ করার সামর্থ্যের এক সুনির্দিষ্ট বহিঃপ্রকাশ হিশেবে প্রতিযোগিতার বিষয়টি, লোকে যখন যৌথভাবে কাজ করতে শুরু করেছিল সেই সময় থেকেই পরিজ্ঞাত। প্রতিযোগিতার অবলম্বন হল শ্রমের সহযোগিতা, যা জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে সংঘাতশ্রাবাদ, প্রতিযোগিতা ও নিজের কর্মশক্তির সামর্থ্য ও দক্ষতা দেখাবার প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে যায়; তথা উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় অন্যান্য অংশগ্রাহীর কৃতিত্বের সঙ্গে নিজের কৃতিত্বগুলিকে পরস্পরসম্পর্কিত করার প্রয়াসে সহায়ক হয়। সামাজিক সংযোগ প্রতিযোগিতাকে উদ্দীপিত করে, মৌল প্রাণশক্তিকে জাগিয়ে তোলে এবং ব্যক্তিগত উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। যে কোনো ধরনের উৎপাদনেই যৌথ শ্রমের এটা বৈশিষ্ট্যসূচক।

সামাজিক শ্রমের একটি রূপ হিশেবে, প্রতিযোগিতার

সারমর্মের কথা বলতে গেলে, তা নির্ভর করে উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানার রূপের উপরে। উৎপাদনের উপায়ের উপরে পুঁজিবাদী মালিকানার ক্ষেত্রে, জনগণের মধ্যে সম্পর্কটা হল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্ক। শ্রমিকরা তাদের শ্রমশক্তি বিক্রয়ের ভালো শর্তের জন্য এবং নিজের চাকরির জন্য প্রতিযোগিতা করতে বাধ্য হয়, আর পুঁজিপতিরা প্রতিযোগিতা করে বাজার ও সর্বাধিক মুনাফার জন্য। প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে পাচ্ছে পরাস্ত হয়, এই আশঙ্কায় পুঁজিপতিরা একে অপরের বিরুদ্ধে তিক্ত সংগ্রাম চালায়। উৎপাদনে, লোককে তা পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে, গঠনমূলক সহযোগিতা ও সুস্থ প্রতিযোগিতার সম্ভাবনা লোপ পায়। পুঁজিবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উন্মীলিত হয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সহজাত মানবিকবাদের অভাব।

উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা জনগণের মধ্যে এই ধরনের বিরোধ এবং প্রবল কতৃক দুর্বলকে চূর্ণ করার সম্ভাবনা নাকচ করে। মানুষের উপরে মানুষের শোষণকে তা দূর করে এবং প্রতিযোগিতায় জড়িত শ্রমিকদের মধ্যে সাথিসম্মিলিত সহযোগিতা গড়ে তোলে। সমাজতন্ত্রে, শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থটা শুদ্ধ তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত সাফল্যের মধ্যেই থাকে না, থাকে সমাজের সাফল্যের মধ্যেও, কারণ সার্বজনিক সম্পদবৃদ্ধি সবাইকেই উপকৃত করে।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের অস্তিত্বের একেবারে গোড়ার দিনগুঁলি থেকেই, বুল্গেরিয়া পণ্ডিতরা সমাজতন্ত্রের

বন্ধাবস্থা ও পতনের পূর্বাভাস করেছেন বারংবার। তাঁরা দাবি করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক সমাজে অভাব রয়েছে সেই চালিকা শক্তিটির, যা উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তা করে, অর্থাৎ পুঁজিবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার। সমাজতন্ত্রকে তাঁরা উপস্থিত করেছিলেন মামুলি মাঝারিপন্যা আর সমরুপতার এক জগৎ হিশেবে, এমন একটা ব্যবস্থা হিশেবে যা জনগণকে সর্বজনীন নিয়মানুবর্তিতার অধীনে এনে ব্যক্তিগত প্রতিভাকে খর্বিত করে, প্রতিযোগিতাকে রোধ করে এবং উদ্যোগকে পিষে মারে। এই অভিযোগগুলি অপ্রমাণিত করেছিলেন লেনিন: 'প্রতিযোগিতাকে নির্বাপিত করা দূরের কথা, সমাজতন্ত্র বরং তার বিপরীতে, এক প্রকৃতই বিস্তৃত ও প্রকৃতই ব্যাপক পরিসরে তাকে প্রয়োগ করার, শ্রমের এমন এক ক্ষেত্রের মধ্যে শ্রমজীবী জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে বাস্তবিকই টেনে আনার সুযোগ এই প্রথম সৃষ্টি করে, যেখানে তারা তাদের সামর্থ্য প্রদর্শন করতে পারে, ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে পারে এবং এই প্রতিভাগুলি উন্মোচিত করতে পারে, যেগুলি এত প্রচুর পরিমাণে রয়েছে সেই জনগণের মধ্যে, যে কোটি কোটি জনগণকে পুঁজিবাদ চূর্ণ, নিপীড়িত ও শ্বাসরুদ্ধ করেছিল।'*

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা হল সংঘর্ষাবাদ, সার্থিসূলভ প্রতিযোগিতা, সহযোগিতা ও পারস্পরিক

* V. I. Lenin. 'How to Organise Competition?', *Collected Works*, Vol. 26, Progress Publishers, Moscow, 1972, p. 404.

সহায়তার ভিত্তিতে শ্রমের সামাজিক সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কাজের সামগ্রিক ফলাফল উন্নত করতে তা সাহায্য করে। সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জিত হয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত ও ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে নয়, বরং এক অভিন্ন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা সমাহত করার মধ্য দিয়ে। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে কাজ করা ও শ্রম এবং উৎপাদন সংগঠিত করার প্রাণসর পদ্ধতিগুলি গোপন করে রাখার প্রবণতার অবসান ঘটিয়েছে সমাজতন্ত্র। শুধু সমাজতন্ত্রেই উচ্চমানের কাজ সর্বজনীন স্বীকৃতি লাভ করে এবং হাজার হাজার লোক তা অনুসরণ করে। প্রচারের মধ্য দিয়ে ও প্রতিযোগিতার ফলাফল তুলনা করার মধ্য দিয়ে তা অর্জিত হয়। সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্জিত প্রাণসর অভিজ্ঞতা প্রচারের বহুবিধ রূপ সৃষ্টি করেছে।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার অর্থনৈতিক, সামাজিক-রাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক ক্রিয়া আছে।

তার অর্থনৈতিক ক্রিয়াটি হল শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো ও উৎপাদনের কার্যকরতা বাড়ানো। এই ক্রিয়াটি প্রধান ও নির্ধারক। সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিকাশের সকল পর্যায়ে, সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা বৈষয়িক উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে। সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের স্বরণের পরিস্থিতিতে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার প্রধান সূচক হল গুণ, সম্পদ-মিতব্যয় এবং সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ঠিক সময়ে শরিকদের কাছে উৎপাদ পাঠানো।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার সামাজিক-রাজনৈতিক ক্রিয়া হল সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে সংহত করা, সমাজতান্ত্রিক সমাজের গোটা রাজনৈতিক ব্যবস্থার আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। উৎপাদনের ব্যবস্থাপনায় ও কর্মদক্ষতা উন্নত করার প্রচেষ্টায় ব্যাপক শ্রমজীবী জনসাধারণকে জড়িত করে তা শ্রমসংগঠন উন্নত করতে ও হুঁটিবিচ্যুতিগুলি দূর করতে সাহায্য করে।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষামূলক বিষয়ও বটে। শ্রমিকরা নিজেদের জন্য তথা সমাজের উপকারের জন্য কাজ করে বলে, শ্রমিকদের সৃষ্টিশীল ক্ষমতাকে তা সামনে নিয়ে আসে।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার ক্রিয়াগুলি একটি অপরিটিকে সম্পূরিত ও বর্ধিত করে।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার লক্ষ্যগুলি মূর্ত-নির্দিষ্ট, প্রাসঙ্গিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তব্যকর্ম দিয়ে নির্ধারিত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা তিনটি প্রধান লক্ষ্য অনুসরণ করে: জনগণের কাজের গুণ উন্নত করা; বাঞ্চিত অর্থনৈতিক ফল অর্জনের দিকে তাদের প্রচেষ্টা চালিত করা; সামাজিক উৎপাদনে সকল অংশগ্রাহীকে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লবে জড়িত করা।

আজ, সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার প্রধান লক্ষ্য হল শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির হারকে ত্বরিত করা। শ্রমের উৎপাদনশীলতা যত বেশি হবে, সময়ের একক পিছু প্রত্যেক শ্রমিকের উৎপন্ন উৎপাদ তত বেশি হবে;

উৎপাদের একক পিছন যত কম জীবন্ত শ্রম, জ্বালানি, কাঁচামাল ও অন্যান্য সম্পদ ব্যবহৃত হবে, উৎপাদ তত বেশি হবে এবং সমাজের চাহিদা পূরণের সম্ভাবনা তত বেশি বাড়বে।

কাজের প্রতি কমিউনিস্টসুলভ মনোভাব গড়ে তোলার অভিযান সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ। সংঘর্ষাবাদী সম্পর্কের, অর্থাৎ সাধিসুলভ সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তাভিত্তিক সম্পর্কের বিকাশ সংক্রান্ত নানাবিধ প্রশ্নের সঙ্গে এই রূপটি যুক্ত।

সমাজতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক কর্মরত হল মানুষের মুখ্য, মৌল চাহিদা হিশেবে শ্রমের প্রতি এক নতুন মনোভাব জাগিয়ে তোলা। নিজের কাজের প্রতি এই ধরনের মনোভাব প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল গোড়ার দিকের কমিউনিস্ট স্বেচ্ছাতনিকগদালিতেই (যৌথভাবে করা ঐচ্ছিক, পারিশ্রমিকবিহীন কাজের দিনগদালি — সম্পাঃ)। বৈশিষ্ট্যের বিষয় স্বেচ্ছাতনিকগদালির জন্ম হয়েছিল জনসাধারণের বৈপ্লবিক শ্রমোৎসাহ থেকে এবং প্রাগসর শ্রমিকদের সুমহান রাজনৈতিক ও নৈতিক প্রত্যয় থেকে। প্রথম স্বেচ্ছাতনিকগদালি — কাজের প্রতি এক নতুন, কমিউনিস্টসুলভ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ — সাধারণত সংগঠিত হয়েছিল রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে সচেতন শ্রমিকদের দ্বারা, পরবর্তীকালে সেগদালি যে ব্যাপক পরিসর ও প্রণালীবদ্ধ চরিত্র লাভ করেছিল, গোড়ার দিকে তা ছিল না। তবুও, লেনিন সেগদালির মূল্যায়ন

করেছিলেন বিশ্বব্যাপী ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন এক ব্যাপার, ‘কমিউনিজমের প্রকৃত সূচনা’,* এক নতুন, অধিকতর বিকশিত শ্রমের সংগঠনের ধরনের উৎস হিশেবে।

আজ, স্বেচ্ছাতনিকগদূলি এক জীবন্ত ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহ্য। স্বেচ্ছাতনিকগদূলিতে করা কাজ থেকে যে অর্থ অর্জিত হয়, তা ব্যয় করা হয় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারমূলক সামাজিক এলাকাগদূলির খাতে, যেমন — ক্যানসার রোগ সম্পর্কে গবেষণা ও হৃদরোগের জন্য হাসপাতাল নির্মাণ করা, শ্রম ও যুদ্ধ পঙ্কদেবর জন্য ভবন, যুবসমাজের জন্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, প্রভৃতি নির্মাণ করা।

শ্রমের প্রতি কমিউনিস্টসদূলভ মনোভাব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রাহীরা নিয়মিত ও প্রণালীবদ্ধভাবে উৎপাদনের কোটা অতিপূরণ করে উৎপাদনী নবোদ্ভাবনা ও উদ্ভাবনা প্রবর্তন করে এবং জ্বালানি, কাঁচামাল ও অন্যান্য সম্পদের মিতব্যয়ী ব্যবহারের জন্য অভিযানে নেতৃত্ব দেয়।

শ্রমের প্রতি কমিউনিস্টসদূলভ মনোভাব গড়ে তোলার অভিযান শ্রম সম্পর্কে এক সৃষ্টিশীল দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত করে, উন্নততর কাজ করার উদ্দীপনা

V. I. Lenin. ‘A Great Beginning’, *Collected Works*, Vol. 29, 1977, p. 427.

যোগায় এবং সমাজের পক্ষে তাদের কাজের গুরুত্ব সম্বন্ধে জনগণের সচেতনতা বাড়িয়ে তোলে।

সাংগঠনিকভাবে, সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার যে রূপগুলি আজকাল প্রযুক্ত হয়, সেগুলিকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যায়: একটি উদ্যোগের অভ্যন্তরে একক শ্রমিকদের বা দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা; একটি শিল্পের অভ্যন্তরে সংশ্লিষ্ট উদ্যোগগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা; বিভিন্ন শিল্পের সংশ্লিষ্ট উদ্যোগগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা।

একটি কারখানার অভ্যন্তরে প্রতিযোগিতায় জড়িত থাকে শ্রমিকদের সমাজতান্ত্রিক অঙ্গীকার, পাল্টা-পরিকল্পনা (লক্ষ্যমাত্রা উপরের দিকে নির্ধারিত করে পরিকল্পনা) ও আন্তঃদলগত চুক্তি। একক শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার ফলগুলির মূল্যায়ন করা হয় এই ধরনের সূচকের ভিত্তিতে, যেমন — উৎপাদের পরিমাণ ও গুণগত উৎকর্ষ, কাঁচামাল ও অন্যান্য সম্পদের মিতব্যয়িতা, সরঞ্জাম ও সাধনের যুক্তিসহ ব্যবহার, শ্রমিকদের দক্ষতা ও শিক্ষার উন্নতি, সংশ্লিষ্ট কাজগুলি আয়ত্ত্ব করার ক্ষেত্রে কৃতিত্ব এবং একটি শিফটের অভ্যন্তরে একেজো সময় হ্রাস।

কর্ম-সংঘগুলির স্তরে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার ফলাফল মূল্যায়নে প্রধান প্রধান যে সব বিষয়কে গণ্য করা হয়, সেগুলির মধ্যে আছে উৎপাদের পরিমাণ, পরিধি ও গুণগত উৎকর্ষ, শ্রমের উৎপাদনশীলতা, মজুরি তহবিলে এবং কাঁচামাল ও অন্যান্য সম্পদের মিতব্যয়িতা, কাজের নিয়মিত ছন্দ, উৎপাদ-পুঞ্জ

অনুপাতে উন্নতি, শিফ্ট প্রতি যন্ত্রের কাজের সময়ে সাশ্রয়, শ্রম নিয়মানুবর্তিতা, উৎপাদের একক ব্যয়, শ্রম নিরাপত্তা, উৎপাদনের মান এবং যারা ব্যক্তিগত উৎপাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে অথবা সামনের সারির শ্রমিকদের প্রাপ্তসর পদ্ধতি ও কর্মপ্রয়োগ গ্রহণ করেছে সেই শ্রমিকদের সংখ্যা।

একটি উদ্যোগের বেছে নেওয়া প্রতিযোগিতার সূচকগুলিতে প্রতিফলিত হয় তার করণীয় কাজগুলি।

কারখানা-অভ্যন্তরস্থ সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার জন্য বৈষয়িক ও নৈতিক প্রণোদনা ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে পারে নগদ বোনাস, বিনা ব্যয়ে বিশ্রাম ভবন বা স্যানাটোরিয়মে থাকার ভাউচার, পালাবাহিত্ব ছুটি, দামী উপহার, ব্যাজ, সাম্মানিক ডিপ্লোমা, সরকারি প্রতিবেদনাদিতে প্রশংসাসূচক উল্লেখ, সম্মান-গ্রন্থে বা সম্মান তালিকায় সামনের সারির শ্রমিকদের নাম নথিভুক্তকরণ, তাদের 'শ্রেষ্ঠ শ্রমিক,' 'আদর্শস্থানীয় কর্ম-দল', প্রভৃতি খেতাব দেওয়া।

কারখানা-অভ্যন্তরস্থ সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার সবচেয়ে বহুলপ্রচলিত ধরন হল সংশ্লিষ্ট বৃত্তিগুলিতে একক শ্রমিকদের মধ্যে অথবা শ্রমিকদের দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা। একক শ্রমিকরা ও দলগুলি 'কমিউনিস্ট কর্ম-দল', 'আদর্শস্থানীয় শ্রমিক', প্রভৃতির মতো সাম্মানিক খেতাবগুলির জন্য প্রতিযোগিতা করতে পারে।

আজ, ক্রমেই অধিকতর সংখ্যায় দলগুলি একটা দলগত চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করার পদ্ধতি গ্রহণ

করায়, সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা আন্দোলন এক নতুন মাত্রা অর্জন করেছে। এই পদ্ধতি দলের সমগ্র প্রচেষ্টাকে তার কাজের ফলের উপরে নির্ভরশীল করে ও তার দ্বারা দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার সংগঠনকে সরল করে, প্রতিযোগিতাকে আরও কার্যকর করে এবং তার শিক্ষামূলক ভূমিকা বাড়ায়।

কাজের সংগঠনের দলগত পদ্ধতি সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার এক নতুন, অত্যন্ত কার্যকর রূপ সৃষ্টি করেছে; তা 'গোটা প্রযুক্তিগত শিকল বরাবর' প্রতিযোগিতা নামে পরিচিত, অর্থাৎ প্রারম্ভিক কাজের কক্ষ থেকে মাল চালান দেওয়ার বিভাগ পর্যন্ত একটি উদ্যোগের সমস্ত কর্মশালা বেষ্টিত করে প্রতিযোগিতা। প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি পর্যায়ে উৎপাদের প্রবাহ ছেদহীন রাখার লক্ষ্যে পরিচালিত প্রতিযোগিতার এই রূপটির বৈশিষ্ট্য হল কার্যকর পারস্পরিক সাহায্য, প্রতিটি ক্রিয়ার ব্যাপারে কাজের উচ্চতর মানের উপরে জোর দেওয়া, এবং শ্রমিকদের পরস্পর-পরিবর্তনযোগ্যতা।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা অভিযানগুলি আলাদা এক একটি উদ্যোগের গন্ডি পেরিয়ে যায় বলে, সেগুলি পরিণত হয় উদ্যোগগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতায়। এর মূল রূপটি হল সংশ্লিষ্ট উদ্যোগগুলির, যেগুলি একই ধরনের উৎপাদ উৎপন্ন করে সেগুলির কর্ম-সংঘগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা। সাংগঠনিকভাবে, এই ধরনের প্রতিযোগিতা একটিমাত্র উদ্যোগের অভ্যন্তরে কর্মিদলগুলির প্রতিযোগিতার অনুরূপ।

সংশ্লিষ্ট উদ্যোগগুলির মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার জড়িত থাকে অর্থনৈতিক ও ঐচ্ছিক সংগঠনগুলির উচ্চ-স্তরের সংস্থাগুলি কর্তৃক স্থিরীকৃত শর্তের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক অঙ্গীকার ও প্রতিযোগিতা চুক্তি। এই ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রাহী উদ্যোগগুলি যে সমাজতান্ত্রিক অঙ্গীকার করে তা বেষ্টন করে উৎপাদনের ক্ষেত্রে (মূল পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, পরিকল্পনার অতিরিক্ত উৎপাদিতব্য সামগ্রীর পরিমাণ, কতটা সম্পদ সাশ্রয় করা হবে তার পরিমাণ, নবোদ্ভাবনার প্রস্তাবগুলি প্রবর্তনের ফলস্বরূপ সাশ্রয় ইত্যাদি) এবং শ্রমিকদের জীবনের ও কাজের অবস্থার উন্নয়নকেও (অর্থাৎ, শ্রম সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য গৃহীতব্য ব্যবস্থা, জীবনের অবস্থা উন্নত করা, স্বাস্থ্য-কেন্দ্রগুলি নির্মাণের জালবিস্তার প্রসারিত করা, পদযোগে কলেজ স্তরের পাঠ গ্রহণে অথবা সাক্ষ্য মাধ্যমিক স্কুলে যোগদানে শ্রমিকদের উৎসাহিত করা ইত্যাদি)।

আজ বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ ও অন্যান্য উৎপাদনী ব্যবস্থার (গবেষণা কেন্দ্র সমেত) সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার প্রসার ঘটানো বিশেষভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যয়-হিসাবরক্ষণের ভিত্তিতে কাজের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে যে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র গড়ে ওঠে এবং যার ভিত্তি হল বিশেষভাবে সম্পাদিত সব চুক্তি, সেই প্রত্যক্ষ যোগসূত্রগুলিকে শক্তিশালী করে সেগুলির কর্ম-সংঘের মধ্যে সংগঠিত প্রতিযোগিতা পারস্পরিক সরবরাহের

জন্য পরিকল্পনাগুলি পূরণ করার দিকে তাদের প্রচেষ্টাকে সমন্বিত করতে সাহায্য করে। অধিকন্তু, প্রতিযোগিতা একটিমাত্র উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় জড়িত করে বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশার লোকদের — কারখানা শ্রমিক ও অফিস কর্মী, ইঞ্জিনিয়ার, কৃৎকুশলী, বিজ্ঞানী ও কৃষি শ্রমিকদের।

তাই সংশ্লিষ্ট উদ্যোগগুলিকে জড়িত করে যে প্রতিযোগিতা অভিযানগুলি হয় তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা যায় এইভাবে। প্রথম, অংশগ্রাহীদের পারস্পরিক সহায়তার লক্ষ্য থাকে, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে, সামাজিক চাহিদা পূরণ। প্রতিযোগিতার লক্ষ্য সূত্রবদ্ধ হয় যে উৎপাদন-প্রক্রিয়াগুলিতে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রাহীরা জড়িত সেগুলির চূড়ান্ত পরিণতির দিক দিয়ে, মধ্যবর্তী পরিণতির দিক দিয়ে নয়। দ্বিতীয়, প্রতিযোগিতা একক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের গন্ডি পেরিয়ে যায়। এটা সমাজতন্ত্রে শ্রমসংগঠনের সামাজিক রূপের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তৃতীয়, এই ধরনের প্রতিযোগিতা সরবরাহের নির্দিষ্ট সময় ও পরিকল্পনাগুলি মেনে চলার দিকে অংশগ্রাহীদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে।

সংশ্লিষ্ট কর্ম-সংঘগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলাফল যখন পর্যালোচনা করা হয়, তখন যে সংঘটি বারি অংশগ্রাহীদের জন্য অনুকূলতম অবস্থা তৈরি করে সমাজতান্ত্রিক অঙ্গীকার পালনে তাদের সাহায্য করে, সেই সংঘটিকে বিজয়ী হিশেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

আজ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতি ত্বরিত করার উদ্দেশ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা অভিযানগুলি ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব অর্জন করেছে।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার সকল রূপেরই যে বৈশিষ্ট্যটি আছে, তা হল কর্মদক্ষতা ও কাজের গুণগত মান বাড়ানোর দিকে সেগুলির অভিমুখীনতা। এর ফলে একটি দেশের অভ্যন্তরে তথা এক আন্তর্জাতিক পরিসরেও এরূপ প্রতিযোগিতা সংগঠিত করা সম্ভব হয়।

আজকের সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল একটা আন্তর্জাতিক ব্যাপার হিসেবে তার বিকাশ, যা সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশকে জড়িত করে। এরূপ প্রতিযোগিতা সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংবদ্ধতা আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রম-বিভাজন, উৎপাদনের আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ ও সহযোগিতা, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যের সাযুজ্যের বিস্তৃতি, এবং সব শেষে, এই দেশগুলিতে কোটি কোটি শ্রমিকের অধিকতর রাজনৈতিক সচেতনতার এক বিষয়গত বহিঃপ্রকাশ।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সবচেয়ে বহুলপ্রচলিত রূপ হল সেইটি, যেটি সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ ও সংগঠনগুলির কর্ম-সংঘগুলিকে জড়িত করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, 'সয়রুজ' গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্পে জড়িত পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদভুক্ত দেশগুলির প্রত্যেকটিই পাইপলাইনের একটি অংশ নির্মাণে তার নিজস্ব সহায়-সম্পদ ও জনশক্তি ব্যবহার করেছিল। অংশগ্রাহী দেশগুলির নির্মাণকর্মীদের দলগুলি সমাজতান্ত্রিক

প্রতিযোগিতা চুক্তি সম্পাদন করেছিল, সেই সমস্ত চুক্তি অনুষায়ী কাজের গুণগত মান উন্নত করা ও পরিকল্পনার সম্মত দায়িত্বগুলি পূরণ বা অতিপূরণ করার ব্যাপারে তাদের প্রচেষ্টা সমাহত করেছিল। আন্তর্জাতিক দলগুলির প্রত্যেকটির করা কাজের সামগ্রিক ফল এইভাবে অনেকখানি উন্নত করা হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা যুক্ত সরবরাহের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সহযোগিতা পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণে জড়িত পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদভুক্ত দেশগুলির শিল্পোদ্যোগগুলির কর্ম-সংঘের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতম ফল দেয়। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অন্যান্য বহুলপ্রচলিত রূপের মধ্যে আছে মেশিন-অপারেটরদের বা চাষীদের প্রতিযোগিতা এবং যুক্ত নির্মাণ প্রকল্পগুলিতে নিযুক্ত দলগুলির মধ্যে বিশেষজ্ঞ বিনিময় ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সব কটি রূপই সংঘর্ষবাদের ও সাধিসূলভ সহযোগিতার প্রসার ঘটায়।

সমাজতান্ত্রিক অভিমুখীনতাসম্পন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও প্রতিযোগিতা ক্রমে ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এই সমস্ত দেশে সংস্কৃতি সুদূরপ্রসারী সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তরসমূহ প্রতিযোগিতা বিকাশের বিষয়গত পূর্বশর্তগুলি সৃষ্টি করে।

সাধিসূলভ প্রতিযোগিতা বিকশিত হয়, প্রথমত ও প্রধানত, সার্বজনিক (রাষ্ট্রায়ত্ত্ব) ক্ষেত্রে, যে ক্ষেত্রটি উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলিতে একটা বড় ভূমিকা পালন

করে। বড় বড় শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকরাই প্রতিযোগিতা অভিযানে সক্রিয়তম অংশগ্রাহী। প্রতিযোগিতায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে মূল গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিতে নিযুক্ত লোকেরা — যন্ত্রকুশলী, বিদ্যুৎকর্মী, তেলকর্মী, প্রভৃতি। একটি দৃষ্টান্ত: হাজার হাজার সিরীয় শ্রমিক ইউফ্রেটিস জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে নির্দিষ্ট সময়ের আগে পরিকল্পনা পূরণ করার জন্য প্রতিযোগিতা করেছিল। সেই প্রকল্পে নিযুক্ত সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের উদ্যোগে চালু এই অভিযানের ফলে কাজের হার প্রচণ্ডভাবে বেড়েছিল।

উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলির জনসমষ্টির অধিকাংশ যেখানে নিযুক্ত, সেই কৃষি ক্ষেত্রটি উন্নত করার ব্যাপারেও প্রতিযোগিতা একটা বড় ভূমিকা পালন করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিযোগিতা অভিযান শুরু হয় পূর্ত কর্ম-প্রকল্পগুলিতে, যেখানে লোকে যৌথভাবে কাজ করে এবং যেখানে শ্রমের সহযোগিতার আদি রূপগুলি দেখা দিয়েছিল। আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশে লোকে পূর্ত কর্ম-প্রকল্পগুলিতে, যেমন খাল কাটা ও রাস্তা তৈরি করা, কূপ খনন করা এবং বাঁধ, স্কুল বা হাসপাতাল নির্মাণ করার কাজে অংশগ্রহণ করে বিনা পারিশ্রমিকে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আলজিরিয়ায় ‘স্বতঃপ্রণোদিত কাজের জন্য’ একটা আন্দোলন আছে, যাকে অভিহিত করা হয় ‘স্বতঃপ্রণোদনাবাদ’ বলে; এটি আত্মপ্রকাশ করেছিল ১৯৭২ সালে। সেই বছরে আরব কৃষি সংস্কারকর্মে জড়িত হয়েছিল বিপুল সংখ্যক

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র স্বেচ্ছাকর্মীরা, যারা তাদের ছুটির সময়ে জমি চাষ করা ও ফসল কাটার কাজে কৃষকদের সাহায্য করেছিল। পরবর্তীকালে সেই আন্দোলন জড়িত করেছিল হাজার হাজার অন্য লোককে, তাদের মধ্যে ছিল স্কুলের উঁচু ক্লাসের পড়ুয়ারা এবং সপ্তাহান্তিক দিনগড়লিতে কারখানা শ্রমিকরা।

অন্যান্য দেশেও সাধিসদুলভ সহযোগিতার বিভিন্ন ধরন আত্মপ্রকাশ করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সিরিয়ায় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব উদ্যোগগড়লিতে, যাকে বলা হয় বাছাই কাজের দলের আন্দোলন, তা ব্যাপক হয়ে উঠেছে। অংশগ্রহণী দলগড়লির লক্ষ্য হল শ্রম নিয়মানুবর্তিতা সূদৃঢ় করা, কাজের গুণগত মান উন্নত করা এবং তাদের দক্ষতা বাড়ানো।

প্রতিযোগিতা শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এবং বস্তু-উপকরণ ও জনশক্তির মিতব্যয় নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আলজিরিয়ার তিয়ারেত শহরে একটি নির্মাণোপকরণ কারখানার শ্রমিকরা তাদের এক দিনের উপার্জিত অর্থ ‘উৎপাদনের জন্য লড়াই’ তহবিলে মাসিক ভিত্তিতে দান করার এক অভিযান চালু করেছিল। আলজিরিয়ার অন্য অনেক রাষ্ট্রায়ত্ত্ব উদ্যোগে শ্রমিকরা উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন করে, উৎপাদের রীতি নির্ধারণ করে এবং তা পূরণ ও অতিপূরণ করার জন্য অভিযান চালু করে। ফলে, শ্রম-সময় হানি হ্রাস পায় এবং উৎপাদের গুণগত মান উন্নত হয়।

কোনো কোনো দেশে প্রতিযোগিতার সাংগঠনিক

নীতি ও রীতিপদ্ধতি স্থির করার প্রচেষ্টা হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বর্মায় শ্রম মন্ত্রক প্রতিযোগিতার নিয়মাবলী প্রণয়ন করেছে, এই সমস্ত নিয়ম অনুসারে প্রতিযোগিতার ফল পর্যালোচনা করা হবে প্রতি তিন মাস অন্তর, এই ধরনের সব সূচকের ভিত্তিতে, যেমন — শ্রমের উৎপাদনশীলতা, কাজের সংগঠন, র্যাশনালাইজেশন অভিযানের পরিসর, প্রাথমিক প্রযুক্তি প্রবর্তন, শ্রম নিয়মানুবর্তিতা ও শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নত করার প্রচেষ্টা।

বিকাশের সমাজতান্ত্রিক পথ বেছে-নেওয়া এই সমস্ত উন্নয়নশীল দেশে প্রতিযোগিতা সবে ভিত গাড়তে শুরু করেছে। এর সংগঠকদের সামনে বহু সমস্যা রয়েছে সেগুণি সমাধান করা যাবে বিভিন্ন স্থানীয় বিষয়কে গণ্য করেই। বলা বাহুল্য, এই দেশগুলিতে প্রতিযোগিতার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ভালোই। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বহু দেশে তা বিকাশলাভ করে এক ব্যাপক আন্তর্জাতিক আন্দোলনে পরিণত হচ্ছে।

৫। সমাজতন্ত্রে বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব এবং শ্রম

শ্রমের অন্তর্ভুক্তিতে পরিবর্তন অনেকাংশে বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের দরুন। সমাজতন্ত্রে বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের চরিত্র নির্ণয় করা যায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে সমাজতন্ত্রের সুবিধাগুণি দিয়ে। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতি ঘরান্বিত করার জন্য

সমাজতন্ত্র নতুন নতুন সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি করে এবং অনন্য প্রগেদনা যোগায়। এগুলির মধ্যে আছে উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা, পরিকল্পিত ভিত্তিতে ও সমগ্র সমাজের পরিসরে শ্রমের সহযোগিতা, শ্রমের সর্বজনীনতা, কৃত কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী বৈষয়িক সম্পদ ও সাংস্কৃতিক সুফলগুলির বণ্টন, এক মৌল প্রয়োজন ও সমাজের চাহিদা পূরণের উপায় হিসেবে শ্রমের অবিভাজ্যতা। সমাজতন্ত্রে বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের লক্ষ্য হল নাগরিকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং অবাধ, সুসমঞ্জস বিকাশ নিশ্চিত করা।

সমাজতন্ত্রে, বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব সমাজের প্রধান উৎপাদিকা শক্তি হিসেবে ও নতুন ধরনের উৎপাদন সম্পর্কের এক বাহন হিসেবে মানুষের বিকাশে শ্রমের ভূমিকাকে বাড়িয়ে তোলে। বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব শ্রমের অন্তর্ভুক্তির সম্বন্ধিসাধনে একটা বড় ভূমিকা পালন করে, কেননা শ্রম সর্বাত্মক যন্ত্রীকরণের মধ্য দিয়ে যন্ত্রাভিত্তিক উৎপাদন থেকে বিকশিত হয়ে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার অটোমেশনে পরিণত হয়।

লোকের কাজ সহজতর করার জন্য, তাকে আরও বিচিগ্রমুখী ও উপভোগ্য করার জন্য, জাতীয় অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে যন্ত্রীকরণের উপর নির্ভর করা প্রয়োজন। সমাজতান্ত্রিক সমাজ পুঁজিবাদের কাছ থেকে পাওয়া উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে রূপান্তরিত করে এবং সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি সৃষ্টি করে।

সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাম্প্রতিকতম কৃতিত্বগুলির ব্যাপক ব্যবহারের উপরে প্রতিষ্ঠিত, সমগ্র সমাজের পরিসরে বৈষয়িক, শ্রম ও আর্থিক সম্পদের পরিকল্পিত বণ্টনের উপরে নির্ভরতা, উৎপাদনকে আরও বিজ্ঞানমুখী করার উপরে প্রতিষ্ঠিত সামাজিকীকৃত বৃহদায়তন যন্ত্রীকৃত উৎপাদন।

সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি সৃষ্টির নিহিতার্থ হল উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে যন্ত্রব্যবস্থা প্রবর্তন এবং কার্মিক, কারিগরসদৃশ কাজ থেকে যন্ত্রীকৃত কারখানার কাজে উত্তরণ।

যে দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে বৃহদায়তন শিল্প যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না, সেখানে সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি সৃষ্টি করা যায় শিল্পায়নেরই মধ্য দিয়ে।

সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন অগ্রাধিকারমূলক বিকাশ ঘটায় শিল্পের, সর্বোপরি ভারী শিল্পের এবং তার মূল গুরুত্বপূর্ণ অংশ — মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের। শিল্পায়নের ফলে শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যাগত বৃদ্ধি ঘটে এবং শ্রমিকরা দক্ষতা ও শিক্ষার উচ্চতর স্তর অর্জন করতে সক্ষম হয়।

সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন পুঁজিবাদী শিল্পায়ন থেকে মূলগতভাবে পৃথক। পুঁজিবাদে, শিল্পায়ন বিভিন্ন শিল্পে ও বিভিন্ন অঞ্চলে নিবদ্ধ লোকেদের কৃত কাজের অন্তর্বস্তুর পার্থক্য বাড়ায় এবং শ্রমিক শ্রেণীর উপরে শোষণকে নিবিড় করে। পুঁজিবাদ তার অস্তিত্বের

বছরগুলি ধরে শিল্পায়ন ঘটিয়েছে মাত্র মৃদুশ্রমেয় কয়েকটি দেশে, যেখানকার জনসংখ্যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৫ শতাংশ।

সমাজতন্ত্রে শিল্পায়ন বিকাশপ্রাপ্ত তথা পূর্বতন পশ্চাৎপদ অঞ্চলগুলিতে বিভিন্ন শিল্পে যন্ত্রীকরণের স্তর সমান করে এবং সামাজিক প্রয়োজনের জন্য বরাদ্দ বাড়ানো সম্ভব করে তোলে। কৃষক ও জাতীয় বুদ্ধিজীবীদের সংঘে মিলনে শ্রমিক শ্রেণীর শীর্ষস্থানীয় অবস্থানকেও তা সংহত করে।

পুঁজিবাদী শিল্পায়ন থেকে পৃথকরূপে, সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন ভারী শিল্পে (পুঁজিবাদে — লঘু শিল্প) নিযুক্ত শ্রমিকদের শ্রমের অন্তর্বস্তু পরিবর্তন করা দিয়ে শুরুর করে। উৎপাদনের এই ক্ষেত্রটিতে নির্মিত বড় বড় উদ্যোগে শ্রম যন্ত্রীকৃত, এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাম্প্রতিকতম কৃতিত্বগুলি ব্যাপক পরিসরে ব্যবহৃত হয়। গোটা এক একটা নতুন শিল্পের বিকাশ ঘটানো হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোভিয়েত ইউনিয়নে শিল্পায়নের কালপর্বটি চিহ্নিত ছিল ট্র্যাক্টর শিল্প, মোটরগাড়ি, রাসায়নিক, মেশিন-টুল, বিমান ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ দিয়ে। এই সমস্ত শিল্পে যন্ত্রীকরণের উচ্চতর স্তর-হেতু শ্রমিকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উচ্চতর স্তর দরকার হয়েছিল।

ভারী শিল্পের দ্রুত বিকাশ লঘু শিল্পেও শ্রমের অন্তর্বস্তুর পরিবর্তন-সংশোধন সম্ভব করে তুলেছিল। ভারী শিল্পে বিপুল পরিসরে মেশিন-টুল ও সাজসরঞ্জাম উৎপাদনের ফলে লঘু শিল্পে শ্রমের

যন্ত্রীকরণ ঘটেছিল এবং এখানে নিযুক্ত লোকেদের কাজ বেশি আকর্ষক হয়েছিল।

শিল্পায়ন কৃষি শ্রমের অন্তর্ভুক্ত পরিবর্তনও সম্ভব করে তুলেছিল। আগে, অ-একত্রীভূত ও ইতস্ততাবিক্ষিপ্ত ছোট ছোট খামারে প্রাণসর কৃষিকর্ম ও যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করা অসম্ভব ছিল। খামারিদের ব্যবহৃত জমির টুকরোগুলি এত ছোট ছিল যে সেখানে যন্ত্র নিয়োগ করা কিংবা প্রাণসর চাষ-আবাদের পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেত না। যন্ত্রপাতি কেনার সামর্থ্য ছিল খুব কম কৃষক পরিবারেরই। তাই, সমাজতান্ত্রিক ঐক্যীকরণে উত্তরণের, অর্থাৎ, ক্ষুদ্র-পণ্য খামারের উৎপাদন থেকে কৃষি সমবায়ীকরণে এবং খামারিদের সমবায়গুলির অভ্যন্তরে বিরাট পরিসর যন্ত্রীকৃত উৎপাদনে উত্তরণের এক বিষয়গত প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নে খামারিদের সমবায়গুলি সংগঠনের ফলে কার্যিক শ্রম ও চাষের পশু ব্যবহার থেকে যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উত্তরণ সম্ভব হয়েছিল।

কৃষিতে, ঠিক শিল্পেরই মতো, দেখা দিয়েছিল নতুন নতুন ধরনের কাজ ও বৃত্তি। ক্ষুদ্র কৃষক খামারগুলিতে, একই লোকেরা চাষ করত ক্ষেত, বাগিচা ও শাকসবজির বাগান এবং গবাদি পশু পালন করত। সমবায়গুলিতে লোকে দেখতে পেয়েছিল যে তারা তাদের দক্ষতা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আরো ভালোভাবে কাজে লাগাতে পারে যদি তারা বিশেষীকরণের আশ্রয় নেয়, কেউ নিযুক্ত হয় গম, তিসি, বাজরা, আপেল, প্রভৃতি ফসল ফলানোর কাজে, অন্যরা নিযুক্ত হয় গবাদি পশু পালন বা

হাঁসমূরগি পালনে। ক্রমেই আরও বেশি সংখ্যায় যন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ায় দেখা দিয়েছিল নতুন নতুন কাজ — ট্র্যাক্টর-ড্রাইভার, কম্বাইন-অপারেটর, দক্ষদোহন যন্ত্রচালক ইত্যাদির কাজ। আত্মপ্রকাশ করেছিল জ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্র, যেমন কৃষি প্রযুক্তিবিদ্যা ও পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান। গ্রামীণ লোকেরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের শ্রম প্রয়োগ করার এবং তাদের সামর্থ্য অনুসারে কাজ পাওয়ার ব্যাপকতর সুযোগ পেয়েছিল।

শিল্পে ও কৃষিতে যন্ত্রপাতির ব্যাপক প্রবর্তন-হেতু বিপদুল সংখ্যক দক্ষ শ্রমিক দরকার হয়েছিল। একটা আদিম লাঙল দিয়ে জমি চাষ করতে হলে গায়ে জোর থাকা দরকার এবং এমন সব দক্ষতার অধিকারী হওয়া দরকার যেগুলি পাওয়া যায় পুরুষানুক্রমে। লাঙল-চষা চাষীর কাজ একজন নিরক্ষর ব্যক্তিও করতে পারে। একটা কম্বাইন হার্ভেস্টার চালাতে হলে, একটা ট্র্যাক্টর বা গাড়ি চালাতে হলে, কিংবা রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হলে জ্ঞান ও দক্ষতা, অর্থাৎ বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ থাকা দরকার। কর্মবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দানের সমস্যাটির সমাধান হয় এক সংস্কৃতি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে।

সংস্কৃতি বিপ্লব সমাজের সমগ্র সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত জীবনের রূপান্তর ঘটায় এবং শ্রমজীবী জনগণের মানসিক চাহিদার বিকাশ ও পূরণের পক্ষে সহায়ক অবস্থা সৃষ্টি করে। সংস্কৃতি বিপ্লব গড়ে তোলে শিক্ষিত, উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিকদের, যারা উৎপাদন ও

রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলি ব্যবস্থাপনা করতে ও সমাজতন্ত্র নির্মাণ করতে সক্ষম।

সমাজতন্ত্র সমস্ত জনগণের পক্ষে জ্ঞানকে ও মানবজাতির সংস্কৃতির সম্পদকে অধিগম্য করে তুলেছে। শ্রমজীবী জনগণ যাতে বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার কৃতিত্বগুলি — বহু প্রজন্মের উত্তরলব্ধি — আয়ত্ত ও আত্মস্থ করতে পারে, তার জন্য নিরক্ষরতা দূরীকরণ করতে হয়। জার শাসনের আমলে রাশিয়ার জনসমষ্টির ৭০ শতাংশ লিখতে বা পড়তে পারত না। দেশের যে-সমস্ত প্রত্যন্ত জেলাগুলিতে প্রধানত অ-রুশ অধিজাতিগুলি বসবাস করত, সেখানে নিরক্ষরতার হার ছিল প্রায় ১০০ শতাংশ। নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গৃহীত ব্যবস্থাগুলির লক্ষণীয় ফল ফলেছিল: ১৯৩৯ সালে, সোভিয়েত ইউনিয়নের জনসমষ্টির ৮৭.৪ শতাংশ লিখতে ও পড়তে পারত, এবং যে-সমস্ত অধিজাতির আগে নিজস্ব কোনো লিখিত ভাষা ছিল না তাদের জন্য লিখিত বর্ণমালার বিকাশ ঘটানো হয়েছিল।

সংস্কৃতি বিপ্লব অদক্ষ কার্যিক শ্রম থেকে দক্ষ শ্রমে উত্তরণের পূর্বশর্তগুলি সৃষ্টি করে, বৃত্তিগত ও কৃৎকৌশলগত প্রশিক্ষণের এক ব্যবস্থা বিকশিত করার উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করে। সংস্কৃতি বিপ্লব চলাকালে স্থাপিত হয় অসংখ্য কৃৎকৌশলগত, বৃত্তিগত ও কারখানা স্কুল, এবং উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কৃৎকৌশলগত কলেজগুলিতে প্রশিক্ষণ পায় বিপুল সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ার ও কৃৎকুশলী।

শিল্পে ও কৃষিতে নিযুক্ত মানসিক শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়ে। সংস্কৃতি বিপ্লব সৃষ্টি করে এক নতুন ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিগত শ্রমিকদের — শ্রমিক শ্রেণী ও যৌথখামারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত গণ-বুদ্ধিজীবী।

সংস্কৃতি বিপ্লব শ্রম-প্রক্রিয়ায় জ্ঞানের ভূমিকা বাড়ায়। এটা দেখা যায় এই ঘটনা থেকে যে যন্ত্র-চালক শ্রমিকদের পক্ষে সাধারণ শিক্ষা ও পেশাগত প্রশিক্ষণ নৈপুণ্য বা শক্তির মতোই অত্যাৱশ্যক। যে কোনো কার্যিক শ্রম মেনে নিতে প্রস্তুত আধা-সাক্ষর শ্রমিককে সংস্কৃতি বিপ্লব পরিণত করে এক দক্ষ, যোগ্য শ্রমিকে, যে তার কাজের খুঁটিনাটি সমস্ত জানে এবং যন্ত্র ও সরঞ্জাম নিয়ে কাজ করতে পারে।

এইভাবে, যন্ত্রপাতি প্রবর্তনের দরুন, অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনগণের শ্রমের অন্তর্বস্তু অনুরূপ হয়ে ওঠে। বেশির ভাগ কাজের জন্যই দরকার হয় যন্ত্রীকৃত দক্ষ শ্রম। কিন্তু, যন্ত্রব্যবস্থার প্রবর্তন নিজে থেকেই নির্দিষ্ট আংশিক কাজের শ্রমিকদের প্রয়োজনীয়তা অথবা সুনির্দিষ্ট ধরনের শ্রম-বিভাজনের সঙ্গে লোকের সংলগ্নতা দূর করে না। সেটা করা যেতে পারে একমাত্র বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লব চলার মধ্য দিয়েই।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্রে কার্যিক শ্রমের অন্তর্বস্তুকে প্রথমে পরিবর্তিত করে। সর্বাঙ্গক যন্ত্রীকরণ ও অটোমেশন এই পরিবর্তনের পক্ষে অপরিহার্য।

অটোমেশনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে, যখন তা আলাদা এক একটি ক্রিয়াকে বা এক প্রস্তুত মূল গুরুত্বপূর্ণ

হিরাকে বেণ্টন করে, তখন পর্যন্তও অংশগুলিকে বসানো ও পুরো তৈরি উৎপাদটি সরানো শ্রমিকদেরই দায়িত্ব। উৎপাদসমূহ ও অংশগুলি পরিবহণ করার জন্য, যন্ত্রপাতি মেরামত ও বিন্যস্ত করার জন্য, এবং উৎপাদন-প্রক্রিয়া দেখাশোনা করার জন্যও শ্রমিক দায়ী।

অটোমেশনের দ্বিতীয় পর্যায়ে, যখন একটি কর্ম-কেন্দ্রে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলি উৎপাদন-ক্রিয়াগুলির গোটা প্রস্তুতাই সম্পন্ন করে, তখন যন্ত্রটিতে মাল তোলা ও তা থেকে মাল নামানোর জন্য শ্রমিক আর দায়ী থাকে না, সে শুধু উৎপাদ ও অংশগুলির পরিবহণ, গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন পদ্ধতিগুলি পালন এবং স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটির মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিন্যস্তকরণের দায়িত্বে থাকে।

অটোমেশনের তৃতীয় পর্যায়টি ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ও নমনীয় স্বয়ংকৃত উৎপাদন প্রবর্তনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। গোটা স্বয়ংকৃত ব্যবস্থাটি এখন শ্রমিকের অংশগ্রহণ ছাড়াই পূর্নবিন্যস্ত করা যায়। নমনীয় স্বয়ংকৃত উৎপাদন হল অংশগুলির ডিজাইনিং ও স্বয়ংক্রিয় ম্যানুফ্যাকচারিংকে জড়িত করে একটা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার বিশদীকরণ উদ্যোগটির ডিজাইন ও প্রযুক্তিগত বিভাগগুলির দায়িত্ব। এই ব্যবস্থায় সমস্ত অঙ্গীয় অংশ কম্পিউটারের মধ্য দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। এর ফলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বহুগুণ বাড়ানো যায়। অংশগুলি ডিজাইন ও তৈরি করার কাজে ব্যয়িত সময় অর্ধেক, এমন কি দুই-তৃতীয়াংশ কমানো যায়, এবং বিপুল সংখ্যক শ্রমিককে মুক্ত করা যায়।

সেই সঙ্গে, এর জন্য দরকার হয় অধিকতর দক্ষতা এবং শ্রম ও উৎপাদনের যথোপযুক্ত সংগঠন। যে-সমস্ত ক্রিয়া আগে কার্যকর শ্রমিক সম্পন্ন করত, সেগুলি হ্রমবর্ধমান সংখ্যায় কম্পিউটারের কাছে স্থানান্তরের ফলে শ্রমিককে শুধু উৎপাদন-প্রক্রিয়া দেখাশোনা করা আর নিয়ন্ত্রণ করার কাজটুকুই করতে হয়, তাতে তার কাজের বুদ্ধিবৃত্তিগত অন্তর্বস্তু বৃদ্ধি পায় এবং কাজ আরও সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠে।

বৈষয়িক উৎপাদনে শ্রমের অন্তর্বস্তু ও গঠনকাঠামোতে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে যে-সমস্ত পরিবর্তন ঘটে, সেগুলি সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষ সামাজিকীকৃত শ্রমের চরিত্রের অদলবদল ঘটায়। উৎপাদিকা শক্তিগুলি যদি যথেষ্ট বিকশিত না হয়, তাহলে শ্রম প্রধানত দেখা দেয় বৈষয়িক সম্পদ উৎপন্ন করার উপায় হিসেবে। সামাজিক উৎপাদন যখন সর্বাঙ্গিক অটোমেশনের পর্যায়ে প্রবেশ করে, তখন বৈষয়িক ও আর্থিক সম্পদের উৎপাদন বাড়ে। অবশ্য সামাজিক শ্রমের ক্রিয়াগত ভূমিকায় হ্রমান্বিত পরিবর্তনগুলি ঘটতে দীর্ঘ সময় লাগবে। এই প্রক্রিয়ার ফলে কার্যকর ও অ-কার্যকর, উভয় প্রকার শ্রমই বুদ্ধিবৃত্তিগত কাজে পরিণত হবে।

কার্যকর শ্রম বুদ্ধিবৃত্তিগত কাজে পরিণত হওয়ার একটা পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে শ্রমজীবী জনগণের শিক্ষাগত স্তরের উন্নতির পরিচয়বাহী উপাত্ত থেকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোভিয়েত ইউনিয়নে ছবিটা এই রকম। ১৯৫৯ সালে, উচ্চতর, অসম্পূর্ণ উচ্চতর, মাধ্যমিক ও অসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির

ছিল প্রধানত কার্যিক শ্রমে নিযুক্ত শ্রমিকদের ৩৩ শতাংশ এবং প্রধানত মানসিক শ্রমে নিযুক্ত শ্রমিকদের ৯০ শতাংশ, সেখানে ১৯৭০ সালে অংকগুণি ছিল যথাক্রমে ৫৪ শতাংশ ও ৯৫ শতাংশ, এবং ১৯৮৩ সালে ৮২ শতাংশ ও ৯৮ শতাংশ।

সামাজিক শ্রমের বৃদ্ধিবৃত্তিগত কাজে পরিণত হওয়ার পরিচয় পাওয়া যায় জাতীয় অর্থনীতিতে নিযুক্ত উচ্চতর ও মাধ্যমিক বিশেষীকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে। যেমন, সোভিয়েত ইউনিয়নে, যন্ত্র-নির্মাণ কারখানাগুলির যে-সমস্ত কর্মশালায় সরল শ্রমের প্রাধান্য, সেখানে প্রতি ১০০ জন কার্যিক শ্রমিক পিছদ আছে চার বা পাঁচজন ইঞ্জিনিয়ার ও কৃৎকুশলী, মিশ্র সরঞ্জামবিশিষ্ট কর্মশালাগুলিতে আছে ৯-১০ জন ইঞ্জিনিয়ার ও কৃৎকুশলী, যে-সমস্ত কর্মশালায় বেশির ভাগ সরঞ্জাম স্বয়ংক্রিয়, সেখানে আছে ১৪-১৫ জন ইঞ্জিনিয়ার ও কৃৎকুশলী, আর সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংকৃত উদ্যোগগুলিতে, যেমন আধুনিক তাপ বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্রগুলিতে, গোটা কর্মবাহিনীই ইঞ্জিনিয়ার ও কৃৎকুশলীদের নিয়ে গঠিত।

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে, ১৯৬৯ থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে উচ্চতর ও মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা বেড়েছিল ৫.১ গুণনীয়কে, উচ্চতর শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা বেড়েছিল ৪.৯ গুণনীয়কে এবং মাধ্যমিক বিশেষীকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা বেড়েছিল ৫.২ গুণনীয়কে। বুলগেরিয়ায়, ১৯৬০ থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে বৃদ্ধি

গুণনীয়ক ছিল যথাক্রমে ৩.৫, ৩.১ ও ৩.৫; পোল্যান্ডে ১৯৫৮ থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে বৃদ্ধি গুণনীয়ক ছিল যথাক্রমে ৫, ৪ ও ৫.৬, উচ্চতর ও মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের সংখ্যাবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছিল সব কটি সমাজতান্ত্রিক দেশে।

কম্পিউটার প্রবর্তন, কেরানি সংক্রান্ত কাজের উন্নতি ও যন্ত্রীকরণ, উপাত্ত সংগ্রহ ও সঞ্চয় ব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ মানসিক শ্রমিকদের একত্রে, বান্ধিক কাজ থেকে ক্রমে ক্রমে মৃদুস্তিলাভের এবং অদক্ষ ও আধা-দক্ষ কাজের সংখ্যা হ্রাসের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে। স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও কম্পিউটার প্রবর্তন, তথা উৎপাদনের সামাজিকীকরণের স্তর উন্নত করার উদ্দেশ্যে সাংগঠনিক ব্যবস্থাবলী রূপায়ণ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে মানসিক শ্রমে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটায় এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মীদের অধিকতর দক্ষতা দাবি করে।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে, উৎপাদন ব্যবস্থাপক ও বিশেষজ্ঞদের করা কাজের অন্তর্বস্তু ক্রমেই বেশি জটিল হয়ে ওঠে। এটা হয় নতুন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কৃৎকৌশল প্রবর্তন এবং সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলির উপরে অধিকতর গুরুত্বারোপ, উভয়েরই দরদর। সেই জন্যই, ইঞ্জিনিয়ারিং, অর্থনীতি ও উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় শিক্ষিত হওয়া ছাড়াও, শিক্ষাবিজ্ঞান, সামাজিক মনস্তত্ত্ব, মানবিক ইঞ্জিনিয়ারিং, সমাজবিদ্যা, প্রভৃতিতে তাদের জ্ঞানলাভ করার দরকার হয়।

অ-উৎপাদনী ক্ষেত্রে শ্রমের অন্তর্বস্তুতে অনেক

পরিবর্তন ঘটে। বিজ্ঞানে, শিক্ষায় ও স্বাস্থ্য কৃতাকে যন্ত্র ও বিশেষ সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয় ক্রমবর্ধমান পরিসরে। ভোক্তা কৃত্যগদুলিতে নতুন সরঞ্জামের প্রবর্তন আরও প্রগতিশীল সব পদ্ধতি প্রয়োগ সম্ভব করে তোলে, যেমন — স্বয়ং-সেবা, আগে অর্ডার দিয়ে বিক্রয় এবং ডাকযোগে অর্ডার দেওয়ার ব্যবস্থা।

সর্বাঙ্গক যন্ত্রীকরণ (কম্পিউটার প্রবর্তন) যন্ত্র ও যন্ত্রব্যবস্থার ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের কাজগদুলি কম্পিউটারের কাছে স্থানান্তরিত করে এমন বহু শ্রমিককে মুক্ত করা সম্ভব করে তুলবে, যারা এখন নিযুক্ত আছে অদক্ষ ও আধা-দক্ষ কার্যিক শ্রমে, সেই সঙ্গে মুক্ত করবে কিছু সংখ্যক দক্ষ শ্রমিককেও যারা এখন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায়।

উৎপাদনী ক্ষেত্র থেকে প্রচুর সংখ্যক শ্রমিকের মুক্তি শ্রম-বাহিনীর একটা বড় অংশকে অ-উৎপাদনী ক্ষেত্রে কাজে লাগানো, শ্রম-সময় কমানো এবং কাজের বাইরের সময়ের কাঠামোটাকে সুবিন্যস্ত করা সম্ভব করে তুলবে। বৈষয়িক সামগ্রী উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রমের বৃহত্তর অংশ কেন্দ্রীভূত হবে গবেষণা ও উন্নয়নের এলাকায়। শেষোক্তটি হবে উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় প্রস্তুতিমূলক পর্যায়। বিজ্ঞান ও উৎপাদনের সংঘবদ্ধতা ঘটবে। এইভাবে, চিরাচরিত 'কাঁচামাল থেকে উৎপাদ' চক্রটির বদলে বরং 'চিন্তা থেকে উৎপাদ পর্যন্ত' গোটা চক্রটাকে বেষ্টন করবে উৎপাদন-প্রক্রিয়া। মানসিক শ্রমিক ও কার্যিক শ্রমিকদের মধ্যকার সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভেদগদুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য অত্যাবশ্যক এই বিষয়টি বৈজ্ঞানিক

ও প্রযুক্তি বিপ্লবের বিকাশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

বৈষয়িক উৎপাদনের প্রক্রিয়া ক্রমেই বেশি নির্ভর করবে যৌথ বিচারবুদ্ধির পরিপক্বতার মাত্রার উপরে। তদনুযায়ী, উৎপাদনী ক্ষেত্রে শ্রমের অন্তর্বস্তু বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে সহজাত সৃষ্টিশীল উপাদান দিয়ে অনেকখানি নির্ধারিত হবে।

প্রধানত বিস্তৃত থেকে প্রধানত নিবিড় ধরনের উৎপাদনে এক উত্তরণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে, কায়িক, নিম্নমর্যাদার কাজগুলি হ্রাস করা ক্রমেই বেশি অবশ্যকর্তব্য হয়ে ওঠে। বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নে কায়িক ক্রিয়াগুলির পরিমাণ হ্রাসের জন্য এক সর্বাঙ্গিক দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির বিকাশ ঘটেছে। এটি ব্যয়সাপেক্ষ কর্মসূচি হবে। (উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে, একটি কর্ম-কেন্দ্রের সর্বাঙ্গিক যন্ত্রীকরণের গড় খরচ হল আনুমানিক ১৪,০০০ ডলার)। যন্ত্রীকরণের খরচ হিসাব করার সময়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি গণ্য করা হয়: জাতীয় অর্থনীতিতে গঠনকাঠামোগত পরিবর্তন, উৎপাদনের বিশেষীকরণের উচ্চতর মাত্রা, আন্তঃক্ষেত্রগত যোগসূত্রের বিস্তৃতি, স্থায়ী উৎপাদনী পরিসম্পদগুলির পুনর্নবায়নের হার, এবং কর্মী প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন বাবদ ব্যয়। বাসগৃহ, প্রাক-স্কুল প্রতিষ্ঠানসমূহ, স্বাস্থ্য পরিচর্যা কেন্দ্র, প্রভৃতি নির্মাণের সঙ্গে জড়িত ব্যয় সমেত সামাজিক বিষয়গুলির গোটা একটা ব্যবস্থাতন্ত্রও গণ্য করা হয়।

বৈজ্ঞানিক - প্রযুক্তি বিপ্লবের কৃতিত্বগুলি উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রবর্তন করার ফলে সেই ধরনের

শ্রম-বিভাজন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়, যেখানে প্রত্যেক শ্রমিক একটি সংকীর্ণ ক্ষেত্রে বিশেষতা অর্জন করত এবং একই ধরনের মূল্য শ্রমের সঙ্গে সংযুক্ত থাকত। আজ, বহু কাজকে বিভিন্ন শিল্পে প্রয়োগ করা যায় (দৃষ্টান্তস্বরূপ, সাজসরঞ্জামের অ্যাডজাস্টারের কাজ ও স্বয়ংকৃত উৎপাদন লাইনগুলির কাজ)।

স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কাজের অবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজগুলি নিশ্চিতকরণ শ্রমে সামাজিক-অর্থনৈতিক অননুরূপতা কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টার এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। লেনিন মনে করতেন যে সমাজতন্ত্রে কাজের অবস্থার আমূল পরিবর্তন নির্ভর করবে প্রযুক্তিগত প্রগতির উপরে, বিশেষত বৈদ্যুতিকরণের উপরে, 'যা কাজের অবস্থাকে বেশি স্বাস্থ্যসম্মত করবে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে ধোঁয়া, ধুলো আর নোংরা থেকে মুক্ত করবে, এবং নোংরা, বিতৃষ্ণাজনক কর্মশালাগুলির - মানুষের উপযুক্ত পরিচ্ছন্ন, আলোকোজ্জ্বল ল্যাবরেটরিতে রূপান্তরকে ত্বরিত করবে'।*

সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ক্ষমতা যখন ক্রমে ক্রমে গড়ে তোলা হয়েছিল এবং উৎপাদনের প্রযুক্তিগত স্তর উন্নত করা হয়েছিল, তখন সেই সঙ্গে শ্রমের যন্ত্রীকরণ সংক্রান্ত সমস্যাগুলির উপযুক্ততর সমাধান খুঁজে বার করা হয়েছিল প্রথমত ও প্রধানত

* V. I. Lenin. 'A Great Technical Achievement', *Collected Works*, Vol. 19, 1977, p. 62.

সেই সমস্ত শিল্পে, যেখানকার কাজের অবস্থা ছিল বিশেষভাবেই কঠোর — কয়লা খনি, লৌহঘটিত ও লৌহেতর ধাতু, কাঠ-চেরাই, নির্মাণ ও অন্য কতকগুলি শিল্পে। প্রযুক্তি ও উৎপাদন পৰিসম্পদ সম্ববহারের কার্যকরতা ও শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর প্রচেষ্টা, দুটোই ক্রমবর্ধমান মাত্রায় নির্ভর করে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও কাজ করার ক্ষমতার উপরে।

আজ, সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্ধিত অর্থনৈতিক ক্ষমতা কাজের অবস্থায় বড় ধরনের উন্নতির বৈষয়িক পদবর্শতগুলি নিশ্চিত করে। শ্রমিকদের মূল পোশাক আবৃত করার আঙুরাখা 'ওভারঅল', রক্ষণমূলক পাদুকা ও অন্যান্য রক্ষণমূলক সরঞ্জাম বোগানোর উদ্দেশ্যে প্রতি বছর প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হয়। যদি গবেষণা ও উন্নয়নের স্তরেই এবং নতুন উদ্যোগ ডিজাইন করার সময়ে বা পূর্বনো উদ্যোগগুলিকে পুনঃসজ্জিত বা আধুনিক করার সময়েই স্বাস্থ্য সংক্রান্ত, শারীরবৃত্তীয়, মনস্তাত্ত্বিক ও নান্দনিক বিষয়গুলি গণ্য করা হয়, তাহলে কাজের অবস্থা উন্নত করার প্রচেষ্টায় সাফল্য সূনিশ্চিত হয়।

সমাজতন্ত্রে বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব শুধু মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্যেই নয়, কৃষি ও শিল্প শ্রমের মধ্যেও প্রভেদ দূরীকরণে সহায়ক হয়।

সমাজতন্ত্রে বিকাশমান বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব গ্রামাঞ্চলগুলিতে শ্রমের অন্তর্বস্তুতেও গভীর পরিবর্তন ঘটায়। কৃষি শ্রম শিল্প শ্রমের নির্দিষ্ট কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে থাকায় নতুন নতুন কাজ ও

বৃন্তি দেখা দেয়, আর পদ্রনো চিরাচরিত কাজগদুলিতে যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আরও বেশি ব্যবহৃত হতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ফসল তোলার পর খাদ্যশস্য প্রক্রিয়ণের শিল্প পদ্ধতিগদুলির প্রবর্তন শস্য-শুদ্ধকরণ যন্ত্র অপারেটরের কাজটি সৃষ্টি করেছে। জমি পদ্রনরুদ্ধার ও সেচ ব্যবস্থা নির্মাণে যন্ত্রপাতির ব্যাপক প্রয়োগ — যেখানে ক্রমেই বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয় অটোমেশনকে — উন্নয়নকারীর কাজকে এক শিল্পগত কাজে পরিণত করেছে। শ্রমের যন্ত্রীকরণ ও অটোমেশন আধুনিক রয়লার মদ্রগি তৈরির কলগদুলিতে বিরাট পরিসর লাভ করেছে। যন্ত্র-চালকদের শ্রমের অন্তর্বস্তু সমৃদ্ধ হয়েছে। ট্রাক্টর ড্রাইভারের কাজকে প্রতিস্থাপিত করেছে বহুবিধ দক্ষতাবিশিষ্ট যন্ত্র-চালকের কাজ, যে যন্ত্র-চালক ট্রাক্টর, কম্বাইন হার্ভেস্টার ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্র চালাতে পারে।

গ্রামাঞ্চলগদুলিতে কাজগদুলির পরিধি শহরাঞ্চলের তুলনায় সংকীর্ণতর। সমাজতন্ত্রে কৃষি ও শিল্প শ্রমের এখনও পার্থক্য আছে শুদ্ধ ক্ষেত্রগত, কৃৎকৌশলগত-অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত দিক দিয়েই নয়, সামাজিক-অর্থনৈতিক দিক দিয়েও।

জনগণ উন্নততর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করতে থাকায় শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভেদগদুলির বিলোপ ত্বরান্বিত হয়। ১৯৭০ থেকে ১৯৮৪ সালের মধ্যে উচ্চতর বা মাধ্যমিক (সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ) শিক্ষাপ্রাপ্ত যৌথখামারিদের শতকরা হার ৩৯ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে প্রায় ৭০ শতাংশ।

দক্ষ শহুরে ও গ্রামীণ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় শহুরে ও গ্রামীণ বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ স্কুলগুলিতে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অবৈতনিক সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা ও বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ দেয়।

গ্রামীণ বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ স্কুলগুলি থেকে উত্তীর্ণ হয় আহাৰ্যদান যন্ত্র ও দক্ষদোহন যন্ত্র-চালক; ট্রাক্টর ড্রাইভার, কম্বাইন চালক, যন্ত্রকুশলী, যন্ত্র পরিচর্যাকারী ও মোটরগাড়ি ড্রাইভার। কর্মরত অবস্থায় দক্ষতার উন্নতিসাধনও করা হয় বিরাট পরিসরে। কৃষির জন্য উচ্চতর ও মাধ্যমিক বিশেষীকৃত শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণদানের অগ্রাধিকারমূলক হার শিল্প ও কৃষি শ্রমের মধ্যে সামাজিক-অর্থনৈতিক পার্থক্য অতিক্রম করার ক্ষেত্রে প্রগতির এক গুরুত্বপূর্ণ সূচক।

আগেই বলা হয়েছে, বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব কৃষি শ্রমিকদের শ্রমের অন্তর্ভুক্তই শৃঙ্খল বদলায় না, গ্রামীণ জীবনের অবস্থাও বদলায়। সমাজতন্ত্রে, গ্রামাঞ্চলে সামাজিক অবকাঠামোর বিকাশে পুঁজি বিনিয়োগ নিয়ত বাড়ছে। এটা গ্রাম থেকে শহরে শ্রম-বাহিনীর অভিপ্রয়াণ কমায়ে।

গ্রামাঞ্চলগুলিতে নির্মাণ প্রকল্পগুলি চালু করার সময়ে তার সঙ্গে সঙ্গে বাসগৃহ, সাংস্কৃতিক ও কৃত্যক সংক্রান্ত বন্দোবস্তগুলি (একটি বিপণন কেন্দ্র, একটি ভোক্তা কৃত্যক কেন্দ্র, একটি ক্যান্টিন ইত্যাদি) নির্মাণের ব্যবস্থাও সাধারণত করা হয়।

গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসাগত সেবা উন্নত করার জন্য অনেক কিছুর করা হয়। বড় বড় সমস্ত গ্রামীণ বসতি

অঞ্চলে চিকিৎসা কেন্দ্র আছে। প্রতিটি আঞ্চলিক প্রশাসনিক কেন্দ্রে আছে হাসপাতাল, বহির্বিভাগীয় রোগীদের জন্য বহু চলমান ক্লিনিক, ডিসপেন্সারী ও একটি অ্যাম্বুলেন্স কৃত্যক। গ্রামীণ সমস্ত অধিবাসী জরুরি চিকিৎসাগত সাহায্য পেতে পারে। বলতে গেলে সমস্ত গ্রামবাসীই নিজেদের এলাকায় চিকিৎসাগত সাহায্য ও চিকিৎসা পেতে পারে।

সাংস্কৃতিক বন্দোবস্তগুলি নির্মাণ গ্রামের সামাজিক রূপান্তরসাধনে হ্রমবর্ধমানরূপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রত্যেক দুইজন নাগরিকের মধ্যে একজন গ্রন্থাগার থেকে বই পড়তে নেয়। গ্রামাঞ্চলগুলিতে জনগণ সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকার গ্রাহক হয়, গণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়াশোনা করে এবং সৌখিন কলাসমিতি ও গোষ্ঠীগুলিতে যোগ দেয়।

গ্রামীণ জনসমষ্টিতে সাংস্কৃতিক সেবা দান করা হয় কেন্দ্রীকৃত গ্রন্থাগার, ক্লাব ও ক্রীড়া কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে, যেগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় স্থানীয় সোভিয়েত, ক্লাব, খামার ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলির তহবিল ও প্রচেষ্টা একত্র করে।

শ্রমের দিক দিয়ে সমাজতন্ত্রের সফলগুলি সদ্যবহার করা হয় শুধু জাতীয় পরিসরেই নয়, আন্তর্জাতিক পরিসরেও। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংবদ্ধতা শ্রমের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতিককে ত্বরান্বিত করার ব্যাপক সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে। বড় বড় প্রকল্পের সম্মিলিত রূপায়ণ

সেগুলির সাফল্যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির যৌথ স্বার্থকে বাড়িয়ে তোলে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংবদ্ধতা সমগ্র বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিসরে বিজ্ঞান ও উৎপাদনের ঐক্যকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নতুনের জন্য নিরন্তর সন্ধানকে তা উদ্দীপিত করে, সৃষ্টিশীল উদ্যোগ গড়ে তোলে এবং উৎপাদনী ও অ-উৎপাদনী উভয় ক্ষেত্রেই নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে।

আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রম-বিভাজন কর্মবিকশিত হয় এক পরিকল্পিত ভিত্তিতে। পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা, বিশেষত জাতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ পরিকল্পনাগুলির সমন্বয় সাধন, আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শ্রম-বিভাজনকে লালিত ও পুষ্ট করে।

আন্তর্জাতিক বিশেষীকরণ হল আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাজনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি রূপ। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ইঞ্জিনিয়ারদের ডিজাইন করা ত ম ম-৩৬০ তাঁতের দৃষ্টান্ত দিয়ে এটা দেখানো যায়। মাকদুতে সূতো পরানোর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রব্যবস্থাটি জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে তৈরি, আর প্রধান অংশটি, বস্ত্র তৈরি করার অংশটি উৎপাদিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নে। সোভিয়েত ডিজাইনটি প্রায় সমস্ত শিল্পোন্নত দেশেই ৫২টি পেটেন্টপ্রাপ্ত। এই তাঁত তাঁতীর শ্রমের অন্তর্বস্তু পরিবর্তিত করে তাকে আরও উৎপাদনশীল করেছে। সূতো ছেঁড়ার ঘটনা অন্যান্য মডেলের তুলনায় অনেক

কম ঘটে; তাঁতটির সমস্ত অংশ সহজেই সার্ভিস করা যায়। তাঁতটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সর্বিধা আছে: কর্মশালাগদুলিতে কোলাহলের স্তরকে তা স্বাস্থ্যসম্মত মানের পর্যায়ে নামিয়ে আনে। (তাঁতযন্ত্রগুলি যে কোলাহল সৃষ্টি করে তা একটা ধাবমান ট্রেনের সৃষ্টি কোলাহলের সঙ্গে তুলনীয় ও তাঁতের কর্মশালাগদুলিতে আগে কোলাহল কমানোর জন্য যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা হত তাতে সব সময়ে বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যেত না)।

২০০০ সালে সমাপিত কালপর্বের জন্য পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদের সদস্য-দেশগুলিতে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতির জন্য সংবদ্ধ কর্মসূচির মতো সংবদ্ধ কর্মসূচিগুলি বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুফলগুলির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলগুলিকে মেলানোর ক্ষেত্রে সহায়ক। একটা দীর্ঘ কালপর্ব ধরে এক সুসমন্বিত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত কর্মনীতি চালানোকে সেগুলি সম্ভব করে তোলে।

পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা পরিষদভুক্ত দেশগুলির মধ্যে বিশেষীকরণ ও সহযোগিতার বিস্তৃতি তাদের অর্থনৈতিক বিকাশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, মূলগতভাবে নতুন যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তির বিকাশসাধন ও প্রবর্তন ত্বরান্বিত করা, সাধারণভাবে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ও বিশেষভাবে প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক দেশের উৎপাদনী, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত ক্ষমতা-সম্ভাবনা আরও ভালোভাবে ব্যবহার

করার এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা বাড়িয়ে তুলবে।

নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি প্রবর্তন সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, উপরোক্ত তাঁতটি একটি মাকুহীন তাঁত থেকে দ্বিগুণ বেশি উৎপাদনশীল এবং অন্যান্য মাকু-তাঁত থেকে বহুগুণ বেশি উৎপাদনশীল। একক-পর্যায়ের একটি তাঁতের পক্ষে এই রকম উৎপাদনশীলতা অর্জন করতে হলে, মাকুটিকে ঘুরতে হত ঘণ্টায় ২৪০ কিলোমিটার দ্রুতিতে, যা অসম্ভব। নতুন তাঁতে মাকুগুলির দ্রুতি ঘণ্টায় মাত্র ৪ কিলোমিটার।

জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে একটি সূতিবস্ত্র কারখানার এক কর্মশালায় বসানো ৪৮টি মাকুবিশিষ্ট তাঁতগুলি চালাত চার জন তাঁতী। এই কর্মশালা বছরে ২,৫০,০০০ বর্গমিটার বস্ত্র উৎপাদন করত। সেই একই কর্মশালায় পুনঃসরঞ্জামযুক্ত করার পর বসানো আঠারোটি ত ম ম-৩৬০ তাঁতবস্ত্র চালায় মাত্র দুই জন তাঁতী, তারা প্রতি বছর ১০ লক্ষ বর্গমিটার বস্ত্র উৎপাদন করে। তাদের শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি স্পষ্টগোচর: পূর্বনো তাঁতগুলি দিয়ে প্রত্যেক তাঁতী যেখানে উৎপন্ন করত ৫২, ৫০০ বর্গমিটার বস্ত্র, সেখানে নতুন তাঁতগুলি দিয়ে প্রত্যেক তাঁতী উৎপন্ন করে ৫,০০,০০০ বর্গমিটার বস্ত্র, অর্থাৎ আগেকার চেয়ে ১০ গুণ বেশি।

এমন একটা সময় আসবে যখন ত ম ম-৩৬০ প্রতিস্থাপিত হবে আরেকটি, আরও উৎপাদনশীল তাঁত

বা স্বয়ংকৃত লাইন দিয়ে যেটি চালাবে ও পরিচর্যা করবে একটি রোবট।

মূলগতভাবে নতুন, আরও কার্যকর প্রযুক্তিগত প্রণালীসমূহে ও চলতি পর্যায়ের যন্ত্রপাতিতে উত্তরণ উচ্চতর শ্রমের উৎপাদনশীলতার একটি পূর্বশর্ত। বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব চলতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে, যন্ত্রপাতি পুনর্নবায়িত হয় সংক্ষিপ্ততর কাল-ব্যবধানে। সেই জন্যই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে মেশিন-টুল নির্মাণ, কম্পিউটার তৈরি, যন্ত্রপাতি তৈরি, বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম তৈরির ত্বরান্বিত বিকাশের দিকে — যে শিল্পগগুলি বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি বিপ্লবের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে সেগুলির দিকে প্রচুর মনোযোগ দেওয়া হয়।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব উৎপাদের একক পিছু জ্বালানি, কাঁচামাল ও অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার হ্রাস করার উপায় যোগায়। প্রতি বছর, সামাজিক উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত থাকে বিপুল পরিমাণ বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত সহায়-সম্পদ, যার সদ্যবহার উৎপাদনের কার্যকরতা বাড়ানোর একটা পূর্বশর্ত। সোভিয়েত মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ধাতুবিদ্যা, নির্মাণ, খনিকর্ম ও কৃষিতে এবং অ-উৎপাদনী ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের প্রতি একক পিছু কাঁচামাল, শক্তি ও অন্যান্য সহায়-সম্পদ ব্যবহারের হার কমানোর এক নিহিত সম্ভাবনা রয়েছে।

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতির স্বরণ ও শ্রমের

উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি উৎপাদের গুণগত মানের আমূল উন্নয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। চলতি কৃৎকৌশলগত, অর্থনৈতিক ও নান্দনিক মান রক্ষা করতে অসমর্থ ঘৃটিপূর্ণ বা নিম্ন মানের সামগ্রী (ভাষান্তরে, ব্যবহারের দিক দিয়ে নির্ধারিত মানের নিচে) তৈরি করা বৈষয়িক সম্পদ তহরূপ ও শ্রম অপচয় করার সমতুল। গুণের সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে পরিমাণের সমস্যাও সমাধান করা যায়। একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োজন পূর্ণতরভাবে পূরণ করার এটাই একমাত্র নিশ্চিত পথ।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব শৃদ্ধ অতীত ও বাস্তবায়িত শ্রমের কার্যকরতাকেই বাড়ায় না, জীবন্ত শ্রমের কার্যকরতাও বাড়ায়। জীবন্ত শ্রমের ব্যয় যত কম, শ্রমের উৎপাদনশীলতা তত বেশি হয়। ত ম ম- ৩৬০ তাঁতের দৃষ্টান্তটা আবার নেওয়া যাক। দুজন তাঁতীর চালানো এই ধরনের আঠারোটি তাঁত প্রতি বছর দশ লক্ষ বর্গমিটার বস্ত্র উৎপন্ন করেছিল। নতুন তাঁতগুঁলি বসানোর আগে ৪৮টি মাকু-তাঁত চালাত চারজন তাঁতী। জীবন্ত শ্রমের মিতব্যয়িতা এখানে স্বপ্রকাশ।

উৎপাদনের বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তিগত নবায়ন ও শ্রমের উৎপাদনশীলতার সর্বোচ্চ বিশ্ব স্তর অর্জনের নিহিতার্থ হল, প্রথমত ও প্রধানত, সমাজের অভ্যন্তরে অর্থনৈতিক সম্পর্কের উন্নয়ন। শ্রমের ক্ষেত্রে এবং জনগণের জীবনের বৈষয়িক ও আর্থিক অবস্থার ক্ষেত্রে গভীর পরিবর্তনও এর অন্তর্নিহিত। রাজনৈতিক ও সামাজিক

প্রতিষ্ঠানগুলির গোটা ব্যবস্থাতন্ত্রকে আরও প্রাণবন্ত করা এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও স্বশাসন আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়াও এর অন্তর্নিহিত।

সমাজতন্ত্রের বিকাশ অনেকাংশে নির্ভর করবে অর্থনীতির গুণগত অগ্রগতির উপরে ও অর্থনীতির নিবিড় বৃদ্ধিসাধনে সাফল্যের উপরে। উৎপাদনের নিবিড়করণের লক্ষ্য হল বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতিককে স্বরান্বিত করা এবং বৈষয়িক, শ্রম, আর্থিক ও প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণতর ব্যবহার নিশ্চিত করা। বিজ্ঞান-নিবিড় শিল্পগুলির (যেমন ইলেকট্রনিকস, সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি তৈরি, রোবটিকস) এবং উৎপাদনের প্রতি একক পিছদ শক্তি ও উপকরণের ব্যবহার হ্রাস নিশ্চিত করে এমন শিল্পগুলির (উচ্চ-গুণগত ধাতুবিদ্যা, আধুনিক প্লাস্টিক উপকরণ ও রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন) অগ্রাধিকারমূলক বিকাশও এর সঙ্গে জড়িত। উচ্চ-উৎপাদনক্ষম যে-সমস্ত সরঞ্জাম ও যন্ত্রব্যবস্থা জীবন্ত শ্রমের অনেকখানি মিতব্যয়িতা সম্ভব করে তোলে সেগুলি তৈরি করার উপরেও অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

নিবিড়করণের দুটি দিক আছে — অর্থনৈতিক ও সামাজিক। নিবিড়করণের প্রধান অর্থনৈতিক ফল হল বিনিয়োগের একক পিছদ বর্ধিত উৎপাদ। অধিকন্তু, উৎপাদনশীল ও নিজস্ব, ব্যক্তিগত ভোগের মধ্যে বিরোধ কাটিয়ে উঠতে নিবিড়করণ সাহায্য করে, কারণ উৎপাদনের উপায়ের জন্য বৈষয়িক ব্যয় হ্রাস করে তা সহায়-সম্পদকে লভ্য করে তোলে নিজস্ব, ব্যক্তিগত ভোগের জন্য।

নিবিড়করণের সামাজিক দিকটি প্রকাশ পায় নির্দিষ্ট কাজের শ্রমিক হিশেবে মানুষ আর উৎপাদনের উপায়ের সহ-মালিক হিশেবে মানুষ, এই দুইয়ের মধ্যকার বিরোধ নিশ্চিহ্নকরণের মধ্যে, পরিকল্পিত ভিত্তিতে শ্রমের সামাজিকীকরণের মধ্যে, শ্রম অনুযায়ী বণ্টনের মধ্যে এবং প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় শ্রমজীবী জনগণের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহিতার মধ্যে।

উৎপাদনের নিবিড়করণের সঙ্গে থাকে কাজগুলির আধুনিকীকরণ: অচল সেকেন্ডে কাজগুলি বিলোপ করা হয়, কার্যিক একঘেয়ে নিম্ন-সম্মানজনক শ্রমে জড়িত লোকেদের সংখ্যা কমানো হয় এবং প্রধানত মানসিক শ্রম ব্যয় করা দরকার এমন সব লোকের সংখ্যা বাড়ে।

উৎপাদনের নিবিড়করণ ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক শ্রম নিয়মানুবর্তিতা সুদৃঢ়করণ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজতান্ত্রিক শ্রম নিয়মানুবর্তিতা নির্ভর করে, সর্বোপরি, উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা সম্বন্ধে মনোভাব পরিবর্তনের উপরে, নিজের জন্য করা কাজ আর সমাজের উপকারের জন্য করা কাজ — এই দুইভাগে অপেক্ষাকৃত কম প্রকট শ্রম-বিভাজনের উপরে এবং ‘আমার’ ও ‘আমাদের’ স্বার্থের মধ্যে প্রভেদ ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হওয়ার উপরে। শ্রম নিয়মানুবর্তিতা উৎপাদনী নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে এবং মূল উৎপাদনী পরিসম্পদ ও সমাজের শ্রম ও আর্থিক ক্ষমতা সম্ভাবনার কার্যকর ব্যবহারের সঙ্গে জড়িত।

সমাজতান্ত্রিক শ্রম নিয়মানুবর্তিতার নিহিতার্থ শূদ্ধ আভ্যন্তরিক শ্রম বিষয়ক নিয়মকানুন কঠোরভাবে মেনে চলাই নয়, বরং কাজের প্রতি স্বেচ্ছিক, সৃষ্টিশীল মনোভাব, সেরা কাজ করার প্রয়াস এবং শ্রম-সময়ের সবচেয়ে উৎপাদনশীল ব্যবহারের জন্য প্রয়াস।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে, বিশেষ প্রচেষ্টা চালানো হয় শৈথিল্য, কাজে অনুপস্থিত থাকা, মদ্যাসক্তি ও সমাজতান্ত্রিক জীবনযাত্রা প্রণালীর পরিপন্থী সব কিছুর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য।

শ্রমের সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের সুফলগুলির সঙ্গে বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লবের কৃতিত্বগুলির সংযোগ পৃথিবীতে সামাজিক শ্রমের উৎপাদনশীলতার সর্বোচ্চ হার অর্জনের প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টি করে।

সামাজিক শ্রমের কার্যকরতা বাড়ানো যায় শূদ্ধ নতুন যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি প্রবর্তনের মধ্য দিয়েই নয়, জনগণকে নিজেদের কাজের প্রতি এক সৃষ্টিশীল মনোভাব গ্রহণে উৎসাহিত করার মধ্য দিয়েও। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতি ত্বরান্বিত করার প্রয়াসের নিহিতার্থ হল সৃষ্টিশীল শ্রমকে আরও বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া। এক সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ায় শ্রমের রূপান্তর জনগণের কর্মসামর্থ্যের বিকাশে একটা বড় ভূমিকা পালন করে। সৃষ্টিশীল শ্রমের মধ্য দিয়েই অন্যান্য অর্থনৈতিক নিয়মের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করে কমিউনিজমের অন্তর্নিহিত নীতিটি — ‘প্রত্যেকের কাছ থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী’। শ্রমের সৃষ্টিশীল চরিত্র

বৃদ্ধি, এক দিকে উৎপাদনের উপায়ের ব্যাপারে জনগণের সমানতা এবং অন্য দিকে, শ্রমের সামাজিক নান্যধর্মিতা এই দুইয়ের মধ্যকার বিরোধ মেটায়। (এই বিরোধ প্রকাশ পায় প্রধানত সৃষ্টিশীল শ্রম ও প্রধানত অ-সৃষ্টিশীল শ্রমে, সম্মানজনক ও নিম্ন-সম্মানজনক শ্রমে শ্রম-বিভাজনের মধ্যে)।

শ্রমের সৃষ্টিশীল চরিত্র বলতে এটাই বোঝায় যে শ্রম-প্রক্রিয়ায় লোকেদের মধ্যে সম্পর্ক এমন, যাতে শ্রমিকরা তাদের শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যকে সমাহৃত ও যথাসম্ভব শ্রেষ্ঠভাবে ব্যবহার করতে উৎসাহিত হয়, সামাজিক শ্রমের অংশ হিসেবে নিজেদের শ্রমের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে, নতুনকে গ্রহণ করায় সমর্থ হতে, দ্রুত নতুন নতুন কর্তব্যকর্মের মোকাবিলা করার দায়িত্ববোধ ও সামর্থ্য দেখাতে এবং স্বতঃস্ফূর্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমর্থ হতে উৎসাহিত হয়। এরকম হলে, যে কোনো ধরনের কাজই একটা সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ায় পরিণত হতে পারে।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব মূলগতভাবে এমন সব প্রযুক্তির জন্ম দিয়েছে, যেগুলি উৎপাদনের ব্যাপারে শ্রমিকদের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিয়েছে, চিরাচরিত যন্ত্র ব্যবস্থা থেকে স্বয়ংকৃত যন্ত্রপাতিতে উত্তরণ সূচিত হয়েছে। স্বয়ংকৃত উৎপাদন ব্যবস্থা, নমনীয় প্রযুক্তি, রোবট আর কম্পিউটার লোককে একঘেয়ে, অ-সৃষ্টিশীল উৎপাদনী ক্রিয়া সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয়তা থেকে মুক্তি দেয়। শ্রমিকরা বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল প্রয়াসে জড়িত হয় ক্রমেই

বেশি করে। আলাদা এক একটি ক্রিয়া সম্পন্ন করে এমন শ্রমিকরা প্রতিস্থাপিত হয় সুশিক্ষিত শ্রমিকদের দ্বারা, যারা আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার মূলনীতিগুলি সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এবং নতুন নতুন দক্ষতা তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করতে ও নতুন স্থাপিত যন্ত্রপাতি বা প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করার সময়ে সেগুলি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম। বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব চলার সময়ে এই গুণগুলি অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

মানসিক ও কার্যিক শ্রমের মধ্যকার বৈপরীত্য দূর করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্র সৃষ্টিশীল ও অ-সৃষ্টিশীল শ্রমের মধ্যকার প্রভেদও দূর করে। বিভিন্ন কাজের সঙ্গে জড়িত সৃষ্টিশীল ক্রিয়াগুলির শতকরা হার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সমাজতন্ত্র কঠোর শ্রমসাধ্য, নিম্ন-সম্মানজনক বা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কাজগুলি তৎক্ষণাৎ নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। জনগণের কাজে সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভেদ এখনও কাটিয়ে ওঠা যায় নি। সৃষ্টিশীল শ্রম ও অ-সৃষ্টিশীল শ্রমের মধ্যে সামাজিক-অর্থনৈতিক পার্থক্যগুলি বিলুপ্ত হবে একমাত্র তখনই, যখন কমিউনিজম সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে।

সমাজতন্ত্রে, শ্রমের সৃষ্টিশীল অন্তর্ভুক্তির বিকাশসাধন হল মানুষের মধ্যে কাজ করার চাহিদা লালিত করার অন্যতম শর্ত। কমিউনিজমে, এই চাহিদা বিকাশলাভ করে পরিণত হবে মানুষের মূখ্য মৌল চাহিদায়।

নতুন প্রেক্ষিতে মানব ব্যক্তিত্বের বিকাশও অধিকতর গুরুত্ব অর্জন করে। নিজের কাজের প্রতি এক

সৃষ্টিশীল মনোভাব গ্রহণ করতে সক্ষম হতে হলে, এক
 সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব হিশেবে পরিপক্বতা লাভ করতে হয়।
 এক সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের লক্ষণ হল অসামান্য মানসিক
 সামর্থ্য, পরীক্ষা-নিরীক্ষার ও নতুন অভিজ্ঞতালাভের
 প্রয়াস। এরূপ ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য হল নান্দনিক
 স্দবেদিতা, নমনীয়তা এবং চিন্তায় ও কর্মে স্বাতন্ত্র্য,
 মূখ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করার
 সামর্থ্য, যে কোনো চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার প্রস্তুতাবস্থা এবং
 ভাবাবেগগত সংবেদনশীলতা। বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি
 বিপ্লব মানুষের মধ্যে যুক্তি-উপাদানটি সংহত করেছে
 এবং তাদের মনস্তত্ত্বকে আরও স্থিতিশীল করেছে। সেই
 সঙ্গে তার নেতিবাচক ফল-প্রভাবও দেখা দিয়েছে:
 শারীরিক চাপ যেমন হ্রাস পেয়েছে তেমন মানসিক চাপ
 বেড়েছে লক্ষণীয়ভাবে; বহু লোকের সঙ্গে উপর-উপর
 যোগাযোগ প্রাধান্যলাভ করেছে স্থিতিশীল, স্থায়ী
 সংযোগের উপরে, যে সংযোগ ভাবের আদান-প্রদানে
 ভাবাবেগগত ও স্নায়বিক চাপ থেকে মানুষকে প্রশান্তি
 দেয়; জ্ঞানের বিভিন্ন এলাকায় লোকের বিশেষীকরণের
 ক্ষেত্রগুলি সংকীর্ণ হয়েছে ইত্যাদি। এই সমস্ত
 নেতিবাচক ফল-প্রভাব কাটিয়ে ওঠার বাসনার
 বহিঃপ্রকাশ ঘটে আনুষ্ঠানিকতাবর্জিত গোষ্ঠীগগুলির
 ভিতরে আরও সক্রিয় সম্পর্ক রক্ষা করার বাসনার মধ্যে
 এবং খেলাধুলো, ভ্রমণ, দর্শনীয় স্থান দেখা, পর্যটনের
 মতো আগ্রহ বিকশিত করার বাসনার মধ্যে। মানুষের
 চাহিদাগুলি হয়ে উঠেছে আরও সূক্ষ্ম ও জটিল।
 নিজেকে এক সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব হিশেবে পুনরুৎপন্ন

করার জন্য যথোপযুক্ত বিশ্রাম, অবসরবিনোদন ও অবকাশ কাটানোর ব্যবস্থা ও সুযোগ পাওয়া দরকার।

সমাজতন্ত্রে শ্রম যে আরও বেশি সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠে, তা দেখা যায় উদ্ভাবক ও নবোদ্ভাবকদের আন্দোলনে শ্রমিকদের ক্রমবর্ধমানরূপে জড়িত হওয়া থেকে।

শ্রমের প্রতি সৃষ্টিশীল মনোভাব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নৈতিক ও বৈষয়িক প্রণোদনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ধরনের প্রণোদনা নির্ধারণের সময়ে, সৃষ্টিশীল কাজের সুনির্দিষ্ট চরিত্রটি গণ্য করা উচিত। সৃষ্টিশীল শ্রমের বিষয়গত, নমনীয় ও যথাযথ মূল্যায়ন নিশ্চিত করে মান স্থির করাও গুরুত্বপূর্ণ। শ্রম আরও বেশি সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এবং লোকে আরও অর্থপূর্ণ কাজে অধিকতর আগ্রহ দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে, বুদ্ধিবৃত্তিগত প্রণোদনাগুলি অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে।

সৃষ্টিশীল ও অ-সৃষ্টিশীল শ্রমের মধ্যে সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভেদগুলি কাটিয়ে ওঠা কাজ-অভিমুখী সমাজতান্ত্রিক জীবনযাত্রা প্রণালীকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

শ্রমের ক্রমবর্ধমানরূপে সৃষ্টিশীল চরিত্র সমাজতান্ত্রিক শ্রম ক্রমবিকাশিত হয়ে কমিউনিস্ট শ্রমে পরিণত হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্ব ভূমিকা পালন করবে।

উপসংহার

সমাজতান্ত্রিক শ্রমের কমিউনিস্ট শ্রমে রূপান্তর

সমাজতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদিকা শক্তি সমূহের বিকাশ, বৈষয়িক ও আর্থিক সফলতাদের প্রাচুর্য, জনগণের প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলি বণ্টন করার সন্ধ্যোগ, শ্রমে সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভেদগুলি নিশ্চিহ্নকরণ, অধিকতর কৰ্তব্যবোধ লালিত করার প্রচেষ্টা সমাজতান্ত্রিক শ্রমের কমিউনিস্ট শ্রমে রূপান্তরের পূৰ্বশর্তগুলি সৃষ্টি করে। কমিউনিজমে শ্রম কী কী বৈশিষ্ট্য অর্জন করে?

কমিউনিস্ট শ্রম হল সমাজের উপকারের জন্য বিনা পারিশ্রমিকে করা শ্রম, যে শ্রম সম্পন্ন করা হয় একটা নির্দিষ্ট কৰ্তব্য হিশেবে নয়, নির্দিষ্ট কতকগুলি সামগ্রী পাওয়ার অধিকার অর্জনের উদ্দেশ্যে নয়, পূৰ্বে স্থিরীকৃত ও আইনগত

নির্ধারিত কোটা অনুযায়ী নয়, যে শ্রম স্বতঃপ্রণোদিত শ্রম, কোটা নির্বিশেষে শ্রম, যে শ্রম করা হয় পুরস্কারের প্রত্যাশা ছাড়া, একটা শর্ত হিশেবে পুরস্কার ছাড়া, যে শ্রম করা হয় কেননা তা অভিন্ন মঙ্গলের জন্য কাজ করার এক অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, যে শ্রম একটা সুস্থ জীবদেহের চাহিদা হিশেবে শ্রম।

কমিউনিস্ট শ্রমের দিকে অগ্রগতির জন্য জাতীয় অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী কাঠামোগত সব পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। এই সমস্ত রূপান্তরের সঙ্গে জড়িত থাকবে মূলগতভাবে নতুন, সত্যকার বৈপ্লবিক প্রযুক্তিগত সমাধান, যা শ্রমের উৎপাদনশীলতায় বহুগুণ বৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।

এর জন্য দরকার যন্ত্রবাবস্থা থেকে স্বয়ংকৃত উৎপাদন বাবস্থায় উত্তরণ। শেষোক্তটি তৎসহ বিজ্ঞান-নিবিড় প্রযুক্তি ও সাজসরঞ্জাম, কমিউনিজমের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি হিশেবে কাজ করবে।

কমিউনিজমে, শ্রম পরিণত হবে মানুষের সর্বোচ্চ নৈতিক মূল্যে এবং মুখ্য, মৌল চাহিদায়। প্রধানত কায়িক ও প্রধানত মানসিক শ্রমের মধ্যে, শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে প্রভেদগুলি বিলীন হয়ে যাবে এবং সমস্ত কাজ হয়ে উঠবে সৃষ্টিশীল ও চিন্তাকর্ষক।

কমিউনিজমে, শ্রমের অন্তর্ভুক্ত ও চরিত্রে গভীর সব পরিবর্তন ঘটবে। এক ধরনের সামাজিক শ্রম-বিভাজনের সঙ্গে শ্রমিকের সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকা, তথা মানুষের বৃত্তিগত সীমাবদ্ধতাগুলি হবে অতীতের ব্যাপার। সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিগত প্রশিক্ষণে গুরুগত পরিবর্তন

ঘটবে। ত্বরান্বিত বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতির প্রয়োজনজনিত জনগণের জ্ঞানের সমৃদ্ধি ও সমন্বয়যোগ্য বৃদ্ধি সমাজের প্রধান উৎপাদিকা শক্তি হিসেবে মানুষের বিকাশের ক্ষেত্রে এক মূখ্য ভূমিকা পালন করবে।

কাজের প্রতি কমিউনিস্ট মনোভাবের বিকাশের সঙ্গে অন্তর্নিহিত থাকবে জনগণের মধ্যে মূলগতভাবে নতুন অর্থনৈতিক সম্পর্কে ক্রমান্বিত উত্তরণ, যে সম্পর্কে উদ্ভূত হয় শ্রমে, এবং বৈষয়িক ও আত্মিক মূল্য সৃষ্টিতে তাদের জড়িত থাকার মধ্য দিয়ে। কাজ সম্পর্কে লোকের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়ন, সামাজিক উৎপাদনে তাদের অংশগ্রহণের প্রতি মনোভাব এবং তাদের দায়িত্ববোধ ও আত্ম-নিয়মানুবর্তিতা বিরাটভাবে পরিবর্তিত হবে। তাদের কাজকে তারা গণ্য করবে তাদের নিজেদের, ব্যক্তিগত ব্যাপার হিসেবে নয়, বরং সামাজিক প্রাসঙ্গিকতার একটি ব্যাপার হিসেবে, সমস্ত সামাজিক শ্রমের এক গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে। তারা চালিত হবে এই দৃঢ় প্রত্যয় দিয়ে যে তা শ্রম, শ্রম ছাড়া আর কিছু নয়, তা ক্রমবর্ধমান সামাজিক সম্পদের এবং প্রত্যেকের ও সকলের সুখ-সমৃদ্ধির উৎস, এবং নিজের পছন্দমতো বেছে নেওয়া ক্ষেত্রে সুবিবেকী কাজ প্রত্যেক সক্ষমদেহ নাগরিকের পক্ষে সম্মানের বিষয়।

কমিউনিজমে উত্তরণ ঘটলে শ্রম সম্পর্কে জনগণের সক্রিয় ও সৃষ্টিশীল দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হবে, নবোদ্ভাবনা, উদ্যোগ, ষোঁথ ক্রিয়া, সাধিসুদলভ

পারস্পরিক সহায়তা, যে কোনো কাজের প্রতি মর্যাদা, নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কাজের রুচি, নিজের দক্ষতা উন্নত করা, জ্ঞান বাড়ানো ও কাজে অনুকূলতম ফললাভের বাসনাও বিকশিত হবে। জনগণ ক্রমেই বেশি করে শ্রমকে গণ্য করতে থাকবে শুধু নিজের জীবিকাজানের উপায় হিশেবেই নয়, বরং ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক শর্ত হিশেবেও।

তাই শ্রমের প্রতি কমিউনিস্ট মনোভাব গড়ে তোলার অপরিহার্য শর্তগুণি হল: প্রথম, কাজের অবস্থায় বদলিয়াদি পরিবর্তন (সর্বাত্মক অটোমেশন ও শ্রমের বৈজ্ঞানিক সংগঠন, কাজের সাংস্কৃতিক মান এবং সংঘের মনোবল ও সেখানকার মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশে পরিবর্তন সমেত); দ্বিতীয়, শ্রমিকদের দক্ষতা, সাধারণ শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্তরে প্রভূত বৃদ্ধি; তৃতীয়, উৎপাদনের ব্যবস্থাপনায় ও সমাজের প্রশাসনে শ্রমজীবী জনগণের ক্রমবর্ধমান সক্রিয় অংশগ্রহণ।

শ্রমের প্রতি কমিউনিস্ট মনোভাব গড়ে তোলার জন্য কর্ম-সংঘগুণির ও সামগ্রিকভাবে সমাজের স্বার্থের সঙ্গে প্রতিটি ব্যক্তির স্বার্থ মেলানো দরকার। শ্রম ও উৎপাদনী নিয়মানুবর্তিতা সুদৃঢ় করে, কাজে অনুপস্থিতি, দায়িত্বহীনতা ও অন্যান্য ধরনের শ্রম নিয়মানুবর্তিতা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে লড়াই করেই এটা অর্জন করা যেতে পারে।

কমিউনিজমে উত্তরণে সহজাত শ্রমের চরিত্র ও অন্তর্বস্তুতে পরিবর্তন এবং কাজের প্রতি কমিউনিস্ট

মনোভাবের বিকাশ শ্রমকে ক্রমে ক্রমে পরিণত করবে জনগণের মূখ্য ও মৌল চাহিদায়। জনগণ যেখানে তাদের সামর্থ্য ও প্রতিভা সর্বাঙ্গিকভাবে বিকশিত করার সর্বপ্রকার সুযোগ পাবে, সেই কমিউনিস্ট সমাজে সমস্ত শ্রমই হবে সৃষ্টিশীল। কাজের জন্য জনগণের প্রেরণাকে তা পরিবর্তিত করবে। কাজ করার কর্তব্য প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের কাজের জন্য নিজের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। শ্রম পরিণত হবে আত্মঅভিব্যক্তির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি রূপে এবং প্রত্যেকের চরম কাজে। কাজের জন্য জনগণের চাহিদা মানুষের চাহিদার মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করবে।

অবশ্য এর মানে এই নয় যে কমিউনিজমে শ্রম এক সহজ অবসরবিনোদনে, একটা প্রমোদে বা খেলায় পরিণত হবে। সেই শ্রমের জন্য দরকার হবে নিজের শ্রমশক্তি, কর্মক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির বিপুল ব্যয়।

মানুষের মূখ্য, মৌল চাহিদায় শ্রমের রূপান্তরের ভিত্তিমূলে রয়েছে শ্রমের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তিতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন, সামাজিক-অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং জনগণের মনস্তত্ত্ব ও বিবেকে সুদূরপ্রসারী সব পরিবর্তন। কর্ম-দিবস হ্রাসীকরণ, তার সঙ্গে অবকাশ সময় বৃদ্ধি এবং কাজের ও অবকাশের সময়ের মধ্যে এক যুক্তিসহ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা কাজের এমন সব নিষর্গ ও পদ্ধতি সনাক্ত করা সম্ভব করে তুলবে যেগুলি প্রতিটি ব্যক্তির জৈবিক গতিছন্দ ও মেজাজের সঙ্গে মানানসই হবে। হাতে

আরও বেশি অবসর সময় পেয়ে লোকে তাদের সর্বাঙ্গীণ
বিকাশসাধনের অধিকতর সুযোগ পাবে।

শ্রমকে মানুষের মূখ্য, মৌল চাহিদায় রূপান্তরিত
করার জন্য, জনগণের গুণগত যোগ্যতা, দক্ষতা,
বৈজ্ঞানিক ও উৎপাদনী পদ্ধতিসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান
বাড়ানো, এবং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিগত ও আত্মিক বিকাশ
ঘটানো অত্যাৱশ্যক। সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তিগত
প্রশিক্ষণ হবে একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। মানুষের
মৌল ক্রিয়াকলাপকে তা বুদ্ধিবৃত্তিপ্রধান করবে এবং
তার সৃষ্টিশীল ক্ষমতা গড়ে তুলবে। শ্রম ও শিক্ষা
ক্রমেই আরও বেশি পরস্পরবিজড়িত, পরস্পরসম্পর্কিত
ও পরস্পরনির্ভরশীল হবে। বিজ্ঞানে শিক্ষিত জনগণ
হবে কমিউনিস্ট সমাজের প্রধান উৎপাদিকা শক্তি।

এইভাবে শ্রমকে প্রত্যেক নাগরিকের মূখ্য, মৌল
চাহিদায় পরিণত করে বিশ্ব সভ্যতার বিকাশে
কমিউনিজম অবদান রাখবে।

টীকা ও ব্যাখ্যা

অতীত শ্রম — উৎপাদনের উপায় ও ভোগের সামগ্রীতে অঙ্গীভূত শ্রম।

অদক্ষ শ্রম — যে শ্রমের জন্য বিশেষ বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ দরকার হয় না; সরল শ্রম।

অনুৎপাদনশীল শ্রম — যে শ্রম সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে অপারগ হয়; এমন এক সামাজিক রূপে ব্যয়িত শ্রম, যা সেই নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থায় সহজাত রূপটি থেকে পৃথক।

অবসর সময় — কাজের বাইরের সময়ের অংশ, যেটা শ্রমজীবী জনগণ ব্যবহার করে অবসরবিনোদন, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নত করা, সাংস্কৃতিক ও আত্মিক প্রয়োজন মেটানো ও সন্তানদের লালনপালন করার জন্য।

অর্থনৈতিক স্বার্থ — সমাজ, বিভিন্ন শ্রেণী, গোষ্ঠী বা ব্যক্তিমানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিষয়গত গতিমুখ যা নির্ধারিত হয় তাদের চাহিদা দিয়ে। সমাজগত, যৌথ ও নিজস্ব স্বার্থ থাকে।

অস্থির পুঁজি — পুঁজির যে অংশটি উদ্যোগপতি ব্যয় করে শ্রমশক্তি কেনার জন্য।

আপেক্ষিক উদ্ধৃত জনসংখ্যা — পুঁজিবাদে, পুঁজিপতিদের শ্রমশক্তির চাহিদার উপরে শ্রমজীবী জনসমষ্টির আপেক্ষিক আধিক্য।

আবশ্যকীয় শ্রম — পুঁজিবাদে যে শ্রম করার মধ্য দিয়ে শ্রমিক তার শ্রমশক্তির মূল্য পুনরুৎপন্ন করে। সমাজতন্ত্রে, সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন চলাকালে আবশ্যকীয় শ্রমে নিযুক্ত শ্রমিক সামাজিক উৎপাদের সেই অংশটির মূল্য সৃষ্টি করে, যেটি সে পায় আয়ের রূপে (মজদুরি, বোনাস, সামাজিক ভোগ তহবিল থেকে প্রাপ্ত, অথবা নগদে বা সামগ্রীতে আয়)।

উৎপাদন সম্পর্ক — বৈষয়িক সামগ্রীর উৎপাদন, বণ্টন, বিনিময় ও ভোগের প্রক্রিয়ায় মানুষের সচেতন ইচ্ছা নির্বিশেষে তাদের মধ্যে যে-সমস্ত সম্পর্ক গড়ে ওঠে তার সামগ্রিকতা। উৎপাদন সম্পর্ক হল যে কোনো উৎপাদন-প্রণালীর এক অপরিহার্য দিক। উৎপাদন সম্পর্কের চরিত্র নির্ধারিত হয় উৎপাদনের উপায়ের মালিকানার রূপ দিয়ে এবং উৎপাদন-প্রক্রিয়ায়

উৎপাদনের উপায়সমূহ কীভাবে শ্রমিকদের সংস্পর্শে আসে, তাই দিয়ে।

উৎপাদনের অটোমেশন — এমন এক মাধ্যম যন্ত্রীকৃত উৎপাদনের বিকাশ যখন নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের যে-সমস্ত ক্রিয়া আগে শ্রমিকরা সম্পন্ন করত সেগুলি সম্পন্ন করে স্বয়ংক্রিয় সাজসরঞ্জাম।

উৎপাদনের সামাজিকীকরণ — অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন উদ্যোগে উৎপাদনগত, আর্থিক, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য যোগসূত্রের বিকাশের মধ্য দিয়ে উৎপাদন-প্রক্রিয়ার একটিমাত্র প্রক্রিয়ায় পরিণত হওয়া।

উৎপাদনশীল শ্রম — উপযোগী শ্রম যা সামাজিক প্রয়োজন মেটায় এবং নির্দিষ্ট সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যসূচক রূপ ধারণ করে।

উৎপাদিকা শক্তি — উৎপাদনের উপায়সমূহ ও সেগুলিকে যারা চালু করে সেই সব মানুষের সাকল্য। উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বস্তুগত অংশ, সর্বোপরি শ্রমের উপকরণ, সমাজের বৈষয়িক ও কৃৎকৌশলগত ভিত্তি। উৎপাদনের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও শ্রমদক্ষতাসম্পন্ন শ্রমজীবী জনগণ হল প্রধান উৎপাদিকা শক্তি।

উদ্বৃত্ত-মূল্য — মজুরি শ্রমিক তার শ্রমশক্তির মূল্যের অতিরিক্ত, দাম-না-দেওয়া শ্রমে যে মূল্য সৃষ্টি করে এবং পুঁজিপতি যেটি আত্মসাৎ করে পারিশ্রমিক না দিয়ে।

উদ্ধৃত শ্রম — পুঁজিবাদে পুঁজিপতির উপযোজিত উদ্ধৃত-মূল্য সৃষ্টি করার জন্য শ্রমিকের ব্যয়িত শ্রম।

একক শ্রম-সময় — উৎপাদের একক পিছদ একজন একক পণ্য উৎপাদক যে সময় ব্যয় করে।

একচেটিয়া সংস্থা — একটি বড় ব্যক্তিমালিকানাধীন বা রাষ্ট্রায়ত্ত পুঁজিবাদী পরিমেল, একটি শিল্পে, অঞ্চলে বা জাতীয় অর্থনীতিতে প্রাধান্যশালী অবস্থানগুলির অধিকারী এবং একচেটিয়া অতি মুনাব্বা পায়।

কর্ম-দিবস — দিনের যে সময়টায় শ্রমিক তাকে নিয়োগকারী উদ্যোগে বা প্রতিষ্ঠানে কাজে নিযুক্ত থাকে।

কাজ করার অধিকার — সমাজতন্ত্রে প্রত্যেক সক্ষমদেহ ব্যক্তির জন্য নিশ্চিতপ্রদত্ত কর্মসংস্থান ও কৃত কাজের পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী পারিশ্রমিক, যা রাষ্ট্র নির্ধারিত ন্যূনতম পারিশ্রমিকের চেয়ে কম হয় না।

কাজ করার সামর্থ্য — ব্যক্তির যে ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যগুলি তার বিশেষ ধরনের শ্রমমূলক গ্রিয়াকলাপ সফলভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ীগত শর্ত।

কাজের অবস্থা — উৎপাদনের যন্ত্রীকরণ ও অটোমেশনের স্তর, আদ্রতা, তাপমাত্রা, কোলাহল, কম্পন, বায়ু দূষণ, শ্রমিকের উপরে রাসায়নিক পদার্থসমূহের ফল-প্রভাব ইত্যাদির দিক দিয়ে শ্রমের বৈশিষ্ট্য।

কাজের ট্যারিফ-নির্ণয় — একটি কাজের জটিলতা ও চরিত্র, কাজের অবস্থা, উৎপাদন-প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ও শ্রমিকের প্রয়োজনীয় দক্ষতা-সাপেক্ষে একটি কাজের জন্য নির্দিষ্ট একটা মজুরির বর্গ নির্ণয় করা।

কার্যিক শ্রম — যে শ্রমে মূল্যবান প্রয়োজন হয় শ্রমিকের শারীরিক কর্মশক্তির ব্যয়।

কারখানা — যন্ত্রপাতি ব্যবস্থা ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল এক বিরাট পরিসর শিল্পোদ্যোগ।

কৃষি শ্রম — যে শ্রমের বৈশিষ্ট্য হল শ্রম-বিভাজনের ও আন্তঃক্ষেত্রগত যোগসূত্রের অ-পর্যাপ্ত বিকাশ, যন্ত্রব্যবস্থার সীমিত প্রয়োগ, প্রাকৃতিক অবস্থা, জলবায়ু ও ঋতুর উপরে প্রচণ্ড নির্ভরশীলতা এবং কাজের ভারের সমরূপতার অভাব।

জাতি-অতিগ কর্পোরেশন — বৃহত্তম যে সব পুঁজিবাদী সংস্থা সর্বাধিক মূল্যবান করার জন্য একটি দেশের ভিতরে বা তার বাইরে পুঁজি বিনিয়োগ করে বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির নির্দিষ্ট একটি শাখার উপরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ করে। জাতি-অতিগ সংস্থাগুলির কাজকর্মের ফলে পুঁজিবাদে অন্তর্নিহিত সমস্ত বিরোধের জটিলতা বৃদ্ধি পায়, যে সব দেশে সেগুলি কারবার চালায় তাদের কাজকর্ম প্রায়শই সেখানকার জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হয়, এবং শ্রমজীবী জনগণের উপরে শোষণ বাড়ে।

জীবনযাত্রা প্রণালী — জনগণের (একটি সম্প্রদায়, শ্রেণী, সামাজিক গোষ্ঠী ও ব্যক্তিবিশেষের) মৌলিক্রিয়াকলাপের ধরন। জীবনযাত্রা প্রণালী বেষ্ঠন করে কাজ, প্রাত্যহিক জীবন, পারিবারিক জীবন, নৈতিকতা, অবসর সময় কাটানোর ধরন ইত্যাদিকে।

জীবন্ত শ্রম — বৈষয়িক সামগ্রী ও কৃত্যকসমূহ উৎপন্ন করার উদ্দেশ্যে মানুষের উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া।

দক্ষ শ্রম — যে শ্রমে বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা দরকার হয়; জটিল শ্রম।

দক্ষতার স্তর — একজন শ্রমিক যে মাত্রায় ও যে ধরনের বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ পেয়েছে এটা নির্ধারিত হয় তাই দিয়ে এবং একটা নির্দিষ্ট কাজের জন্য প্রয়োজনীয় তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক জ্ঞান তার আছে কিনা।

নিজের জন্য শ্রম — সমাজতন্ত্রে সামাজিক শ্রমের অংশ, যেটি শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টিত হয় তাদের কৃত কাজ অনুযায়ী।

নির্দিষ্ট (আংশিক) কাজের শ্রমিক — যে শ্রমিক শ্রমমূলক ক্রিয়াকলাপের এক সংকীর্ণ ক্ষেত্রে বিশেষতা অর্জন করে এবং সারা জীবন একটা নির্দিষ্ট ধরনের কাজের সঙ্গে বাঁধা থাকে।

পুঁজিবাদে মজদুরি — মজদুরি শ্রমিক পুঁজিপতিদের কাছে যে শ্রমশক্তি বিক্রি করে তার দামের আর্থিক অভিব্যক্তি।

পেশা বা বৃত্তি বেছে নেওয়ার অধিকার — সমাজের প্রয়োজনকে যথাযথভাবে গণ্য করে নিজেদের সামর্থ্য, বোঁক, প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক সমাজের সদস্যদের একটি পেশা বা কাজ বেছে নেওয়ার অধিকার।

বিমূর্ত শ্রম — পণ্য উৎপাদকদের শ্রমের ব্যয়, যা শ্রমের মূর্ত রূপ থেকে স্বতন্ত্রভাবে পরিগণিত মানবিক শ্রমশক্তির সামগ্রিক ব্যয়ের পরিচায়ক; শ্রম, যা পণ্যের মূল্য সৃষ্টি করে।

বুর্জোয়া শ্রেণী — পুঁজিবাদী সমাজে প্রাধান্যশালী শ্রেণী। বুর্জোয়া শ্রেণীই উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, মূল উপায়গুলির মালিক এবং মজদুরি শ্রম শোষণ করে।

বৃত্তি বা পেশা — প্রশিক্ষণ ও শ্রমের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জিত যথেষ্ট জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তির একটি কাজের অথবা শ্রমমূলক ক্রিয়ার ধরনের আনুষ্ঠানিক আখ্যা।

বেকারি — পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সহজাত একটা ব্যাপার, যেখানে শ্রমজীবী জনগণের একটা অংশ কাজ পেতে পারে না এবং শ্রমের সংরক্ষিত বাহিনী গঠন করে।

বৈজ্ঞানিক-প্রযুক্তি বিপ্লব — উৎপাদিকা শক্তিসমূহের বিকাশে এক গুরুগত রূপান্তর; বৈজ্ঞানিক

ও প্রযুক্তি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান উৎপাদনের সঙ্গে
ওতপ্রোতভাবে মিশে যায়।

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রগতি — যন্ত্রপাতি ও
প্রযুক্তি বিকশিত ও উন্নত করার জন্য এবং এমন সব
বৈজ্ঞানিক ও কৃৎকৌশলগত আবিষ্কার ও উদ্ভাবন
প্রবর্তনের প্রক্রিয়া, যেগুলি সামাজিক শ্রমের
উৎপাদনশীলতা বাড়ায় এবং উৎপাদনের বিভিন্ন শাখায়
উৎপাদের গুণগত মান উন্নত করে।

ব্যক্তিগত শ্রম — উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত
মালিকানাভিত্তিক ও পণ্য উৎপাদকদের পরস্পরের থেকে
বিচ্ছিন্নতাভিত্তিক শ্রম।

মজদুরি শ্রম — পুঁজিবাদী উদ্যোগগুলিতে নিযুক্ত
ব্যক্তিদের শ্রম। এই ধরনের শ্রমিকরা
ব্যবহারশাস্ত্রগতভাবে মদুস্ত-স্বাধীন, কিন্তু তাদের হাতে
কোনো উৎপাদনের উপায় নেই। মজদুরি শ্রমই সৃষ্টি
করে মূল্য ও উদ্ভূত-মূল্য।

মানসিক শ্রম — যে শ্রমে শ্রমিকের মানসিক কর্মশক্তির
ব্যয় মদুখ্যত প্রয়োজন হয়।

মদুত শ্রম — একটি পণ্যের ব্যবহার-মূল্য উৎপাদন
করার জন্য উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে ব্যবহৃত শ্রম।

ম্যানুফ্যাকচার — বিপদুল-পারিসর যন্ত্রাভিত্তিক
উৎপাদনের আগে পুঁজিবাদী শিল্পের বিকাশে একটি

পর্যায়; শ্রম-বিভাজন ও হস্তশিল্প প্রযুক্তিভিত্তিক পুঁজিবাদী উদ্যোগ।

শিক্ষা — প্রণালীবদ্ধ জ্ঞান, দক্ষতা ও কাজের অভ্যাস আয়ত্ত করার প্রক্রিয়া; কাজের জন্য প্রস্তুত হওয়ার এক আবশ্যিক শর্ত; সংস্কৃতি আত্মীকরণ ও আয়ত্তকরণের প্রধান উপায়।

শিল্পশ্রম — যন্ত্র, যন্ত্রীকৃত ও স্বয়ংকৃত শ্রম ব্যবস্থা ব্যবহারের ভিত্তিতে শ্রম।

শ্রম — বৈষয়িক ও আত্মিক সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মানদ্বয়ের উদ্দেশ্যপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ।

শ্রম নিবিড়তা — সময়ের একক পিছদ শ্রমের ব্যয়ের দ্বারা নির্ধারিত শ্রমের নিবিড়তা। উৎপাদনী ক্রিয়াগুণিল বৃদ্ধি অথবা তার দ্রুতি হ্রাসের দরদুন সময়ের একক পিছদ শ্রমশক্তি ব্যয়ের পরিবর্তনের সঙ্গে শ্রম নিবিড়তা পরিবর্তিত হয়। অন্যান্য বিষয় সমান থাকলে, অপেক্ষাকৃত কম নিবিড় শ্রমের চেয়ে বেশি নিবিড় শ্রম সময়ের একক পিছদ বেশি মূল্য সৃষ্টি করে।

শ্রম নিয়মানুবর্তিতা — কাজের যে প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা কাজের পরিমাণ ও অন্তর্বস্তু নিয়ন্ত্রণ করে, নির্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করার নিশ্চয় ও নির্ধারিত সময় স্থির করে, উৎপাদনে কাজের বিধিব্যবস্থা ও অধীনস্থতার কাঠামো নির্ণয় করে, তা কঠোরভাবে মেনে চলা। শ্রম

নিয়মানুবর্তিতা বলবৎ করা যেতে পারে অথবা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে রক্ষা করা যেতে পারে।

শ্রম-প্রক্রিয়া — মানুষের প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেশ্যে প্রকৃতির পদার্থগুলিকে রূপান্তরিত করার লক্ষ্য নিয়ে প্রকৃতির উপরে মানুষের ক্রিয়া। শ্রম-প্রক্রিয়া গঠিত হয় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে শ্রম, শ্রমের সামগ্রী ও শ্রমের উপকরণ দিয়ে।

শ্রম-বিভাজন — শ্রমমূলক ক্রিয়াকলাপের গুণগত প্রভেদন; শ্রম-বিভাজনের ফলে বিভিন্ন পেশা ও কাজের মধ্যে প্রভেদ দেখা দেয়।

শ্রমশক্তি — ব্যক্তিমানুষের কাজ করার সামর্থ্য; বৈষয়িক উৎপাদনে ব্যবহৃত ব্যক্তিমানুষের শারীরিক ও আত্মিক সামর্থ্যের সামগ্রিকতা।

শ্রমশক্তির অভ্যপ্রয়াণ — উৎপাদন কর্মের অবস্থিতিতে বা জীবনের অবস্থায় পরিবর্তন-হেতু সক্ষমদেহ জনসমষ্টির একটি দেশের অভ্যন্তরে (আভ্যন্তরিক অভ্যপ্রয়াণ) অথবা এক দেশ থেকে অন্য দেশে (আন্তর্জাতিক অভ্যপ্রয়াণ) গমনাগমন।

শ্রম-সহযোগিতা — শ্রম সংগঠিত করার একটি রূপ, যাতে এক তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যক মানুষ একটি শ্রম-প্রক্রিয়ায় অথবা পরস্পরসম্পর্কিত প্রক্রিয়াসমূহে সম্মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করে।

শ্রমের অন্তর্বস্তু — ব্যবহৃত উৎপাদনের উপায় ও

কাঁচামাল, শ্রমিকের সম্পন্ন করা কাজগুলি এবং উৎপন্ন উৎপাদটির ধরনের দিক দিয়ে শ্রমের সংজ্ঞার্থ নিরূপণ।

শ্রমের উৎপাদনশীলতা — লোকের উৎপাদনী ক্রিয়াকলাপের কার্যকরতা। শ্রমের উৎপাদনশীলতা পরিমাপ করা হয় উৎপাদের একটি একক উৎপন্ন করার জন্য ব্যয়িত সময় দিয়ে অথবা সময়ের একক পিছদ সৃষ্ট উৎপাদের পরিমাণ দিয়ে।

শ্রমের উপকরণ — প্রকৃতির উপরে ক্রিয়া করার জন্য ও প্রাকৃতিক পদার্থসমূহকে নিজের ভোগের উপযুক্ত করার জন্য মানুষ যে-সমস্ত জিনিস ব্যবহার করে।

শ্রমের চরিত্র — উৎপাদনের উপায়ের উপরে মালিকানার রূপ, সমাজে শ্রমজীবী জনগণের অবস্থান, উৎপাদনের উদ্দেশ্য, এবং একজন একক শ্রমিকের শ্রম ও সমাজের শ্রমের মধ্যে আন্তঃসংযোগের দিক দিয়ে শ্রমের বৈশিষ্ট্য।

শ্রমের দক্ষতা — নিজের উৎপাদনী কর্ম মসৃণভাবে ও পারদর্শিতার সঙ্গে সম্পন্ন করার সামর্থ্য।

শ্রমের দ্বৈতচারিত্র্য — যে শ্রম পণ্য সৃষ্টি করে তার অন্তর্বস্তুর দ্বৈততা: পণ্যটির ব্যবহার-মূল্য সৃষ্ট হয় মূল্য শ্রমের দ্বারা, এবং তার মূল্য সৃষ্ট হয় বিমূল্য শ্রমের দ্বারা।

শ্রমের পরকীকরণ — উৎপাদনের উপায়ের সঙ্গে, শ্রমের উৎপাদ ও খোদ শ্রমের সঙ্গে পরক একটা কিছুর হিশেবে,

যা তার নয় এমন একটা কিছু হিশেবে শ্রমিকের সম্পর্ক। শ্রমের পরকীকরণের মূলে রয়েছে উৎপাদনের উপায়ের উপরে ব্যক্তিগত মালিকানা।

শ্রমের বৈজ্ঞানিক সংগঠন — সমাজতন্ত্রে এক প্রস্তু সাংগঠনিক-প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত ও মনস্তাত্ত্বিক-শারীরবৃত্তীয় ব্যবস্থা, যার ভিত্তি হল বিজ্ঞানের কৃতিত্বগুলি ও প্রাণসর উৎপাদন পদ্ধতিগুলি, যা বৈষয়িক ও শ্রম সম্পদের সবচেয়ে কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি না করে শ্রমের উৎপাদনশীলতা দ্রুতগত বাড়ায়।

শ্রমের রীতিগত মান নির্ধারণ — নির্দিষ্ট কতকগুলি ক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য বরাদ্দ সময়ের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে শ্রম ব্যয়ের জন্য রীতিগত মান প্রতিষ্ঠা, অথবা সময়ের একক পিছু এক নির্দিষ্ট পরিমাণ সামগ্রী উৎপাদনের ব্যবস্থা করে উৎপাদনের রীতিগত মান নির্ধারণ।

শ্রমের সর্বজনীনতা — সমাজতান্ত্রিক সমাজে, কাজ করার অধিকার ও বাধ্যবাধকতার ঐক্য। শ্রমের সর্বজনীনতা প্রকাশ পায় বেকারি দূরীকরণ ও সক্ষমদেহ জনসমষ্টির পূর্ণ কর্মসংস্থানের মধ্যে।

শ্রমের সামগ্রী — শ্রমের প্রক্রিয়ায় মানুষ যে জিনিসটির উপর ক্রিয়া করে।

শ্রমের সামাজিক চরিত্র — একক লোকেদের শ্রমের যে পরস্পরনির্ভরশীলতা প্রকাশ পায় তাদের কাজকর্ম

বিনিময়ের মধ্যে অথবা অভিন্ন শ্রমের প্রক্রিয়ায় বা তার সামাজিক বিভাজনে তার ফলগুলি বিনিময়ের মধ্যে।

শ্রমের সামাজিক সংগঠন — সামাজিক উৎপাদনে জীবন্ত শ্রম ব্যবহার সংক্রান্ত সামাজিক সম্পর্কের এক প্রণালীতন্ত্র। এর শিকড় রয়েছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে। শ্রমের সামাজিক সংগঠন শ্রমের সামাজিক রূপের অথবা শ্রমের চরিত্রের পরিচায়ক।

সমাজতন্ত্রে প্রত্যক্ষ সামাজিক শ্রম — পরিকল্পিতভাবে ও উৎপাদনের উপায়ের উপরে সমাজতান্ত্রিক মালিকানার ভিত্তিতে সমগ্র সমাজের পরিসরে সংঘটিত শ্রম; তার দ্বারা প্রত্যেক পণ্য উৎপাদকের একক শ্রম সর্বমোট সামাজিক শ্রমে সরাসরি অঙ্গীভূত হয় সামাজিক শ্রমের অঙ্গীয় অংশ হিসেবে।

সমাজতন্ত্রে মজুরি — কৃত কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক দানের একটি রূপ। সমাজতান্ত্রিক জাতীয় অর্থনীতির সার্বজনিক ক্ষেত্রটিতে এই রূপটি ব্যবহৃত হয়। বৈষয়িক উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের ব্যয়িত আবশ্যকীয় শ্রমের বৃহদংশের মূল্য, অ-উৎপাদনী ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের সামাজিকভাবে উপযোগী শ্রমের মূল্যের বৃহদংশ এর আওতায় পড়ে।

সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা — শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, উৎপাদিকা শক্তিগুলিকে ও উৎপাদন সম্পর্কে বিকশিত ও উন্নত করা, শ্রমজীবী জনগণের কমিউনিস্ট শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং উৎপাদনের ব্যবস্থাপনায় তাদের জড়িত করার একটি পদ্ধতি। সমাজতান্ত্রিক

প্রতিযোগিতার ভিত্তি হল উৎপাদনে শ্রমিকদের বিপুল পরিসরে সৃষ্টিশীল অংশগ্রহণ ও তাদের উদ্যোগ। উৎপাদনের ফলপ্রসূতা উন্নত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজে প্রতিযোগিতা এর সঙ্গে জড়িত। এর বৈশিষ্ট্যসূচক দিক হল সাথিসদুলভ সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তা। সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার অন্তর্নিহিত নীতি হল প্রচার, ফলাফলের তুলনীয়তা ও প্রাথমিক অভিজ্ঞতা প্রচার।

সমাজের উপকারের জন্য শ্রম — সমাজতন্ত্রে সামাজিক শ্রমের সেই অংশ, যেটি ব্যয়িত হয় উৎপাদন সম্প্রসারিত করা, অ-উৎপাদনী ক্ষেত্রটির রক্ষণাবেক্ষণ করা ও সামাজিক ভোগ তহবিল গঠন করার জন্য প্রয়োজনীয় বৈষয়িক ও আর্থিক সম্পদ উৎপাদন করার উদ্দেশ্যে।

সর্বাত্মক যন্ত্রীকরণ — কার্যিক শ্রমকে যন্ত্র দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা। মানুষের উৎপাদনী ক্রিয়াগুলি তখন পর্য্যবসিত হয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণশীল, প্রোগ্রামযোগ্য যন্ত্রগুলির ক্রিয়া তত্ত্বাবধানে।

সামাজিক নিরাপত্তা — রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি ব্যবস্থা, যা বয়োবৃদ্ধদের জন্য, শৈশব থেকে অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য, অবিবাহিতা মাতা ও তাদের সন্তানদের জন্য বৈষয়িক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

সামাজিক বীমা — অসুস্থতা বা অক্ষমতার ক্ষেত্রে শ্রমজীবী জনগণের বৈষয়িক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এক ব্যবস্থা। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এর জন্য অর্থ যোগান দেওয়া হয় বিভিন্ন উদ্যোগ, প্রতিষ্ঠান ও

সংগঠনের দেওয়া সামাজিক বীমার চাঁদা এবং রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে বরান্দের মধ্য দিয়ে। পুঁজিবাদী দেশগুলিতে এর অর্থ যোগান হয় শ্রমিক ও তাদের মালিকদের দেওয়া বীমা চাঁদার মধ্য দিয়ে।

সামাজিক ভোগ তহবিল — জাতীয় আয়ের একাংশ, কাজ বাবদ পারিশ্রমিক তহবিলেরও অতিরিক্ত ব্যবহৃত হয় সমাজতান্ত্রিক সমাজের সদস্যদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য। সামাজিক ভোগ তহবিল পেনশন ও অন্যান্য উপকার, বিনা ব্যয়ে শিক্ষা, চিকিৎসা, প্রভৃতির সংস্থান করে।

সামাজিক শ্রম — মানুষের শ্রমমূলক ক্রিয়াকলাপ ও তার অস্তিত্বের সামাজিক রূপের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রে প্রকাশিত শ্রমের একটি গুণ।

সামাজিকভাবে আবশ্যকীয় শ্রম-সময় — উৎপাদনের মাঝারি সামাজিক অবস্থায় একটি পণ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়। তা পণ্যটির মূল্য নির্ধারণ করে।

সৃষ্টিশীল শ্রম — যে শ্রম তার সর্বিশেষ চরিত্রের দরুন, লোককে তাদের সমস্ত মানসিক ও আর্থিক সামর্থ্য সমাহৃত করতে, শ্রম-প্রক্রিয়ায় এই সামর্থ্যগুলি সর্বাধিক মাত্রায় ব্যবহার করতে এবং জরুরি, স্বতঃস্ফূর্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে উৎসাহিত করে।

স্থির পুঁজি — উৎপাদনের উপায়ের মধ্যে (ইमारत, কাঠামো, সরঞ্জাম, জ্বালানি, কাঁচামাল ও সহায়ক বস্তু-উপকরণ) অঙ্গীভূত পুঁজির অংশ।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ আর অঙ্গসজ্জার
বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয়
বাধিত হবে। অনান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

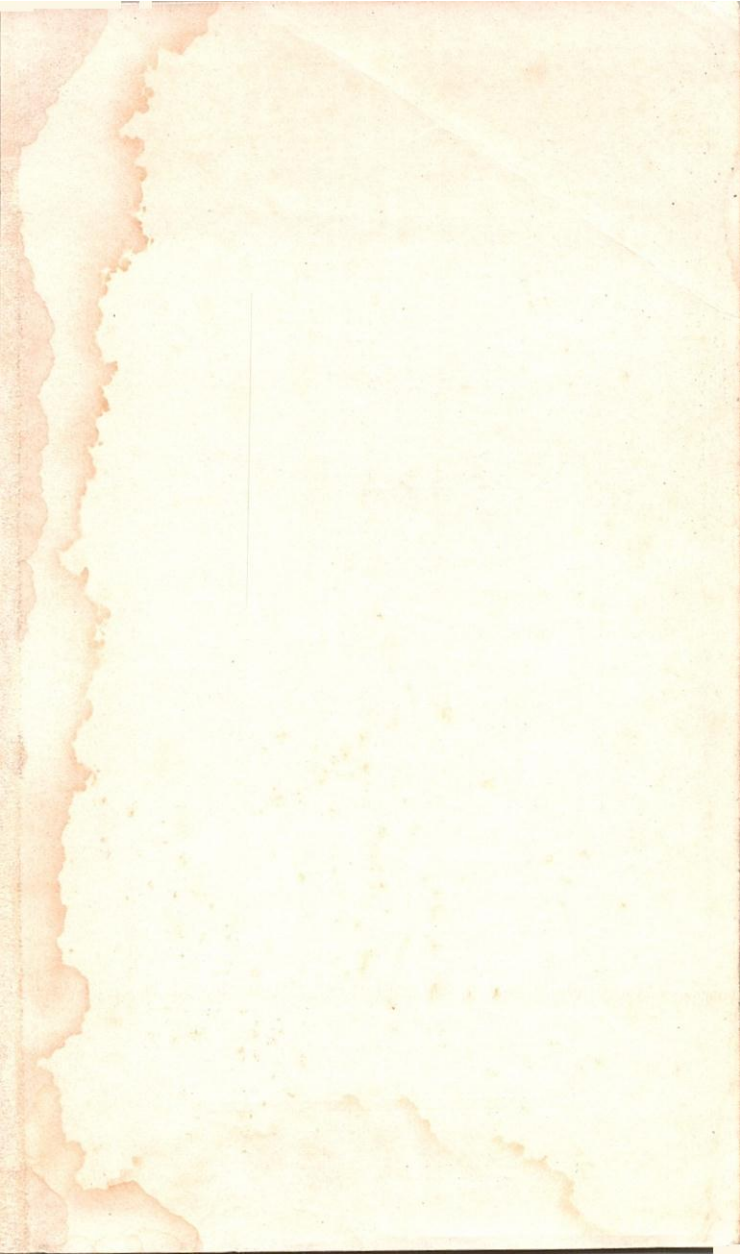
আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন

১৭, জুবোভস্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers
17, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

6 September 2005



সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানের

অ.আ.ক.থ

গ্রন্থমালায় আছে এই বিষয়ে বইগুলি:

সমাজবিদ্যার পাঠ-সংকলন

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ

অর্থশাস্ত্র কী

দর্শন কী

বৈজ্ঞানিক কমিউনিজম

দ্বাম্বিক বস্তুবাদ কী

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কী?

পূর্জিতম্ব কী

সমাজতন্ত্রে কী বোঝায়

কমিউনিজম কী

শ্রম কী

উদ্ভূত-মূল্য কী

সম্পত্তি-মালিকানা কী

শ্রেণী ও শ্রেণী-সংগ্রাম

রাষ্ট্র কী

বিপ্লব কী

উত্তরণ পর্ব কী

ট্রেড ইউনিয়ন কী

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লব কী

ব্যক্তিত্ব কী

সমাজবিদ্যার সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ